আজীবন সংগ্রামী
আমার ৺পিতার
পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশ্যে

মু খ ব ন্ধ

'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার
তাহা না ডরাক তোমা'
—স্বামী বিবেকানন্দ

হার্ডি এই উপন্যাসটির নামকরণ করেছেন, 'The Life and Death of of the Mayor of Casterbridge, a Story of a Man of Character'—"ক্যাস্টারব্রিজের মেয়রের জীবন ও মৃত্যুর আখ্যান, একটি চরিত্রবান পুরুষের কাহিনী।' 'চরিত্র' কথাটির অর্থ অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। এমন একটি মানুষকে ঘিরে এই কাহিনী যিনি আপন মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের বিক্রমে দুঃখকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন।

টমাস হার্ডিকে শুধুই 'পেসিমিস্ট' বলে অভিযোগ করে থাকেন অনেকে; শুধুই দুঃখ আর দুঃখ বলে আক্ষেপ করতে শুনেছি। কিন্তু দুঃখের এমন এক গহন গভীর ব্যাপ্তি আছে যে, দুঃখ ছাড়া জীবনের মহানতা উপলব্ধি করা যায় না। গাঢ় অন্ধকারের যে রূপ, তরল জ্যোৎস্নার আলোক তার কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। জীবনের অতল অসীম প্রশান্তি দুঃখের রিক্ততাতেই ধরা দেয়। সে এমনই এক মর্মভেদী দৃষ্টি যে হার্ডি পাঠককে শুধুমাত্র গল্প শুনিয়েই ক্ষান্ত থাকেন না দুঃখের অস্তিত্ব বিষয়ে ভাবিয়ে তোলেন, একটা আত্মিক অনুভূতিকে অন্তরে প্রবিষ্ট করে দেন। 'জীবনের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের নাট্যে, সুখ এক অতি সাময়িক স্বল্পকালীন উপকথা'—এই সত্য

মেয়েটির প্রায় কাঁধের ওপর এসে পড়ছিল। গায়ে গায়ে না ঠেকলেও, মেয়েটি হাঁটছিল তার পিছে পিছেই। কিন্তু পুরুষের হাত ধরার কথা তার একবারও মনে হয় নি, আর লোকটিরও সঙ্গিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা হয় নি একবারও। তা'বলে মেয়েটির চোখেমুখে এই উপেক্ষা ও নিঃস্তব্ধতার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ নেই। তিনজনের মধ্যে কথাবার্তা যেটুকুমাত্র হচ্ছিল, তা স্ত্রীলোকটির—কোলের শিশুকন্যার উদ্দেশ্যে অস্ফুটে বলা কিছু আদর—আর বাচ্চাটির কুলকুল করে দেওয়া তার উত্তর।

মেয়েটির মুখশ্রীতে প্রধান—বলতে গেলে—একমাত্র আকর্ষণ তার হরিণীর মত চাঞ্চল্য। কোলের শিশুটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর সময়ে তাকে বেশ মিষ্টি, প্রায় সুন্দরী দেখাচ্ছিল। পড়ন্ত বেলার বাঁকা রোদ্দুরের সমস্তটা রঙ তার মুখে। চোখের পাতা আর মসৃণ নাকটি যেন স্বচ্ছ। পাতলা ঠোঁটে বুঝি আগুন লেগেছে। টকটকে রাঙা আভায় ছবির মত সুন্দর। আর ছায়ায় এসে পড়লে, তার নিরাসক্ত চিন্তিত মুখে যেন একটিই প্রশ্ন—জগৎ সংসারে ভাগ্য আর ভবিতব্যের কাছে সুবিচারের প্রত্যাশা করা কি নিতান্তই অর্বাচীনের কাজ? আলোছায়ার এ বৈপরীত্য এমনই, যেন আগের চিত্রটিকে প্রকৃতির দান আর পরেরটিকে সভ্যতার অবদান বলে তুলনা করা যেতে পারে।

এরা যে স্বামী-স্ত্রী, আর কোলের মেয়েটি যে এদেরই সন্তান, তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। অন্য কোন সম্পর্কের দ্বারা এই তিনটি প্রাণীর ম্রিয়মান ঘনিষ্ঠতাকে বিশিষ্ট করা যায় না। স্ত্রীলোকটির শূন্য দৃষ্টি সামনে প্রসারিত—শূন্য—কারণ আশপাশের দৃশ্য এমন কিছু আহামরি নয়। এ সময়ে ইংলণ্ডের সর্বত্রই এই একই রূপ। রাস্তাটি সরলসিধে নয়—দুপাশে ঝোপঝাড় বড় বড় গাছ। তারপর মাঠের পর মাঠ গাঢ় সবুজ বা হরিৎ বর্ণের একঢালা আদিগন্ত বিস্তার। রাস্তার দু'ধারের গাছপাতা আর ঘাসে মোড়া পায়ে চলা পথ ধুলোয় মাখামাখি—দ্রুতগতি যানবাহনের চলে যাওয়ার স্মৃতি বহন করছে। নরম ধুলো সারাটা পথ কার্পেটের মত বিছানো। পা ফেললেও শব্দ হয় না। বাক্যালাপের বিন্দুমাত্রও ব্যবহার নেই। গভীর নিঃস্তব্ধতায় একটুকু আওয়াজও মনে হয় তীক্ষ্নস্বরে বাঁধা।

অনেকক্ষণ থেকে ভেসে আসছিল দূরাগত কোন দুর্বল পাখির কণ্ঠস্বরে সাধা সেদিনের সান্ধ্যগীতি। এ যেন কত কত শতাব্দীর শেষ নিদাঘে গোধূলিবেলায় গেয়ে-ওঠা সেই প্রাচীন গান—সেই একই উদারা, মুদারা, তারা, একই তাল আর লয়ে বেজে চলেছে নির্জন পাহাড়ে-পল্লীতে। গাঁয়েরবসতি কাছাকাছি এলে, ইতস্ততঃ একটু একটু আওয়াজ বা চেঁচামেচি শোনা যেতে লাগল—যেন গাছপালা, ঝোপজঙ্গলের উপর দিয়ে ভেসে আসছে। আরও খানিকটা এগুলে অদূরেই পাড়া দেখা গেল। এমন সময়ে পরিবারটির

। হল এক চাষার সঙ্গে। সে বোধহয় এতক্ষণ ক্ষেতে বিদে দিচ্ছিল। কাঁধে দেওয়ার যন্ত্র। যন্ত্রটির আগায় বাঁধা সারা দিনের খাবার বয়ে নেওয়া নপত্র। যুবকটি পড়া থামিয়ে লোকটির দিকে তাকাল।

কাজকম্মো পাওয়া যায় ইদিকে? নাকমুখ কুঁচকে, হাতের খাতাটা গাঁয়ের দিকে ায়ে সে জিজ্ঞাসা করল। চাষাটা বোধহয় তার কথা বুঝতে পারে নি ভেবে, ার বলল, এই গম-টম কাটা-বাঁধা ঝাড়া এই রকম আর কি!

বিদে ঘাড়ে করে লোকটা আগে থেকেই মাথা নাড়ছিল।—রক্ষে করো বাপু! বোকার হদ্দ না হলে কেউ ওয়েডনে আসে কাজের খোঁজে, এই সময়?

ও! যাক গে! একটা ঘর টর পাওয়া যায়? এই ছোটমোটো কুঁড়ে হলেই হবে! অপরজন জিজ্ঞাসা করল।

নিরাশাবাদীর মুখে এখনও হাঁ শোনা গেল না। কোথায় ঘর? পুরনো ঘরদোরই সব পড়ে যাচ্ছে। আর বচ্ছরে প'লো পাঁচটে! এবারেও তিনটে গেছে। মানুষের কি দুর্দশা! ঐ ছাবড়া বেঁধে আছে কোনরকমে—হেঃ আমাদের ওয়েডনে এইভাবেই দিন কাটে।

অপর লোকটি উদাসভাবে মাথা নাড়ল। তারপর গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—কিন্তু ঐ যে একটা কিছু হচ্ছে মনে হয় ওখানে?

ও! আজকে তো মেলা বসেছে! তাও এখন যা শুনতে পাচ্ছ ওতো কুচোকাচা আর মেয়েছেলেদের আমোদ-আহ্লাদ। আসল বেচাকেনা কখন শেষ হয়ে গেছে! আমি তো সারাদিন এই হট্টগোলের মধ্যেই কাজ করলাম। কি করব? আমি যাব বাজারে? হুঃ, গ্যাঁটে কড়ি থাকলে তো!

আগন্তুক সপরিবারে এগিয়ে চলল। একটু পরেই খেলার মাঠের মধ্যে এসে পড়ল। বিস্তৃত মাঠ এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। ইতঃস্তত কিছু খুঁটো পোতা। এখানেই সকাল থেকে শ'য়ে শ'য়ে ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া বিক্রী হয়েছে। এখন সত্যি সত্যিই আসল বেচাকেনা বন্ধ। যা পড়ে আছে, তা কতকগুলো দুর্বল, রুগ্ন, হাড় বার করা জীব, নীলামের অপেক্ষায়। সকালবেলার ভাল ভাল খদ্দেররা তাদের পছন্দ করে নি। তাহলেও সকালের থেকে লোকের ভিড় এখন বেশী। এদের মধ্যে কেউ কেউ উৎসুক বিচরণশীল দর্শক। দুএকজন সৈনিকও আছে, আর আছে গাঁয়ের দোকানদাররা। তারা দেরী করে এসেছে, কেউ পুতুলনাচের আসরে উঁকি দিচ্ছে, কেউ বা খেলনার দোকানে দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। স্বাস্থ্যবিভাগের লোকও দু'একজনকে ঘুরতে দেখা গেল। আর আছে কাঠের মিস্ত্রী, ছুরি-কাঁচির দোকান, গণকঠাকুর দু' একজন।

এই পদচারীদের কাউকেই এসব ব্যাপারে আগ্রহী মনে হল না। আর একটু নিচে নেমে খাবার-দাবারের দোকান খুঁজতে লাগল তারা। সামনেই দুটো দোকান, পাশাপাশি। দুটোই বেশ ভাল। যে কোনটাতে ঢোকা যেতে পারে। একটা একেবারে নতুন সাদারঙের ত্রিপল দিয়ে ঘেরা—মাথায় লাল লেখা জ্বলজ্বল করছে—"স্বহস্তে তৈরী উৎকৃষ্ট বীয়ার মদ এবং সিডার-পানীয়।" পাশেরটি অত নতুন নয়। পেছনদিক দিয়ে উনুনের ধোঁয়াবারকরা একটা লোহার নল উঠে গেছে। সামনে সাইনবোর্ড—'এখানে ভাল ফার্মিটি—পানীয় পাওয়া যায়'। পুরুষলোকটি লেখাগুলো পড়ে মনে মনে তুলনা করে দেখল, তারপর প্রথমটিতে ঢোকার উদ্যোগ করল।

না, না, ঐটেতে চল,—বলল মেয়েটি। আমার ফার্মিটি খেতে ভীষণ ভাল লাগে. এলিজাবেথও খুব ভাল খায়। আর তোমারও ভাল লাগবে। এতখানি হেঁটে আসার কষ্ট লাঘব হবে।

কেমন জিনিস, আমি তো কখনও খাই নি—বলল পুরুষটি। যাই হোক, সঙ্গিনীর মতকেই গুরুত্ব দিয়ে. তারা ঢুকে পড়ল দ্বিতীয় দোকানটিতে।

ভেতরে যেন বাজার বসে গেছে। লম্বা টেবিলের দু'ধারেই গিজগিজ করছে লোক। শেষপ্রান্তে একটা গনগনে আঁচের ওপরে তিনপেয়ে ড্রামজাতীয় পাত্র। তার ধারগুলো পরিষ্কার চকচকে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস এক কুৎসিত বুড়ী তার মধ্যে এক লম্বা হাতা দিয়ে কি যেন ঘুঁটছে। বুড়ীটার সারা দেহ বেড় দিয়ে একটা সাদা এ্যাপ্রন। তাই খানিকটা ভদ্রস্থ দেখাচ্ছে। লম্বা হাতার ঠকঠক আওয়াজ তাঁবুর সব প্রান্তে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। পাত্রটিতে টগবগ করে ফুটছে এক অদ্ভুত খাদ্য—গম, ময়দা, দুধ, কড়াইশুঁটি, কি নয়? পাশের এক বড় টেবিলের ওপর বালতিতে করে সাজানো এইসব উপাদান—দরকার মত জাল দেওয়া হচ্ছে—আর পরিবেশন হচ্ছে।

তারা দুজনে এককোণে আরাম করে বসে এক গেলাস করে গরম ফার্মিটির অর্ডার দিল। মেয়েটি যেমন বলেছিল, ফার্মিটি সত্যই খুব সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর—যারা অভ্যস্ত নয় তাদের পক্ষে বাতাবি লেবুর দানার মত মোটা ফুলে ওঠা গমের দানাগুলো গলাধঃকরণ করতে একটু অসুবিধা হয়।

লোকটি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিল, এখানে ঐ সাধারণ পানীয় ছাড়া আরও কিছু পাওয়া সম্ভব। বাতাসে যেন সেই রকম একটা গন্ধ। গেলাসের গায়ে আঙুল দিয়ে টকটক করে একটা আওয়াজ করে বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে, বুড়ীটার দিক থেকে কিছু উত্তর পাওয়া যায় কিনা। বুড়ীটাকে মাথা নাড়তে দেখে সে চোখ টিপল আর গেলাসটা এগিয়ে দিল। বুড়ী টেবিলের তলা থেকে একটা

বোতল বার করে তাড়াতাড়ি আন্দাজে কিছু মাপ করে ঢেলে দিল লোকটার গেলাসে। বস্তুটি আর কিছু নয়—'রাম' নামক কড়া মদ। লোকটিও গোপনে কিছু পয়সা গুঁজে দিল বুড়ীর হাতে।

এখন যেন খেয়ে বেশ তৃপ্তি হল লোকটার। তার স্ত্রী কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নিতে পারেনি। স্ত্রীকেও সে বলল অল্প পরিমাণে জিনিসটা মিশিয়ে নিতে—খানিকক্ষণ চিন্তা করে মেয়েটি রাজী হয়ে গেল।

এক গেলাস নিঃশেষ করে যুবকটি আর এক গেলাস চাইল। ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিল এবারে যেন মদ আরও বেশী পরিমাণে দেওয়া হয়। খুব শিগগিরই পানীয়ের ক্রিয়া প্রকাশ পেতে লাগল। মেয়েটি বুঝতে পারল, মদের দোকান থেকে ফিরিয়ে আনলেও সে তার স্বামীকে নিয়ে এক বেআইনী শুঁড়িখানায় ঢুকে পড়েছে।

শিশুটি অনেকক্ষণ থেকেই কাঁদছিল আর ছটফট করছিল। মেয়েলোকটি কয়েকবার তার স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—মাইকেল, ঘরের কি ব্যবস্থা হবে ? আরও দেরী করলে এরপরে আর থাকার জায়গা পাবে না কোথাও।

এসব পাখীর মত কিচিরমিচির কিছুই এখন লোকটির কানে ঢোকার কথা নয়। এখন তার গলার জোর বেড়ে গেছে। দোকানভর্তি লোকের সঙ্গে সে চীৎকার করে কথা বলছে। সন্ধ্যের বাতি জ্বললে শিশুটি ডাগর দুই কালো চোখে এক একবার আলোর দিকে তাকাতে লাগল—আবার বন্ধ করতে লাগল—তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

পানীয়ের প্রথম গেলাস শেষ করে লোকটি বেশ শান্ত হয়ে পড়েছিল—দ্বিতীয় গেলাস শেষ করার পর তার মনে স্ফুর্তি এল, তৃতীয় গেলাসের পরে তাকে মনে হচ্ছিল তর্কবাজ আর চতুর্থ গেলাস শেষ করার পর তার মুখে যেন দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির মত রেখা ফুটে উঠল—কালো চোখে আগুন জ্বলে উঠল, আচরণে প্রকাশ পেতে লাগল সে কতটা রগচটা, অসহিষ্ণু আর পাকা ঝগড়াটে।

কথাবার্তা আস্তে আস্তে বেশ উচ্চগ্রামে উঠল ! আলোচনার বিষয়টি ছিল—কিভাবে বহু ভাল ভাল লোকের জীবনে তাদের উনপাঁজুড়ে স্ত্রীরা সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সবথেকে বড় দুঃখের কথা হল, অধিকাংশ যুবকের জীবনে যাবতীয় উচ্চাভিলাষ, সকাল সকাল বিয়ে করেই ফুরিয়ে যায়—বড় কাজ করার সমস্ত প্রেরণাই নষ্ট হয়ে যায়।

এই তো আমিই। নিজের জীবনটা ডুবিয়ে দিলাম—লোকটি বলল, যেন কত তিক্তস্মৃতি তাকে গভীর দুঃখে তলিয়ে দিচ্ছিল—আঠার বছর বয়সে বিয়ে করেছিলাম ! বোকচন্দর হলে যা হয়। আর এই দেখ তার খেসারৎ—হাতটা দুলিয়ে সে নিজের এবং তার পরিবারের চরম দারিদ্র্যের উদাহরণ উপস্থিত করল।

এ ধরণের কথাবার্তা শুনেও তার স্ত্রীর কিন্তু কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। হয়তো এমন শুনতে সে অভ্যস্ত, তাই কিছুই না শোনার ভান করে আধো-ঘুমন্ত বাচ্চাকে আদর করতে লাগল। কখনও কখনও হাত তুটোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তাকে কোল থেকে নামিয়ে বেঞ্চের উপরেও শুইয়ে দিচ্ছিল। পুরুষটি বলে যেতে লাগল—তুনিয়ায় এখন আমার সম্বল বলতে মাত্র পনেরো শিলিং। কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি সারা ইংল্যাণ্ডে খড-বিচুলির কাজ আমার থেকে ভাল কেউ বোঝে না। এর যাবতীয় কায়দা-কানুন আমার জানা—কিন্তু কোন্ শালা তার দাম দেবে?—এই যে ঘটিয়ে বসে আছি—আজ না হলেও আমি কম করে হাজার পাউণ্ডের সম্পত্তি করতে পারতাম।

বাইরে বুড়ো ঘোড়াগুলোর নীলাম-ডাক শোনা যাচ্ছিল —এই যে, এই শেষ—কে নেবে, তুড়ি, তুড়ি দিয়ে নেবে নাকি? মাত্তর চল্লিশ শিলিং—খুব ভাল জাতের ঘোড়া হে! শুধু বাঁ চোখটাই যা কানা হয়ে গেছে অন্য একটা ঘোড়ার চাঁটি খেয়ে—অবশ্যি পেছনের একটা পা একটু টেনে হাঁটে—

তাঁবুর মধ্যে লোকটা বলছিল—আমি বুঝি না, এই বেদেগুলো যেমন ঘোড়া বেচে দেয় তেমনি মানুষের সমাজেও বৌ কেন বেচে দেওয়ার নিয়ম নেই?—কেন? কেন আমরা কি নীলাম ডাকতে পারি না—যার পছন্দ হয় সে কিনে নেবে? কি? আছে কেউ? কিনবে? আমি আমার বৌকে বেচে দেব এখুনি—আছো কেউ?

থাকতে পারে, কেউ কেউ থাকতে পারে—খদ্দেরদের মধ্যে তুএকজন মেয়েলোকটির দিকে তাকিয়ে বলল।

হুম—একজন বেশ ভদ্রগোছের লোক উত্তর দিল। তার জামা-কাপড় বেশ ধোপতুরস্ত। হয়তো কোনও বড় লোকের বাড়ীর খানসামা বা কোচম্যান ছিল আগে। ডানহাত দিয়ে মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বলল—আমার অনেক বড় পরিবারের সঙ্গে জানাশোনা আছে, লোক দেখলেই আমি তার বংশমর্য্যাদা ঠিক বুঝতে পারি। আমি হলফ করে বলছি এই মেলার মধ্যে যে কোনও মেয়েছেলের চেয়ে এই মেয়ে অনেক উঁচু বংশের মেয়ে। বলে হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে সে পাইপে টান দিল আবার, বাতাসের দিকে তাকিয়ে।

যুবকটি আচমকা তার স্ত্রীর সম্পর্কে এই প্রশংসা শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কিন্তু খুব শিগগিরই পুরনো বিশ্বাস ফিরে পেয়ে কর্কশগলায় বলে উঠল—ঠিক আছে, দর দাও তাহলে। আমি এখুনি তোমার হাতে এই অপ্সরীকে তুলে দিচ্ছি।

মেয়েটি স্বামীর দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বলল—মাইকেল! এই দোকানভর্তি লোকের সামনে তুমি এ'সব কি বলছ? ঠাট্টা-ইয়ার্কি সব জায়গায় চলে না, ভুলে

যেওনা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব জানি। যা বলেছি—তা বলেছি আছে কেউ, খদ্দের আছে?

এমন সময় একটা চড়ুইপাখি—কখন কি করে হয়তো তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, লোকগুলোর মাথার উপরে ফরফর করে একবার এদিক একবার ওদিক উড়ে বসতে লাগল। সবার দৃষ্টি আটকে গেল সেইদিকে। আলোচ্য বিষয়টি তখনকার মত চাপা পড়ে গেল।

পুরুষলোকটি ইতিমধ্যে আরও দু'একবার বিশেষ প্রিয় পানীয় দিয়ে তৃপ্তি মিটিয়েছে। মিনিট পনের পরেই সে গানের ধুয়া ধরার মত পুরনো কথার জের টেনে বলল—তাহলে? তাহলে আমার বৌকে নেওয়ার মত কেউ নেই এখানে? এই মেয়েলোকটি দিয়ে আমার আর কোনও প্রয়োজন নেই, কেউ কিনবে?

আসর তৎক্ষণে প্রায় ভেঙে এসেছে। নতুন করে প্রশ্নটা শুনে তাই সকলেই একটু কৌতুকের হাসি হাসল। মেয়েলোকটি খুব উদ্বেগ আর অনুযোগের সুরে ফিস ফিস করে বলল—চলো, চলো, অন্ধকার হয়ে গেছে। কি করছ এসব? তুমি না যাও যদি, আমি একাই চলে যাচ্ছি—চলো।

অপেক্ষা আর তার ফুরোয় না। কিন্তু পুরুষটির নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। আরও খানিকক্ষণ পরে এটাওটা কথার মধ্যে সে দুম করে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—আমার কথার উত্তর দেওয়ার মত হিম্মৎ কারও নেই তাহলে?—কোনও হরিদাস, রুইদাস কিনবে আমার মাল?

মেয়েটির মুখের ভাব পাল্টে গেল। ভয়ানক কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। সে বলল—মাইক! মাইক! ব্যাপারটা কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—খুব চরম হয়ে যাচ্ছে।

কি, কিনবে কেউ?—পুরুষটি চিৎকার করে উঠল।

মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলল—কেউ কিনে নিলে ভালই হত। আমার বর্তমান মালিকের আর পছন্দ হচ্ছে না আমাকে।

তোমারও আমাকে পছন্দ হচ্ছে না—পুরুষটি বলল—তাহলে ঐ কথাই পাকা। কি হে ভদ্দর লোকেরা শুনলে তো? আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ির চুক্তি হয়ে গেল। ও ইচ্ছে করলে ওর বাচ্চাকে নিয়ে যেদিকে খুশী যেতে পারে। আর আমি আমার যন্ত্রপাতি নিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। ঠিক আছে তাহলে সুসান! উঠে দাঁড়াও, চেহারাটা দেখাও তোমার।

না, না, বাছা, ওটা কোর না—মোটাসোটা, টাউস গাউন পরা এক দোকানদারনী বলল। সে ঐ মেয়েটির পাশেই বসেছিল—তোমার মরদ তোমার ভালমন্দের কথা এখন ভাবতেই পারছে না।

মেয়েটি তবুও উঠে দাঁড়াল। পুরুষটি চীৎকার করে উঠল—তাহলে নীলামদার হবে কে?

আমি, আমি আছি—সঙ্গে সঙ্গে একটা বেঁটে লোক উত্তর দিল—নাকটা তার তামাটে ছিপির মত, গলার আওয়াজ ফ্যাসফেসে, আর চোখদুটো বোতামের ঘরের মতো ছোট—বলো, কে কে দর দেবে এই মেয়েলোকটির জন্যে?

মেয়েটি মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। অতিকষ্টে, তীব্র মনের জোরে, কোনরকমে নিজেকে সোজা রাখতে পারছিল সে।

একজন বলল—পাঁচ শিলিং। তাই শুনে অন্যরা খিলখিল করে হেসে উঠল। না ইয়ার্কি নয়? পুরুষটি বলল—এক গিনি দেবে কেউ?

কোনও উত্তর এল না। সেই মোটাসোটা দোকানদারনী বাধা দিল—এই যে মশায়! একটু ভেবেচিন্তে কাজ কর বুঝলে! হায় হায় ভগবান! কি নিষ্ঠুর লোকেব সঙ্গেই হতভাগীর বিয়ে হয়েছিল।

আর একটু বাড়িয়ে দাও হে নীলামদার! পুরুষটি বলল।

তাহলে দু গিনি—নীলামদার হাঁকল। তবুও কোনও উত্তর নেই।

এখনও কেউ না বললে, দশ সেকেণ্ডের মধ্যে আরও বেড়ে যাবে দাম—স্বামীটি বলল—ঠিক আছে নীলামদার! আরও একটু ওঠো।

তিন গিনি। তিন গিনিতে যাচ্ছে—সাক্ষাৎ শয়তানের মত লোকটা বলল।

এখনও কেউ নেই—হায় ভগবান! ওর পেছনে যে আমার পঞ্চাশগুণের বেশী খরচা গেছে—স্বামীটি বলল।

চার গিনি—ডাকল নীলামদার।

শোন, আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি—পাঁচ গিনির কমে আমি দিতে পারব না স্বামীটি হাত মুঠো করে টেবিলের উপর দুম করে রাখল—গেলাসবাটিগুলো সব যেন নেচে উঠল।—এখুনি নগদ পাঁচ গিনি পেলে, আমি ওকে ছেড়ে দেব—আর কোনওদিন কোন রকম দাবী করব না। কি সুসান, রাজী তো?

চরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মেয়েটি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

পাঁচ গিনি দেবে কেউ? নীলামদার ডাকল—এই শেষ সুযোগ নাহলে এবার ডাক বন্ধ হয়ে যাবে। আছ কেউ?

হ্যাঁ আছি—একটা বেশ উঁচু গলা শোনা গেল দরজার কাছ থেকে।

সবার দৃষ্টি থমকে গেল সেখানে। তাঁবুর মুখে তেকোণা আকারের দরজা। একজন নাবিক কখন সবার অলক্ষ্যে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল—বোধহয় মিনিট দুইতিনের বেশী নয়। তার কথার পরে—সারা তাঁবুতে এক মৃত্যুর মত নিঃস্তব্ধতা নেমে এল।

তাহলে তুমি দেবে বলছ? স্বামীটি তার দিকে তাকিয়ে বলল।

হ্যাঁ বলছি। উত্তর দিল নাবিকটি।

বলা আর দাম দেওয়া এক কথা নয়। টাকা কই তোমার?

নাবিকটি এক মুহূর্ত চিন্তা করল। মেয়েটিকে আর একবার তাকিয়ে দেখে ভেতরে ঢুকল। পাঁচটা কড়কড়ে নোট বার করে টেবিলের উপর রাখল—তারপর এক দুই তিন চার পাঁচ করে পাঁচটা শিলিং গুনে নোটগুলোর উপর চাপা দিল।

এতক্ষণ এইসব দরাদরি বা পুরুষলোকটির প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে খানিকটা অনুমানের ব্যাপার থাকলেও, এখন চোখের সামনে নগদ টাকা দেখে, দর্শকদের মধ্যে ভয়ানক একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। এই নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী এবং টেবিলের উপর রাখা নোটগুলোর গায়ে যেন সকলের দৃষ্টি পেরেক দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। এতক্ষন ব্যাপারটিকে কেউ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেনি। সবাই ভাবছিল—দেখা যাক. কৌতুক আর মজা কতদূর গড়ায়! ভাবছিল—লোকটার কাজকর্ম নেই বলে হয়তো, জগৎসংসার, নিজের আত্মীয় স্বজন, সকলের উপর তীব্র বিরক্তি এসে গেছে। কিন্তু চোখের সামনে নগদ টাকার লেনদেন দেখে সমস্ত কৌতুক উবে গেল। তাঁবুর মধ্যে যেন বিষাদের রঙ ঢেলে দিল কেউ। সবার মুখ থেকে হাসির রেখা মুছে গিয়ে, অবাক বিস্ময়ে সকলের ওষ্ঠ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

এই গভীর নৈঃশব্দের মধ্যে মেয়েলোকটির ক্ষীণ শুষ্কস্বর শোনা গেল—মাইকেল! এখনও সময় আছে। তুমি যদি ঐ টাকা ছোঁও—তাহলে কিন্তু আর ঠাট্টা ইয়ার্কি থাকবে না। আমাকে এবং আমার মেয়েকে চলে যেতে হবে ঐ লোকটির সঙ্গে।

ঠাট্টা? ঠাট্টাটা কোথায় এর মধ্যে? তার স্বামী চীৎকার করে উঠল। বরং স্ত্রীর কথা শুনে, যেন টাকাটা নেওয়ার কথা মনে পড়ে গেল—এই যে আমি টাকা নিয়ে নিলাম। আর ঐ নাবিক তোমাকে নিয়ে যাবে—ব্যস মিটে গেল—বাইরেও তো এই ভাবেই কেনাবেচা হচ্ছে।

নাবিকটি বলল—না, অমি ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাই না। বাইরে যাই হোক, এই ভদ্রমহিলা যেমন ইচ্ছা করেন তেমনই হবে।

আমিও তো তাই বলছি—তার স্বামী বলল—ও নিজেই তো যেতে চায়। শুধু বাচ্চাটিকে নিতে দিলেই হল। এই তো সেদিনই আমাকে বলেছে এই কথা।

সত্যিকথা? নাবিকটি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল।

মেয়েটি তার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে অনুতাপের লেশমাত্র নেই। সে ছোট করে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

ঠিক আছে, তাহলে ও'ই নিয়ে যাক বাচ্চাটা। এবার তো মিটে গেল। বলে

পুরুষটি নাবিকের দেওয়া নোটগুলো এক এক করে গুনে ভাঁজ করে পকেটে রাখল—যেন এতক্ষণে কেনাবেচা সম্পূর্ণ হল।

নাবিকটি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল। মিষ্টি করে বলল—এসো! বাঃ বেশ টুকটুকে বাচ্চাটা তো। ঠিক আছে, আসলের সঙ্গে ফাউও পেলাম। মেয়েটি এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। লোকটিকে ভাল করে দেখল। তারপর চোখ নামিয়ে কিছু না বলে, বাচ্চাটিকে কোলে করে, লোকটার পেছন পেছন এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজার কাছে গিয়ে সে ফিরে দাঁড়াল, হাত থেকে বিয়ের আংটিটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল পুরুষলোকটির মুখের উপর। তারপর বলল—মাইক! তোমার সঙ্গে দুবছর ঘর করেছি—কিন্তু রাগ ছাড়া আর কিছু পাই নি। এখন যখন আর তোমার নই—আমি আর এলিজাবেথ দুজনেই দেখি কপাল ফেরে কিনা? বিদায় তাহলে!

মেয়েলোকটির চোখমুখ ভিজে সপসপ করছে। বাচ্চাটিকে বাঁ কোলে নিয়ে, ডানহাতে সে নাবিকটির হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল।

পুরুষলোকটির মুখে কেমন যেন এক শান্ত উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল। এমনটি যে ঘটতে পারে সে বোধহয় ভাবতে পারে নি। দু'চারজন লোকে একটু হাসল।—ওরা কি চলে গেছে? পুরুষটি জিজ্ঞাসা করল।

হাঁ, হাঁ, অনেকদূর চলে গেছে—দরজার বাইরে থেকে দুএকজন গেঁয়ো লোক বলল।

সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে যতটা সাবধানে পা ফেলা দরকার সেইভাবে এগিয়ে গেল। আরও কেউ কেউ বেরিয়ে এল। বাইরে তখন গোধুলির আলো একেবারে মিলিয়ে যায় নি। কেউ কেউ সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের কলুষতার কি গভীর বৈপরীত্য। একটু আগে তাঁবুর মধ্যে যা ঘটে গেল, বাইরের সঙ্গে তার কত তফাৎ! বাইরে তখন ঘোড়াগুলো পরস্পরের গায়ে ঘাড় আর গলা ঘষছে। একটু পরেই তাদের আস্তানায় ফিরে যাওয়ার যাত্রা শুরু হবে। মেলার বাইরে সমস্ত উপত্যকা ও বনরাজি একেবারে নিঃস্তব্ধ। সূর্য্য একটু আগে অস্ত গেছে। পশ্চিমের আকাশে এখনও রক্তিম মেঘের বাহার। ক্ষণিকের জন্য মনে হয় এটাই বুঝি প্রকৃতির চিরন্তন দৃশ্য। ঠিক যেন অন্ধকার কোনও প্রেক্ষাগৃহে বসে দূরের পর্দায় দেখা যাচ্ছে নিপুণ শিল্পের মূর্চ্ছনা। একটু আগেকার দৃশ্যের সঙ্গে এই দৃশ্যের তুলনা করলে মনে হয়—এই ভালবাসাভরা পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র কলঙ্ক। অবশ্য দুনিয়ার কিছুই চিরস্থায়ী নয়—হয়তো এই প্রকৃতিরই উদ্দাম নিষ্ঠুর নৃত্য শুরু হয়ে যায়, যখন অচেতন নিদ্রায় মানুষ বড় পবিত্র আর অসহায়।

নাবিকটা থাকে কোথায়? একজন দর্শক অনিশ্চিতভাবে তাকিয়ে বলল।

ভগবান জানে। উত্তর দিল সেই লোকটা যার সঙ্গে অনেক বড় মানুষের জানাশোনা আছে। তবে—লোকটাকে এই নতুন দেখলাম।

এই তো মিনিট পাঁচেক আগে এল। দোকানের মালিক-বুড়ি পাছার ওপরে দুই হাত রেখে বলল—এল আর চলে গেল—আমার তো এক পয়সাও ফয়দা হয় নি ওর থেকে।

অপর বুড়ীটা বলল—ঠিক করেছে মেয়েটা। ঠিক করেছে। আম্মো ঐ করতাম। ড্যাকরা ব্যাটার কী ব্যাভার! অমন সোন্দর বৌ! মনের জোর আছে। ঠিক করেছে। আমার মরদ অমন হলে আম্মো চলে যেতাম—আর মিনসে ডেকে ডেকে গলা ফাটাতো।

হুঁ, মেয়েটা বোধহয় এখন ভালই থাকবে। আর একজন বলল। লোকটার মনে হ'ল পয়সাকড়ি আছে, আর সমুদ্রে-টমুদ্রে গেলে লোকের মনে মায়াদয়া হয় বেশী।

তা বলে ভেব না আমি ওকে খুঁজতে যাবো। পুরুষলোকটি বলল। বলে গোঁয়ারের মতো নিজের জায়গায় গিয়ে বসল—যে গেছে তাকে যেতে দাও—অত খেয়াল খুশীমত চললে তাকে ভুগতেই হবে। তা বলে মেয়েটাকে বা নিয়ে যাবে কেন? বাচ্চাটা তো আমার!

রাত হয়ে যাচ্ছিল। এসব কথায় আর নাক গলানো অর্থহীন ভেবে ভীড় পাতলা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। লোকটা তার দুই কনুই লম্বা করে মেলে দিল টেবিলের ওপর। ঘাড়টাকে নুইয়ে দিল বাহুর উপর। একটু পরেই নাক ডাকতে শুরু করল তার। দোকানদারনী রাত্রির মত ঝাঁপ বন্ধ করার তোড়জোড় করতে লাগল। ঠেলাগাড়ীটার মধ্যে. অবশিষ্ট দুধ. গম. 'রামে'র' বোতল, বালতি ইত্যাদি সব ভর্তি করল। তারপর ঘুমন্ত লোকটার কাছে এসে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল। কিন্তু সে উঠল না। মেলা আরও দুইতিন দিন চলার কথা—কাজেই তাঁবু বন্ধ করার দরকার ছিল না। দোকানদারনী ভাবল লোকটা যখন চোরডাকাত নয়, ওকে ভেতরে থাকতে দেওয়া যেতে পারে, তারপর শেষ বাতিটাকে নিভিয়ে দিয়ে. তাঁবুর ঝাঁপ ফেলে, সে বেরিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

লোকটার যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। তাঁবুর এখানে ওখানে ফাঁকা দিয়ে তাজা রোদ্দুর ভিতরে এসে পড়ছে। ভেতরটা যেন আলোয় আলোময়।

কেবলমাত্র একটা বড় নীলরঙের মাছি ভোঁভোঁ করে উড়ে বেড়াচ্ছিল এদিক ওদিক। মাছির ভনভনানি ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। সে চোখ মেলে তাকাতে লাগল—বেঞ্চিগুলোর দিকে। টেবিলের উপরে তার যন্ত্রপাতির ঝোলা— অদূরেই সেই বড় আঁচ—আশেপাশে খালি মগ, বাটি পড়ে আছে—কিছু গমের দানা ছড়ানো-ছেটানো—আর বোতলের ছিপি অনেক পড়ে আছে নীচে ঘরের মেঝেয়। এইসব নানান বস্তুর মধ্যে একটা চকচকে জিনিষ তার চোখে পড়ল—তুলে দেখে এটা তার স্ত্রীর হাতের সেই আংটি।

গত সন্ধ্যার ঘটনা আবছা-আবছা মনে পড়তে লাগল। সে বুকপকেটে হাত চালিয়ে দিল। একটু ঘাঁটতেই বেরিয়ে পড়ল অযত্নে-রাখা সেই নাবিকের দেওয়া পাঁচখানা কড়কড়ে নোট।

এই দ্বিতীয়বার পরখ করার পর তার স্মৃতিটা যেন ঝালিয়ে উঠল। মনে হল ঘটনাগুলো স্বপ্ন নয়, সত্যি। খানিকক্ষণ সে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। অবশেষে স্বগতঃভাবে বলল—নাঃ, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। কোনও ভাবনাই সে মনেমনে করতে পারত না। মুখে প্রকাশ করে নিজের কানে না শুনলে তার চিন্তা সম্পূর্ণ হত না। চলে যখন সে গেছে, যাক। সেও গেছে, এলিজাবেথকেও নিয়ে গেছে—ঐ নাবিকটার সাথে। সেই তো এখানে ঢুকলাম। ঢুকে ফার্মিটি খেলাম। তার সঙ্গে খেলাম মদ। তারপর তাকে বিক্রী করে দিলাম। এইবার সব মনে পড়েছে। তাহলে, তাহলে এখন কি করি! হাঁটতে পারব বোধ হয়, নাকি?—সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেখল স্বচ্ছন্দেই হাঁটতে পারছে। তারপর যন্ত্রপাতির ঝোলাটা কাঁধে ফেলে দেখল, অসুবিধা হচ্ছে না। তাঁবুর দরজা ফাঁক করে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

বিষণ্ণ জিজ্ঞাসায় সে তাকিয়ে দেখল চারিদিক। সেপ্টেম্বরের এই টাটকা সকাল রক্তে জোর এনে দিল। আগেরদিন সন্ধ্যাবেলা যখন সে পৌঁছেছিল এখানে, সপরিবারে, তখন ক্লান্তিতে সবকিছু দেখা হয় নি। এখন চোখ মেলে যেন সব নতুন মনে হতে লাগল। গড়ানো উপত্যকার প্রান্তে নিবিড় গাছপালা, একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা উঠে গেছে উপরে। আর নীচে হল সেই গ্রাম, যার নামে মেলাটারও নাম 'ওয়েডনে'র মেলা। এখান থেকে যেন জায়গাটা ছড়িয়ে নীচে নেমে গেছে। দূরে ইতস্ততঃ, বহু প্রাচীন কেল্লার ভগ্নাবশেষ। কোথাও টিলা, কোথাও খাদ, আর যতদূর চোখ যায় গাছপালা, ফাঁকা মাঠ। ভোরের আলোয় সব ঝলমল করছে। একটা ঘাসের আগা থেকেও এখনও শিশির শুকিয়ে যায় নি। বরং এই ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের মধ্যেই দূরের চলমান লাল-হলুদ গাড়ীগুলো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, ঠিক

ধুমকেতুর বাঙ্কম রেখার মত। বেদেরা, পুতুলনাচওয়ালারা যারা রাত্রে তাদের তাঁবুতে বা গাড়ীতেই ঘুমিয়েছিল, ভোরবেলা আরও মুড়িগুড়ি দিয়ে শুয়েছে। সব যেন মৃত্যুর মত নীরব। শুধু হঠাৎ হঠাৎ নাকডাকার শব্দে তাদের উপস্থিতি অনুভূত হচ্ছে। এইরকম একটা দলের সঙ্গে একটা কুকুরও গাড়ীর নীচে ঘুমিয়েছিল। সেটা না-কুকুর, না-বেড়াল, না-শেয়াল গোছের। হঠাৎ সে স্বভাববশতঃ একবার ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল, আবার ঘাড় গুঁজে শুয়ে থাকল। প্রকৃতপক্ষে ওয়েডনের মেলা থেকে এই লোকটির নিষ্ক্রমণের একমাত্র সাক্ষী থাকল এই জন্তুটি।

নিবিষ্টমনে চিন্তা করতে করতে লোকটি এগিয়ে চলল। শালিখ পাখির কিচির-মিচির—সুন্দর সুন্দর ব্যাঙের ছাতা, বা গাঁয়ের যে সব ভাগ্যবান ভেড়াগুলোকে মেলায় যেতে হয় নি তাদের গলায় ঘণ্টার টুংটুং আওয়াজ, কিছুই তার কানেও ঢুকছিল না, চোখেও পড়ছিল না। প্রায় মাইলখানেক হেঁটে একটা গলির মুখে এসে সে থামল একটু। কাঁধ থেকে ঝোলা নামিয়ে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তার মনে তখন দু'একটা কঠিন সমস্যা ঘোরাফেরা করছে।

—আচ্ছা, আমি কি আমার নাম বলেছি কাউকে, নাকি, না বোধহয়? সে নিজে নিজে বলল। অবশেষে ভেবে দেখল, বলে নি। মুখ-চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তার স্ত্রী তাকে অতখানি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করায় সে কত বিস্মিত এবং বিব্রত। একটা লম্বা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে চিবুতে চিবুতে সে চিন্তা করল তার স্ত্রী নিশ্চয়ই ঝোঁকের মাথায় এটা করে ফেলেছে। তাছাড়া সে হয়তো ভেবেছিল এই সব ব্যবসাপত্তর, দরাদরির মধ্যে কোনও আইনের বাধ্যবাধকতা আছে। দ্বিতীয় কারণটাই ঠিক ভেবে সে বুঝতে পারল—তার স্ত্রী একটি অতি নির্বোধ সরল মেয়ে—তার চরিত্রে কোনও দোষ থাকার কথা নয়। তাছাড়া তার আপাতঃ-শান্ত স্বভাবের অন্তরালে হয়তো বহু অভিযোগ এবং একটা বেপরোয়া মনোভাব গুমরোচ্ছিল অনেকদিন থেকে। আগে একবার কথাকাটাকাটির সময়ে সে ঐরকম বলেছিল, সে বৌকে ত্যাগ করে দেবে। তাতে মেয়েটি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল—বারবার বলার থেকে কাজে একবার করে ফেলাই ভাল,—কিন্তু তাই বলে আমি তো আর সজ্ঞানে তাকে বিক্রী করিনি—লোকটি জোরেজোরেই ভাবল—দেখি, খুঁজে দেখি, পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। কী অদ্ভুত! আমার মান-অপমানের কথা একবার চিন্তা করল না! সে চীৎকার করে উঠল—আমার মতো তার তো জ্ঞানগম্যি হারায় নি। এমন নিরেট বোকা আর দেখব না কোথাও! ঐ যে নরম,—অতিরিক্ত নরমস্বভাবের বলেই আজ আমাকে এই দুর্ভোগে ফেলেছে!

আরও একটু শান্ত হলে সে চিন্তা করল—খুঁজে ওদের বার করতেই হবে।

মান-সম্মানের কথা তারপর ভাবা যাবে। নিজেই যেহেতু দায়ী, অতএব ফলাফলও তাকেই ভুগতে হবে। কিন্তু তার আগে একটা শপথ করা দরকার—আর শপথ করার উপযুক্ত পরিবেশও চাই। লোকটার ধ্যান-ধারণা একেবারে নাস্তিক জড়বাদী ছিল না।

ঝোলাটা কাঁধে তুলে, আবার হাঁটতে শুরু করল সে—অপার কৌতূহলে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে। আরও মাইল তিন-চার হাঁটলে পর একটা গাঁয়ের বসতি এবং গীর্জার চূড়ো চোখে পড়ল। তখনই সে গীর্জার পথ ধরল। লোকজনের হৈচৈ তখনও শুরু হয় নি। গাঁয়ের জীবনে দিনের এই সময়টাই একেবারে গতিহীন। পুরুষরা রাত থাকতে উঠে বেরিয়ে গেছে চাষের কাজে—আর মেয়েরা, বৌরা এখনও সকালের কাজকর্ম শুরু করেনি। সকলের অলক্ষেই সে গীর্জায় পৌঁছে গেল। বাইরের দরজায় শিকল তোলা ছিল—তাই শিকল খুলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। ঝোলাটা এক কোণে নামিয়ে সে বেদীর দিকে এগিয়ে এল। কেমন যেন এক আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছিল তার। হাঁটু গেড়ে বসে, 'কম্যুনিয়ন-টেবলের' উপরে রাখা খোলা বইয়ের পাতায় মাথা নুইয়ে দিল সে। তারপর জোরে জোরে বলতে লাগল—আমি, মাইকেল হেনচার্ড, আজ এই ষোলই সেপ্টেম্বরের সকালবেলা, ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, যে, আমার যতদিন বয়স হয়েছে, ততদিন, অর্থাৎ আগামী একুশ বছর, আমি কোনরকম উগ্র পানীয় গ্রহণ করব না। এই পবিত্র গ্রন্থ ছুঁয়ে আমি এই শপথ করলাম—এবং এর অন্যথা করলে, আমি যেন বোবা, অন্ধ এবং অসহায় অবস্থায় পতিত হই।

দিব্যিটা করার পর উঠে দাঁড়ালে মনে হচ্ছিল, সে নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছে। বাইরে বেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, বাড়ী বাড়ী উনুন জ্বলতে শুরু করেছে। চিমনী দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। এক বাড়ীতে গিয়ে, সে গৃহিনীকে কিছু সকালের খাবার পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করল। তারপর অল্প কিছু পয়সার বিনিময়ে কিছু খেয়ে রওনা দিল স্ত্রী এবং কন্যার খোঁজ করতে।

কিন্তু খুঁজে বার করাটা যে সহজ নয়—সেটা খুব সত্বরেই বোঝা গেল। দিনের পর দিন, সে এদিকওদিক অনেক ঘুরল। অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তার বর্ণনা মত মানুষগুলোর হদিশ কেউ দিতে পারল না। তাছাড়া সেই নাবিকটার নাম তো দূরের কথা—নামের কাছাকাছি ধ্বনিও তার মুখে এল না। তার নিজের পয়সাকড়ি খুব কম ছিল বলে, কিছুটা দোনামোনা করেও সে ঠিক করল—ঐ নাবিকের টাকাটাও এই খোঁজখবর করার পিছনে ব্যয় করবে। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। সেদিনকার লজ্জাকর আচরণের জন্যে আসলে যতখানি

হৈ হৈ করে ঐ সমস্ত খোঁজখবর করা দরকার, তার কিছুই করতে পারল না মাইকেল হেনচার্ড। কি ভাবে তার স্ত্রী এবং কন্যা হারিয়ে গেছে সে প্রসঙ্গ অবশ্য কেউ তোলে নি, কিন্তু তাদের ফিরে পাওয়ার কোনও সূত্রও দৃষ্টিগোচর হ'ল না।

সপ্তাহ থেকে মাসের পর মাস যেতে লাগল তবুও তার অনুসন্ধান চলতে লাগল। মাঝে মাঝে টুকটাক কাজ করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। এইভাবে একদিন সে এক বন্দরে এসে হাজির হল। সেখান থেকে জানতে পারলে যে, তার বর্ণনার সঙ্গে মিল আছে এমন তিনটি প্রাণী, অল্প কিছুদিন আগে, ঐ বন্দর থেকে দেশান্তরী হয়ে গেছে। আর খোঁজ করা অর্থহীন ভেবে, সে পছন্দমত একটা জায়গায় গিয়ে বসবাস করবে স্থির করল। পরের দিনই যাত্রা শুরু হ'ল তার। শুধু রাতের বিশ্রাম ছাড়া চলতে লাগল সে। অবশেষে ওয়েসেক্স অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্যাস্টারব্রিজ নামে এক ছোটখাট শহরে পৌঁছুল।

।। তিন ।।

ওয়েডন গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ধুলোর কার্পেট এখনও আগের মত। গাছগুলো এখনও যেন সেদিনের মতই সুদূর অতীতের স্মৃতিমাখা সবুজ। সেদিন এই রাস্তা দিয়ে হেনচার্ড পরিবারের তিনজন হাঁটতে হাঁটতে এসেছিল। আজও সেই পরিবারের সঙ্গেই সম্প.কত দুজনকে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে।

সেদিনের সঙ্গে আজকের দৃশ্যের এতই মিল, এমনকি গাঁয়ের বাচ্চা ও বুড়োদের সেই একই কলকল ধ্বনি যে, মনে হবে আগেকার ঘটনাগুলো বুঝি গতকালই বিকেলবেলা ঘটেছে। পরিবর্তন চোখে পড়ে না তা নয়, কিন্তু সেজন্যে একটু খুঁটিয়ে দেখার দরকার। আজকের এই দুই চরিত্রের একজন হচ্ছে, আগের দৃশ্যের হেনচার্ডের সেই তরুণী স্ত্রী। এখন তার মুখশ্রীতে সে কমনীয়তা আর নেই। গায়ের ত্বক একটু যেন খসখসে হয়েছে। চুলে রং না ধরলেও হাল্কা হয়ে গেছে অনেক। পরনে বিধবা নারীর পোষাক। তার সঙ্গিনীকেও মনে হচ্ছিল শোকাহত। আঠার বছরের সুন্দর বাঁধুনি তার দেহে। যৌবন নামক ক্ষণস্থায়ী লাবণ্য চোখেমুখে ঝলমল করছে। সৌন্দর্য্যের এটাই স্বাভাবিক রূপ, শরীরের গড়ন বা গায়ের রং ইত্যাদি বিচার নিতান্তই ব্যবসায়িক।

একবার দেখলেই বোঝা যায়, মেয়েটি সুসান হেনচার্ডেরই বয়োপ্রাপ্তা কন্যা। মায়ের মুখে-চোখে যৌবনের দ্যুতি অস্তগামী হলেও, কোন যাদুতে যেন সেই চঞ্চল ও কোমল রূপটি মেয়েতে গিয়ে বর্তেছে। প্রকৃতির এই বহমানতা এতই সাবলীল, যে

মায়ের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা যে এখনও মেয়ের অগোচর থাকতে পারে, একথা বিশ্বাসই করা যায় না।

সহজ ভালবাসার টানে, দুজনে পরস্পরের হাত ধরে হাঁটছিল। মেয়েটির হাতে একটা পুরনো ধরণের বেতের তোরঙ্গ আর মায়ের হাতে নীল রংয়ের কাপড়ে বাঁধা একটা বোচকা। গাঁয়ের কাছাকাছি পৌঁছে, সেই আগের পথ ধরেই তারা মেলার দিকে হাঁটতে থাকল। এত বছর পরে, এখানেও কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। আশেপাশের শহর বা গ্রাম থেকে যান্ত্রিক অগ্রগতির কিঞ্চিত প্রভাব এখানেও এসে পড়েছে। এবারে মেলায় একটা যন্ত্র এসেছে, গাঁয়ের লোকেদের শক্তি আর ওজন পরীক্ষা করা যায় তাতে। একজন আবার দূরে বোর্ডে ছোট ছোট বেলুন সাজিয়ে বন্দুক ছুঁড়ে তাক ঠিক রাখার বাজী ধরছে। কিন্তু মেলা বসার মূল উদ্দেশ্য বর্তমান গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এখন মাঝে মাঝেই আশপাশের টাউনে বেশ বড়বড় বাজার বসে। তাই বহু শতাব্দীর এই প্রথা উঠে গিয়ে, কেনাবেচা এখন প্রধানতঃ ঐ সব বাজারেই হয়। ঘোড়া রাখার আস্তাবল, কি ভেড়ার জন্যে খোঁয়াড় এখন আর আগের চেয়ে অর্দ্ধেকও নেই। জামাকাপড় বা একটু মূল্যবান জিনিসপত্রের দোকান একটিও নেই। গাড়ীঘোড়াও আর আগের মত আসে না। মা এবং মেয়ে দূর থেকে এই জনতার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ।

এখানে এসে আমাদের সময় নষ্ট করার কি দরকার ছিল? আমি ভাবছিলাম তুমি সামনে কোথাও যাবে। মেয়েটি বলল।

এই একটু ইচ্ছে হল এখান থেকে ঘুরে যাই। মা উত্তর দিল।

কেন?

এখানেই আমার সঙ্গে নিউসনের প্রথম দেখা—এইরকমই একটা দিনে।

বাবার সঙ্গে এখানে প্রথম দেখা হয়েছিল? ও, তুমি একবার বলেছিলে। কি করে যে বাবা জলে ডুবে গেল! আমাদের এ কা একা ফেলে। বলতে বলাত যে দীর্ঘনিঃশাস ফেলল, পকেট থেকে একটা কার্ড বার করল, কার্ডটার চারদিক কালো বর্ডার দেওয়া—মাঝখানে স্মৃতিফলকের মত লেখা—

"পুণ্যস্মৃতিতে—রিচার্ড নিউসন, নাবিক, (বয়স একচল্লিশ)—সলিলসমাধি নভেম্বর ১৮৪"—আর এখানেই—তার মা দ্বিধাজড়িত স্বরে বলে যেতে লাগল—আমার স্বে আত্মীয় খোঁজ করতে যাচ্ছি, মিঃ মাইকেল হেনচার্ড—তাঁর সঙ্গে এখানেই শেষ দেখা।

উনি কি রকম অত্মীয়, মা! তুমি এখনও ঠিক পরিষ্কার করে বল নি।

উনি হচ্ছেন—জানি না এখনও বেঁচে আছেন কিনা—ঐ আর কি শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে আত্মীয়। মা খুব সহজভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল।

ঐ একই কথা তুমি নাহক বিশবার বলেছ আমাকে। মেয়েটি বলল অন্যমনস্কভাবে—তার মানে, খুব দূরসম্পর্কের কেউ হবেন বোধহয়।

না না তা নয়।

ওঁর তো খড়-বিচুলির ব্যবসা ছিল—শেষ পর্যন্ত যা খবর পেয়েছিলে?

হ্যাঁ।

আমাকে নিশ্চয়ই উনি চিনবেন না—মেয়েটি সরলভাবে বলল।

মিসেস হেনচার্ড একটু থেমে, অস্বস্তির সঙ্গে উত্তর দিল—হুঁ,—তা পারবেন না। আয় এদিক দিয়ে আয়। বলে মাঠের আর একদিকে হাঁটতে শুরু করল।

চতুর্দিকে তাকাতে তাকাতে মেয়েটি বলল মাকে—এভাবে খুঁজে কিছু লাভ হবে না, মা! মেলার লোক ঠিক গাছের পাতার মত পাল্টে যায়—আমার মনে হয় তুমি ছাড়া অত বছর আগে এখানে এসেছিল এমন আর কেউ নেই।

না, তা নাও হতে পারে। মিসেস নিউসন উত্তর দিল। মহিলাটি এখন এই নামেই পরিচিত। একটু দূরে দেখিয়ে সে বলল—ঐ দ্যাখ—

মেয়েটি সেইদিকে তাকাল। মাটিতে একটা উনুন খুঁচে তিনপেয়ে এক বিরাট আকারের ড্রাম তার উপরে বসিয়ে, নীচে কাঠের আগুন দিয়ে জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। এক জরাজীর্ণ পোষাক পরা বুড়ী তার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কি দেখছে—লম্বা একটা হাতা দিয়ে সজোরে ঘুঁটছে—আর ব্যাঙের মত হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছে—এখানে ভাল ফার্মিটি পাওয়া যায়।

এ সেই আগেকার দোকানদারনী। একদিন তার পরিষ্কার বেশবাস ছিল, সাদা এ্যাপ্রন ছিল, পয়সার চাকচিক্য ছিল। এখন সে তাঁবু নেই, টেবল-চেয়ার, বেঞ্চি কিছুই নেই, নোংরার হদ্দ। খরিদ্দারও তেমনি দু' একটা বাপে-তাড়ানো, মায়ে খেদানো ছোঁড়া। এক পেনি'র দাও না, ভাল করে মেপে দিও—বলে এসে দাঁড়াচ্ছে আর মাটির খুলিতে পরম তৃপ্তিভরে তাই খাচ্ছে।

এই বুড়িটা তখন এখানে ছিল—মিসেস নিউসন বলল। বলে এক পা এগিয়ে গেল যেন আলাপ করতে চায়।

ও'র কাছে যেও না, মা! কোন কথা বোল না যেন! নোংরা! অপরজন বলল।

আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব, এলিজাবেথ! তুই একটু দাঁড়া এখানে।

মেয়েটির একদম ভাল লাগছিল না। সে বরং তফাতে গিয়ে ছবির দোকানে দাঁড়িয়ে ছবি দেখতে লাগল। মিসেস হেনচার্ড-নিউসন কাছে এগিয়ে গেলে, বুড়ি তাকে সাদরে সম্ভাষণ জানাল। মাত্র এক পেনির ফার্মিটি চাওয়ায় এত খাতির করল যা সে আগের দিনে ছ'পেনির খদ্দের হ'লেও করত না। আগের দিনের সেই

থলথলে ঘন খাস্তের থেকে এখনকার বস্তুটি অনেক তরল। ঝোল গড়িয়ে পড়ছে। মেয়েলোকটি তার মাটির ভাঁড় তুলে নিলে, বুড়ি আঁচের পেছন দিকে একটা ঝুড়ি খুলে চতুরভাবে চোখ তুলে বলল—একটু কড়া জিনিস দিয়ে দেব নাকি? চুরি করে বিক্রি করা অবশ্যি—কিন্তু এই দু পেনির মত মিশিয়ে নিলে একেবারে অমের্ত্ত'র মত সোয়াদ—আহা—

বুড়ীর খরিদ্দার সেই পুরনো ছল এখনও বজায় আছে দেখে একটু তিক্ত হাসি হাসল। এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যে তার অর্থ করা বুড়ীর সাধ্যাতীত। মেয়েলোকটি চামচ দিয়ে অল্প একটু মুখে তুলে, হঠাৎ বুড়ীকে প্রশ্ন করল—তোমার তো মনে হচ্ছে অবস্থা ভাল ছিল একসময়?

হায়, ম্যাডাম! সে কথা আর কি বলব! বুড়ীর অন্তরের কবাট মুহূর্তে হাট হয়ে খুলে গেল। এই মেলায় আসছি আমি ছোট একটুখানি বয়েস থেকে—কুমারী অবস্থায়, বৌ হয়েও আর এখন বিধবা হয়ে—এই আজ উনচল্লিশ বছর—আর যাবতীয় ধনী লোকের পেটে আমার এই ফার্মিটি পড়েছে। আর কি বলব মা! বললে তো তোমার বিশ্বাস হবে না—এই এত্তবড় দোকান ছিল আমার এই মেলায়। আমার দোকানে খাওয়ার জন্যে লোক মেলা দেখতে আসত। আমার দোকানে না খেয়ে কেউ বাড়ী ফিরত না। কে কি খায়, আমার সব জানা। পাদ্রীরা কেমন খায়, ভদ্দরলোকেরা কেমন খায়—শহরের লোক, গাঁয়ের লোক,—এমন কি একদম গাঁইয়া মেয়েগুলো কেমন খায়—সব আমি জানতাম। কিন্তু পোড়া কপাল আমার! দুনিয়া-য় সৎ লোকের জায়গা নেই মা! যত বাটপাড় আর জুয়াচোরের এখন বোলবোলা মা গো!

মিসেস নিউসন একবার চারদিকে তাকাল। তার মেয়েটি তখনও দূরে দোকানে নীচু হয়ে ছবি দেখছে। খুব সন্তর্পণে সে বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে, আঠার বছর আগে, এই মেলায়, এমন এক দিনে, একটা লোক তার স্ত্রীকে বিক্রি করে দিয়েছিল।

বুড়ী খানিকক্ষণ মাথা চুলকে চিন্তা করে বলল—খুব বড়সড় ঘটনা হলে আমার ঠিক মনে পড়ত। সেই যে সেবার মারপিট হ'ল, খুন দাঙ্গা হ'ল, সেগুলো আমার বেশ মনে আছে। কিন্তু বিক্রি করে দিল? কি, চুপিচুপি বিক্রি করে দিল?

হ্যাঁ, প্রায় তাই।

বুড়ীটা তবুও মাথা নাড়তে লাগল। তারপর বলল—ও হো, হো, হ্যাঁ, হ্যাঁ-মনে পড়েছে, একটা লোক এই রকম করেছিল বটে। ঠিক! ঠিক! একটা যন্ত্রপাতির ঝোলা ছিল তার সাথে। ঠিক, ঠিক, মনে পড়ল কেন জানো তো! লোকটা তার পরের বছর মেলার সময় আবার এসেছিল এখানে। আমাকে খুব গোপনে বলে গেল

যদি কোনও মেয়েলোক এখানে এসে তার খোঁজ করে তবে যেন আমি বলি—কোথায় যেন বেশ—কোথায় চলে গেছে ? ও হ্যাঁ, ক্যাস্টারব্রিজ,—ক্যাস্ট্যারব্রিজ বলেছিল লোকটা—হা ভগবান—এ'তো আমার মনেই পড়ত না।

মিসেস নিউসন হয়তো তার সাধ্যমত বুড়ীটাকে পুরস্কৃত করত—কিন্তু তার মনে পড়ল এই সেই সাক্ষাৎ শয়তানী—যার উগ্র মদ খেয়ে তার স্বামী নিজের বুদ্ধিবিবেচনা বিসর্জন দিয়েছিল। তাই ছোট করে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সে চলে এল। এলিজাবেথের কাছে আসতেই, সে মাকে বলল—মা, তুমি কি বলে ওখানে দাঁড়িয়ে ও'গুলো খেলে ? আমার তো ভীষণ লজ্জা করছিল। যত নিকৃষ্ট লোকেরা খাচ্ছে ওখানে। না'ও, এখন চলো।

তাতে কি আছে, আমার যেটুকু দরকার ছিল, আমি জেনে নিয়েছি। তার মা শান্তভাবে উত্তর দিল। আমাদের সেই আত্মীয় শেষ যে বার এই মেলায় এসেছিলেন, তখন উনি ক্যাস্টারব্রিজে থাকতেন। জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূর। সে আজ অনেকদিন আগের কথাও বটে। তবু আমাদের সেখানে যাওয়াই বোধহয় ভাল।

মেলা থেকে বেরিয়ে, গাঁয়ের বসতির দিকে এগিয়ে গেল তারা, তারপর কোনরকমে রাত্রে থাকার একটা ব্যবস্থা করে নিল।

॥ চার ॥

হেনচার্ডের স্ত্রী যেটাকে উচিৎ বলে ভেবেছিল, তাতে কিন্তু সে নিজেকে আরও সমস্যার জালে জড়িয়ে ফেলল। মেয়ে এলিজাবেথকে জীবনের সব ঘটনা খুলে বলবে একথা সে বহুদিন ভেবেছে। কি করে অমনই কাঁচা বয়সে, একদিন ওয়েডনের মেলায়, এক ভয়ানক দুর্ঘটনা নেমে এসেছিল তার জীবনে—কিন্তু কিছুতেই আর বলা হয় নি। নিষ্পাপ মেয়ের মনে তাই তার মা এবং সেই উদারচেতা নাবিকের স্বাভাবিক ব্যবহার ও সম্পর্ক বিষয়ে কোনও সন্দেহই জাগে নি। তার মাও কোনদিন চায় নি যে, মেয়ের মনে কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা ঢুকে যাক। সন্দেহ ও অবিশ্বাসে জর্জরিত হলে—তার ভালবাসা ছাড়া সে কি করে বাঁচবে ? এলিজাবেথকে সব ন্যায্য কথা জানিয়ে দেওয়া তাই অন্যায্যই মনে হয়েছিল তার কাছে।

কিন্তু সুসান হেনচার্ড মেয়ের ভালোবাসা পাবে কি পাবে না, তার উপরে ন্যায়-অন্যায় নির্ভর করে না। হেনচার্ড যেজন্য তাকে অপছন্দ, বা প্রায়ই অবজ্ঞা করত—

সেই নির্বোধের মত সরল বিশ্বাসেই সে মেনে নিয়েছিল, নিউসন তাকে কিনে নিয়ে যথার্থ নৈতিক এবং যুক্তিসঙ্গত অধিকার অর্জন করেছে। অবশ্যি এর প্রকৃত অর্থ বা আইনসিদ্ধতা সম্পর্কে কোনও পরিষ্কার ধারণা ছিল না তার। সভ্য রুচিশীল কোনও সাধারণ স্বাভাবিক মেয়ের পক্ষে এমন হস্তান্তর মেনে নিতে মনের সায় নাও থাকতে পারে, কিন্তু বহু গাঁয়ের স্মৃতি ঘাঁটলে এমন নমুনা অনেক পাওয়া যাবে যাদের জীবনে এ ধরণের হস্তান্তর ধর্মবিশ্বাস বিঘ্নিত করে নি।

এ'র মাঝখানে সুসান হেনচার্ডের জীবনে যা ঘটেছিল, দু'এক কথাতেই তার সবটা বলা যেতে পারে। সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় সে সেই নাবিকের সঙ্গে কানাডায় চলে যায়। সেখানেও কয়েক বছরের জীবনে সে সুখের মুখ দেখে নি। তবু অনেক কষ্টে দিনরাত খেটেও, টানাটানির সংসারে একটু হাসি ফোটান'র চেষ্টা করত। তারপর এলিজাবেথের যখন বছর বারো বয়স, তখন তারা ইংলণ্ডে ফিরে আসে এবং ফ্যালমাউথ নামে একটা বন্দরে বসবাস করতে থাকে। নিউসন সেখানে মাঝিমাল্লার কাজ করত আর জাহাজ ধোয়া-পোঁছাও করত মাঝে মাঝে। এই সময়েই সুসান প্রথম জানতে পারে যে, নিউসন মেয়েমানুষ কেনাবেচা চালান দেওয়া ইত্যাদি ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত। একবার শীতের শেষে নিউসন কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে যখন ফিরে এল—সুসানের পুরনো ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এসব ব্যাপার সে এতদিন নজর করেনি। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যও হল একদিন। অবশেষে বছর না ঘুরতেই, আবার যখন দরকার পড়ল, নিউসন ব্যবসার কাজে চলে গেল নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে। তারপর একদিন খবর এল যে সমুদ্রে তাদের জাহাজডুবি হয়েছে। সুসান যেন খুব সহজে বিবেকের তাড়না থেকে নিষ্কৃতি পেল। তারপর থেকে আর তাদের মধ্যে দেখা হয় নি।

হেনচার্ড সম্পর্কে তারা জানত না কিছুই। গরীবমানুষের কাছে তখনকার ইংল্যাণ্ড, মহাদেশের মত বিরাট, তাই খবর পাওয়া স্বাভাবিক ছিল না। এলিজাবেথের মধ্যে নারীত্ব ফুটে উঠেছিল একটু অল্প বয়সেই। এখন তার বয়স আঠার। নিউসনের মৃত্যুর খবর আসার মাসখানেক পরে, একদিন বিকেলবেলা, বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে সে জেলেদের একটা ছেঁড়া জাল সারাই করছিল। তার মাও একটু তফাতে বসে একই কাজ করছিল। কাঠের সুঁচে সুতো পরাতে পরাতে সুসান তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগল। বাঁকা রোদ্দুর এসে পড়েছে মেয়ের চোখে-মুখে আর এলোচুলে। মুখটা একটু শুকনো, ঠিক ভরাট নয়—তবুও সৌন্দর্য্যের সব লক্ষণ তার মধ্যে স্পষ্ট। একটু ঘষামাজা—এবং যত্নের অভাব ছাড়া সে মুখে আর কোনও অপূর্ণতা নেই। কিন্তু হায়! এই অভাবটুকু

বুঝি ঘুচবার নয়। তাদের জীবনে রোজ-আনি-রোজ-খাই, এটাই চিরসত্য—ঘষামাজার সে সুযোগও নেই, সময়ও নেই।

মেয়েকে দেখে মায়ের মনটা বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। একেবারে বিনা কারণে নয়—যথেষ্ট যুক্তি ছিল তাতে। এই মেয়ের জন্যেই দারিদ্র্য ঘুচোন'র কত চেষ্টাই সে করেছে। মায়ের মন অনেকদিন আগেই বুঝেছিল মেয়ে তার নিজেকে বিস্তারের জন্য আকুলিবিকুলি করছে। কত আগ্রহে সে আরও দেখতে, আরও শুনতে, আরও বুঝতে চায়। কিন্তু সব ইচ্ছা তার রুদ্ধ হয়ে আছে। কি করে সে আরও বড় হবে! আরও খ্যাতি, আরো জ্ঞান! সব কিছুতেই তার মায়ের কাছে একটাই প্রশ্ন—'আরও' কিছু। তার মত মেয়েদের থেকে সে যেন কত পৃথক। মায়ের দুঃখের অন্ত ছিল না এই ভেবে যে, সে মেয়েকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারল না।

নিউসন—ডুবে যাক বা না যাক—তদের স্মৃতি থেকে মুছে যাচ্ছিল। মোহমুক্তির পর থেকে সুসান সেই নাবিকের জন্যে কোনও নৈতিক বন্ধন অনুভব করত না। এখন যেহেতু সে মুক্ত, সুসান শুধু ভাবত—এই বাধাবিঘ্নময় দুনিয়ায় সে মরিয়া হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে এলিজাবেথের জগৎকে আরও বড় করে দেওয়া যায় কিনা, তাই ভালই হোক আর মন্দই হোক, প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সে ভেবেছিল, তার আগের স্বামীর খোঁজ করে দেখবে একবার। হয়তো এতদিনে তিনি মদের নেশায় মৃত্যুর অতল গভীরতায় নিজেকে ঠেলে দিয়েছেন। তবুও একটা ভরসা ছিল যে, লোকটা মাঝে মাঝে নেশা করলেও স্বভাবতঃ মদ্যপ ছিল না।

সে যাই হোক, যদি সে বেঁচে থাকে, তবে তার কাছে ফিরে যেতে কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়—বিশেষতঃ এলিজাবেথের প্রয়োজনে। শেষমেশ সে চিন্তা করল, হেনচার্ডের সঙ্গে পূর্বসম্পর্কের বিষয়ে সে এলিজাবেথের কাছে কিছু প্রকাশ করবে না—বরং সে দায়িত্বটা হেনচার্ডকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তার উপরে ছেড়ে দেওয়াই ঠিক হবে। এই সব কারণেই মেলায় এসে পৌছনো পর্য্যন্ত এলিজাবেথের কাছে ঐসব অর্ধজ্ঞাত বিষয় পরিষ্কার হয় নি। মেলায় এসে সেই বুড়ীর দেওয়া খবরের ভিত্তিতে যাত্রা শুরু হল তাদের। পয়সাকড়ির নিতান্ত অভাব। তাই কখনও পায়ে হেঁটে কখনও বা কোনও ফার্মারের গাড়ীতে—তারা ক্যাস্টারব্রিজের দিকে এগিয়ে চলল। এলিজাবেথ লক্ষ্য করছিল, তার মায়ের শরীর ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে। কথায়-বার্তায় সব সময় প্রকাশ পায় জীবনের প্রতি এক তীব্র অনীহা। শুধু মেয়ের জন্যে ছাড়া, এই পৃথিবীতে তাঁর আর এক দণ্ডও বাঁচবার ইচ্ছে নেই।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এক শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলা—তখনও ঠিক সন্ধ্যা নামে

নি—তারা ক্যাস্টারব্রিজের মাইলখানেকের মধ্যে পৌঁছুল। জায়গাটা একটা উঁচু টিলা। নরম ঘাসের উপর তারা বসে পড়ল। এখান থেকে শহরটা এবং আশপাশের জায়গাগুলো খেচরের দৃষ্টিতে দেখা যায়। খুব পুরনো জায়গা মনে হচ্ছে—এলিজাবেথ বলল। তার মায়ের তখন ঐসব ভাবনা স্থান দেওয়ার মত শারীরিক বা মানসিক অবস্থা নয়। চারদিক থেকে যেন বিচ্ছিন্ন—গাছপালা দিয়ে ঘেরা—অনেকটা দেয়াল তোলা বাগান বাড়ীর মত মনে হচ্ছে, মা!

জায়গাটা সত্যিই চতুষ্কোন আকারের এক প্রাচীন জনপদ। এখনও পর্য্যন্ত আধুনিকতার লেশমাত্র প্রবেশ করে নি এখানে। শহরতলী বলে কিছু নেই। গ্রাম এবং শহর যেন এক সরলরেখা টেনে আলাদা করা যায়। অনেক উঁচুতে-ওড়া পাখীদের চোখে. আজকের সন্ধ্যেবেলা, ক্যাস্টারব্রিজ নিশ্চয়ই সবুজ ফ্রেমে আঁটা লাল বাদামী ধূসর এবং স্ফটিক রংয়ের মোজেইক-এর কাজ বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু মানুষের সমতল দৃষ্টিতে জায়গাটা ইট-পাথরের সমাহার একটা স্তূপ। শুধু এখানে-ওখানে দুচারটি চিমনি, চিলেকোঠা, আর টাওয়ার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্য্যের আলোয় জ্বলে-ওঠা মেঘের তামাটে আগুন ঠিকরে পড়ছে তাদের মাথায়। শহরের মাঝখান থেকে পূবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে প্রশস্ত পথ ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের গ্রাম, চাষের ক্ষেত আর বাগান-বাগিচায়। এইরকম একটি পথ দিয়েই পদচারিণীরা ঢুকেছিল এই শহরে। আবার উঠে চলা শুরু করার আগে দু'জন পথিকের বেশ গরম কথাকাটাকাটি শোনা গেল। তারা একটু দূরে সরে গেলে, এলিজাবেথ বলল—মা! ওরা যেন হেনচার্ডের নাম করছিল শুনলাম—আমাদের সেই আত্মীয়?

আমারও তো মনে হ'ল—মিসেস নিউসন উত্তর দিল।

তার মানে উনি এখানেই আছেন।

হ্যাঁ।

ছুটে যাব আমি? জিজ্ঞেস করব ওদের?

না, না, না,। কোথায় আছে ঠিক নেই—আমাদের গোপনে খোঁজ করতে হবে।

বিশ্রাম যথেষ্ট হওয়ায়, তারা সন্ধ্যার পরে হাঁটতে শুরু করল। অন্ধকারে গাছের ছায়ায় রাস্তাগুলো সুড়ঙ্গের মত। পাশের মাঠে খোলা জায়গায় এখনও অবশ্যি আবছা আলো আছে। এলিজাবেথের মা এখন একটু তাজা বোধ করছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিল। আরও কিছুটা এগুলে' পর গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে, দূর থেকে বাতির আলো এসে পড়ছিল। এতক্ষণের নির্জন নীরবতা ভেঙ্গে যেন জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। আরও একটু পরে বাজনার আওয়াজ কানে এল। বড় রাস্তায় পড়ে তারা দু'পাশে দেখল কাঠের বাড়ী—অনেকগুলোই দোতলা, টালিতে

ছাওয়া, কোনটা বা সমান ছাদ, কচিৎ এক আধটা খড়ের চাল।

চাষবাস আর গরু-ভেড়া পোষাই যে বেশীর ভাগ লোকের পেশা সেটা দোকানগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কাস্তে হেঁসো কোদাল, খুরপি, মেষপালকের শীপ-ক্রুক ইত্যাদিই বেশী কামারের দোকানগুলোতে। কোনটাতে বা গরু-দোয়ার বালতি, মৌমাছির বাক্স, ঘোড়ার লাঙ্গল, জিন। কোনটাতে গাড়ীর চাকা, জোয়াল, চাষীদের হাতের দস্তানা ইত্যাদি।

একটা অতি প্রাচীন, শ্যাওলা-ধরা গীর্জার কাছে এসে পড়ল তারা। অন্ধকার আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশের আলোয় নীচের দিকটা আলোকিত। ইট থেকে চুনবালি খসে পড়ছে। একটু পরেই টাওয়ারের ঘড়িতে আটটা বাজল। আর একটু পরে শুরু হ'ল ঢং ঢং করে ঘণ্টাধ্বনি। এখন দোকানদাররা সবাই দোকান বন্ধ করবে। আস্তে আস্তে সব দোকানে ঝাঁপ পড়ে যাবে, রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাবে, আজকের মত ক্যাস্টারব্রিজের বেচাকেনা শেষ। অন্য ঘড়িগুলোতেও এক এক করে আটটা বাজল। জেলখানার ঘড়ির ঘণ্টায় কেমন যেন বিষণ্ণ ধ্বনি। নাটকের শেষদৃশ্যে অভিনেতাদের একত্র হয়ে নিজের সংলাপ বলে যাওয়ার মত, টক টক করে বেজে গেল ঘড়িগুলো।

গীর্জার সামনের আঙ্গিনায় একটি মেয়েলোক হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল। তার পরনের গাউনটা এখানে-ওখানে ছেঁড়া। অন্তর্বাস দেখা যাচ্ছে। বগলের তলায় একটা ঝোলা থেকে সে রুটি বার করে তার সঙ্গিনী আর একটা মেয়েলোককে দিচ্ছিল। গোগ্রাসে খাচ্ছিল তারা। মিসেস হেনচার্ড-নিউসন এবং তার মেয়ের মনে পড়ল, তাদেরও খিদে পেয়েছে। মেয়েলোকটিকে তারা জিজ্ঞাসা করল, কাছাকছি কোথাও রুটির দোকান আছে? মেয়েলোকটি আঙ্গুল দিয়ে দোকান দেখিয়ে দিয়ে বলল—ভাল রুটির দোকান আর কই! গরীব মানষির জন্যি কিছু নেই। ঐ যে দেখো না, বাদ্যি বাজিয়ে কেমন খানাপিনা হচ্ছে। ঐ যে হোথা! একটু দূরে একটা আলো-ঝলমল বাড়ীর সামনে দেখা গেল বাজনা বাজছে।—আমাদের জন্যি ওসব নয়। ক্যাস্টারব্রিজে এখন ভাল রুটির থেকে ভাল বীয়ার পাওয়া যায় বেশী।

আর তার থেকেও বেশী পাওয়া যায় চোলাই মদ। অন্য একটা লোক বলল, হাত দুটো তার পকেটে ঢোকান।

কেন, ভাল রুটি পাওয়া যায় না কেন? মিসেস হেনচার্ড প্রশ্ন করল।

সে কথা আর বলে কেডা! ঐ যে আমাদের মহাজন! জাননা? তাঁরই হাতে তো সবকিছু। এখানকার যাবতীয় রুটির কারখানাগুলো গম কেনে তো ওঁর কাছে। যত পচা গম, তাই কুনো ব্যাঙের মত ফোলা ফোলা রুটি। এতখানি বয়েস হ'ল—

বাপের জন্মে কখনও এত খারাপ রুটি খাই নি। তোমরা কি একেবারে নতুন এলে নাকি—এ্যাঁ—কিছুই জান না যেন—

হুঁ,বলে এলিজাবেথের মা বিনীতভাবে সরে এল।

নতুন জায়গায় কেমন কি পরিস্থিতিতে পড়তে হয় ঠিক নেই—তাই কারও সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা বিপজ্জনক। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সে খাদ্যই হোক, অখাদ্যই হোক কোনরকমে খেল কিছু। তারপর স্বাভাবিক ইচ্ছার টানে' যেদিকে বাজনা বাজছিল, সেইদিকে চলে গেল দুজনে।

পাঁচ

বাজনা বাজছিল যে বাড়ীটার সামনে, সেটা ক্যাস্টারব্রিজের সবথেকে বড় হোটেল। জানালার খড়খড়িগুলোর খোলাপথে ভেতরের অস্পষ্ট কথাবার্তা, গেলাসের টুংটাং ধ্বনি, ও বোতলের ছিপি-খোলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। উল্টোদিকে রাস্তার অপর পারে একটা অফিস-বাড়ী। তার প্রশস্ত সিঁড়িতে উঠে দাঁড়ালে ওপরদিকের জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে হোটেলের ভেতরের সব দৃশ্য দেখা যায়। তাই ঐ সিঁড়ির উপরে দু'চারজন অলস ব্যক্তি জড হয়েছিল এই ভোজসভার দৃশ্য দেখতে।

এখানেই হয়তো আমাদের আত্মীয়, মিঃ হেনচার্ডের খোঁজ খবর পাওয়া যেতে পারে—মিসেস নিউসন চুপিচুপি বলল। ক্যাস্টারব্রিজে প্রবেশ করার পর থেকেই সে যেন বড় বেশী দুর্বল এবং অস্থির হয়ে পড়েছে।—মনে হচ্ছে, এখানে এদের জিগ্যেস করলে. ঠিক ঠিক হদিশ পাওয়া যাবে। এলিজাবেথ, তুই মা, জিগ্যেস করে দেখ একটু। আমি আর পারছি না। বলে সে একেবারে নীচের সিঁড়িটায় বসে পড়ল আর এলিজাবেথ মায়ের কথামত আরও চার পাঁচ ধাপ উঠে গিয়ে ঐ লোকগুলোর পাশে দাঁড়াল। একটা বুড়ো লোকের পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, সে যেন কথাবার্তা বলার অধিকার অর্জন করল, তারপর প্রশ্ন করল—কি হচ্ছে ওখানে?

তুমি বুঝি এখানে থাক না? বুড়োটা জানলা থেকে চোখ না সরিয়েই বলল—আজকে তো সব তা'বড় তা'বড় ভদ্দরলোকেদের মীটিন। এ্যাই পান-ভোজন হবে আর কি। ঐ যে মেয়র এয়েচেন। উনিই তো সভাপতি। আমাদের মত গরীব নোকেদের এই জানলা দিয়ে দেখাই সার। আর একটু ওপরে ওঠো। তুমিও দেখতে পাবে। ঐ যে আমাদের মেয়র, মিঃ হেনচার্ড। ঐ যে টেবিলের শেষ মুড়োয়—এইদিকেই

তাকিয়ে বসে আছেন। আর দু'পাশে সব মেম্বররা—ওদের অনেকেই কিন্তু একদিন এই আমার মত করে জীবন শুরু করেছিল।

'হেনচার্ড!' বিস্মিত এলিজাবেথের মুখ থেকে নামটি বেরিয়ে এল কিন্তু তাতে সন্দেহ বা অস্বাভাবিকত্ব প্রকাশ পেল না। সে একদম উঁচু সিঁড়িটাতে উঠে গেল।

তার মা মাথা নীচু করে বসেছিল। কিন্তু মিঃ হেনচার্ড যে মেয়র—এ উক্তিটা বুড়োর কথা শেষ হওয়ার আগেই তার কানে প্রবেশ করল। সে উঠে দাঁড়াল। খুব বেশী আগ্রহ প্রকাশ না করেই একপা একপা করে মেয়ের পাশে এসে দাঁড়াল। হোটেলের হলঘরের ভেতরে সবকিছু তাদের চোখের সামনে। চেয়ার, টেবিল, গেলাস প্লেট এবং ভেতরের লোকজন। জানালার দিকেই মুখ করে, মর্য্যাদার ভঙ্গীতে বছর চল্লিশেক বয়সের একটি লোক বসেছিল। তার চেহারা খুব বড়সড়। গলার স্বর আদেশ করার মত। গায়ের রঙ একটু ময়লা হলেও উজ্জ্বল। কালো দুটো চোখ যেন দপদপ করছে। ঘন কালো তার মাথার চুল। অতিথিদের কথাবার্তা শুনে যখন সে গাল ভরে হেসে উঠছিল—ঝকঝকে দাঁতগুলোও যেন তার ব্যক্তিত্বের গৌরব বাড়িয়ে দিচ্ছিল আরও একটু। লোকটার আচার-আচরণে এক বিশাল বীর্য্যের প্রকাশ। কখনও কখনও সেটাকে মিনমিনে দয়া বা সহানুভূতির ঠিক উল্টো এক নিষ্ঠুর ঔদার্য্য বললেই হয়তো ঠিক বলা হয়।

এই-ই সুসান হেনচার্ডের স্বামী—অন্ততঃ আইনসিদ্ধ স্বামী। এখন অনেক পরিণত। চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ—আগের সেই ঔদ্ধত্যের জায়গায় নিয়ম-শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বয়স হয়েছে। এলিজাবেথের মনে, তার মায়ের মত কোনও পূর্বস্মৃতির গুরুভার বহন করতে হচ্ছিল না। তাই গভীর ঔৎসুক্য ও আগ্রহভরে সে দেখছিল তার এই স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ সম্মানীয় আত্মীয়টিকে। তাঁর পরনে পুরনো ধাঁচের দামী স্যুট। বোতামে বোধহয় মণিমুক্তা বসানো, গলায় সোনার হার। তাঁর সামনে তিনটে গেলাস—বেঁটেমত একটা গেলাসে শুধু জল। মদের গেলাসদুটো খালি দেখে তার স্ত্রী একটু আশ্চর্য্য হ'ল। শেষ যখন সে তাকে দেখেছিল, সেই মেলায়, পরনো সুতির জ্যাকেট গায়ে—সামনে এক গেলাস ফামিটি নিয়ে, বুড়ীর দোকানে বসে—তার থেকে আজ কত তফাৎ। দেখে ধোঁকা লেগে গেল। অফিস-বাড়ির দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে। সব কিছু যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় মেয়ের স্পর্শে ঘোর কেটে গেল। এলিজাবেথ ফিসফিস করে বলল—মা, দেখেছ?

হু, দেখেছি। মা তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—আর কিছু দেখতে চাই না। এখন চলে গেলে বাঁচি। সেই মরণ কি আমার হবে?

কেন? মেয়ে আরও কাছ ঘেসে বলল—উনি কি আমাদের ভাল চোখে দেখবেন

না, তাই ? কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে কী ভদ্রলোক ! হীরে ঝকমক করছে ! কি আশ্চর্য্যের কথা মা ! তুমি ভেবেছিলে মরে গেছে নয়তো কোথাও গোলামি করছে। এমন অদ্ভুৎ কাণ্ডও ঘটে ! কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছ কেন মা ? আমার তো একটুও ভয় করছে না। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করব—কী আবার বলবে ? বড়জোর বলবে—অত দূরসম্পর্কের আত্মীয় আমি চিনি না।

বলতে পারি না বাপু। কি হবে না হবে। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে আমার।

ও'রকম কোর না, মাগো ! এই তো আমরা সব পেয়ে গেছি। তুমি আর একটু বসো এখানে। আমি আরও ভাল করে খোঁজ খবর নিচ্ছি।

আমি বোধহয় মিঃ হেনচার্ডের সঙ্গে দেখা করতে পারব না। তাঁর সম্পর্কে আমি এ'রকম ভাবতেই পারি নি। না, না, আর দেখা করতে চাই না।

দাঁড়াও না, আর একটু ভেবে দেখো।

এলিজাবেথকে এর আগে কখনও এত উৎসাহী দেখা যায় নি। তারই একজন আত্মীয়ের এমন গৌরবজনক পদমর্য্যাদা কল্পনায়ও জাগে নি তার মনে। সে আবার তাকিয়ে দেখল। অল্পবয়সী ভদ্রলোকেরা বেশ গল্প করছে আর মন দিয়ে খাচ্ছে। আর বয়স্ক লোকেরা টুকটাক মুখে দিচ্ছে। প্রত্যেকের পানীয়ের গেলাস আবার ভর্তি করে দেওয়া হ'ল। কিন্তু মেয়র কেবলমাত্র সেই বেঁটে গেলাসে করে জল ছাড়া অন্য কোনও পানীয় গ্রহণ করলেন না।

ওরা মিঃ হেনচার্ডের গেলাসে মদ দিল না কেন ? এলিজাবেথ সাহস করে সেই বুড়োটাকে জিজ্ঞাসা করল।

ও ! তুমি বুঝি তাও জানো না। উনি কোনরকম মদ স্পর্শই করেন না। কক্ষনো না। ওঃ ! সেদিক দিয়ে গুণ আছে। শুনেছি ওঁনার নাকি কি দিব্যি দেওয়া আছে—তাই অন্যরাও ওঁকে বেশী চাপাচাপি করে না। ভগবানের নামে দিব্যি দেওয়া তো সোজা কথা নয়।

আর একটা বুড়ো এইসব আলাপ শুনে আলোচনায় যোগ দিল—আর যেন কতদিন ওঁকে মানতে হবে এটা, সলোমন ?

আরও তো দু'বছর শুনেছি। কেন যে এই সময়ের বাঁধাবাঁধি তাও বোধহয় উনি কোনদিন কাউকে বলেন নি। আরও ঠিক দুটি বছর—সবাই বলে। লোকটার মনের জোর আছে বটে।

সত্যি কথা। তবে তার মধ্যেও আশা আছে—তুমি যখন জানছ আর মাত্র চব্বিশটা মাস—তারপরে আমি যতখুশী খাব—পুষিয়ে নেওয়া যাবে তখন। আর চিন্তা কি বলো ? এটাই কম আশা নাকি ?

তাতে সন্দেহ নেই, ক্রিস্টোফার! ঐ রকম আশা থাকাই উচিৎ। নাহলে একেবারে নিঃসঙ্গ—বৌ নেই, ছেলেপুলে নেই—সলোমন উত্তর দিল।

বৌ নেই কেন? এলিজাবেথ প্রশ্ন করল।

ও সে অনেকদিন আগে মারা গেছে। ক্যাস্টারব্রিজে আসার আগেই। সলোমন নিঃসংশয় হয়ে বলল—তবে মদ উনি একদমই স্পর্শ করেন না—আর ওঁর সঙ্গের লোকেরাও বেশী খেলে উনি সেটা পছন্দ করেন না।

ওঁনার সঙ্গে বুঝি অনেক লোক থাকে? এলিজাবেথ বলল।

অ-নে-ক! খুকুমনি! তুমি তো জানো না—আশপাশের এ সমস্ত অঞ্চলে ওঁর মত ক্ষমতা কারও নেই। এ এলাকার যাবতীয় গম, বার্লি, যব, খড়, বিচালি, যত বড় বেচাকেনা সব ঐ মিঃ হেনচার্ডের। যখন প্রথম এখানে আসে তখন কিন্তু কিছুই ছিল না, আর আজ শহরের মাথা। শুধু এ বছরেই যা বদনাম হয়ে গেছে। পচা গম যোগান দিয়েছিল তো, নৈলে মিঃ হেনচার্ডের সঙ্গে তো আর আমার শত্রুতা নেই বা ওঁনার অত কাজ করেছি কোনদিন মন্দকথা বলে নি। কিন্তু এই এতটা বয়েস হ'ল এমন রুটিও কোনদিন খাই নি বাপু। পচা আটার রুটি—জুতোর সোল কোথায় লাগে!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর বক্তৃতা শুরু হল। সবার বক্তৃতাই বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যে হেনচার্ডের গলায় জোরটা বেশী। সে এইসব কেনাবেচারই একটা গল্প বলছিল এবং অন্য একজন লোকের কথা নিয়ে খুব রসিকতা করছিল। সবাই শুনে খুব হো-হো-হো করে হাসল। তার মধ্যে একটা নতুন গলা শোনা গেল—সে তো বেশ হ'ল কিন্তু পচা রুটির কি হবে?

টেবিলের এককোণে দু'চারজন ছোটখাট ব্যবসাদার বসেছিল। তারা অন্যদের থেকে সামাজিক স্তরে একটু খাটো। সেজন্যেই হয়তো তাদের একটা নিজস্ব মতামত থাকত কোনকোনও বিষয়ে। অন্যদের সঙ্গে সায় দিত না। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তাদের এই কথাটা খুব ভাল লাগল। কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই অন্যের পরাজয়ে খুব আনন্দিত হয়। খুব উল্লসিত হয়ে তাদেরও কেউ কেউ বলাবলি করল—হুঁ, হুঁ, মেয়র সাহেব! পচা রুটির কি হবে? ভেতরে যারা ভোজসভায় বসে খাচ্ছিল, তাদের থেকে এদের স্বাধীনতা আরও বেশী। তাই এরা আরও জুড়ে দিল—সেই গল্পটা বলুন তো আগে শুনি।

বাধা পেয়ে মেয়রকে তাঁর বক্তৃতা থামাতে হল।

গমটা এবার নষ্ট হয়ে গেছে—আমি মেনে নিচ্ছি। সে বলল—কিন্তু রুটিওয়ালারা যতটুকু বলেছে, ততটাই আমি কিনেছি এবার। বেশী কিনি নি।

তা সে গরীব লোকেরা খাক বা না খাক। বাইরের লোকটা মন্তব্য করল।

হেনচার্ডের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। রাগটা যেন ফুটে বেরুতে পারছে না। এ সেই রাগ, নেশার ঘোরে যার বশে সে বছর কুড়ি আগে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিল।

বড় ব্যবসার ক্ষেত্রে ঐ রকম অনেক কিছুই ঘটে থাকে। সে বলল—তোমাদের মনে পড়া উচিৎ এ'বারে ফসল ওঠার সময়ে কতদিন ধরে কি রকম ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। বহু বছরের মধ্যে এমন হয় নি। যাই হোক্ আমি প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নিয়েছি। শীগগিরই এইসব দেখাশোনার জন্যে আমি একজন ম্যানেজার রাখব বলে ঠিক করেছি। একজন ম্যানেজার পাওয়া গেলে আর এইসব ভুলভ্রান্তি হবে না।

কিন্তু যেটা হয়ে গেছে, তার জন্যে কি ক্ষতিপূরণ হবে? আগের সেই লোকটা, বোধহয় কোনও রুটিওয়ালা বা আটাওয়ালা, প্রশ্ন করল—পচা গম আমাদের কাছে এখনও যা আছে, তা পাল্টে কি ভাল গম দেবেন?

হেনচার্ডের মুখ আরও কঠিন হ'ল। নিজেকে শান্ত করার জন্যেই হোক বা সময় নেওয়ার জন্যেই হোক, সে গেলাস থেকে জল খেল। সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল—কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেড্যাম্পলাগা, ভিজে গম আবার ভাল গমের মত স্বাদ-গন্ধ ফিরে পায় তো আমি ফেরৎ নেব। কিন্তু তা কখনো হয় না, বুঝলে!

হেনচার্ডকে আর বেশী ঘাঁটানো সম্ভব ছিল না। এই কথা ক'টি বলেই সে বসে পড়ল।

ছয়

বাইরে দর্শকের সংখ্যা এক এক করে বাড়ছিল বেশ। তাদের মধ্যে দু'চার জন বড় বড় মুদিখানার দোকানদার—দোকান বন্ধ করে সহকারীদের সঙ্গে একটু মুক্তবায়ুসেবনে বেরিয়েছিলেন। কেউ কেউ বা অত্যন্ত গরীবশ্রেণীর। কিন্তু এদের সবার থেকে ভিন্নপ্রকৃতির এক আগন্তুককে দেখা গেল। ভারী চটপটে সুন্দর চেহারার এক যুবক—কাঁধে তার ফুল-কাটা একটা কার্পেটের ব্যাগ। গায়ের রঙ ফর্সা, চোখ দুটো উজ্জ্বল। গড়নটা একটু রোগা। হয়তো সে এক-আধ মিনিটের জন্যে তামাশা দেখে মোটেই না দাঁড়িয়ে চলে যেত—যদি না এইসব গম এবং রুটি সংক্রান্ত আলাপ তার কানে পৌঁছুত। তাহলে আর এ কাহিনীও লেখবার

দরকার হ'ত না। কিন্তু বিষয়টা তার খুব পছন্দ হ'ল, তাই পাশের লোকজনদের দু একটা প্রশ্ন করে সে'ও দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

হেনচার্ডের শেষ কথাগুলো "তা কখনো হয় না" তার কানে পৌছবা-মাত্র, আপন মনে হেসে ফেলল সে। পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে, আবছা আলোয় খসখস করে কি যেন লিখল। তারপর পাতাটা ছিঁড়ে, ভাঁজ করে, একবার বোধহয় জানলা দিয়ে ভেতরে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দেবে ভাবছিল, কিন্তু অন্য কিছু চিন্তা করে সবার পাশ কাটিয়ে হোটেলের দরজায় গিয়ে পৌছুল। সেখানে একজন খানসামা চৌকাঠের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুবকটি তাকে চিরকুটটা দিয়ে বলল—এটা এখুনি মেয়রের হাতে পৌছে দাও।

এলিজাবেথ এতক্ষণ এ সবই লক্ষ্য করছিল। কথাগুলোও কানে গেল তার। ঘটনা দেখে এবং কথার সুরে সে বেশ আগ্রহ বোধ করল। ছেলেটার কথায় কেমন যেন উত্তুরে টান, মনে হচ্ছিল স্কটল্যাণ্ডের লোক।

খানসামা চিরকুটটা হাতে নিলে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল—সস্তায় ভাল হোটেল কি আছে এখানে ?

চাকরটা রাস্তার এ-মুড়ো ও-মুড়ো তাকিয়ে বলল—ঐ যে থ্রী-মেরিনারস্। ঐ সামনে। ওটাই ভাল। অবশ্যি আমি কখনো থাকি নি ওখানে।

স্কটল্যাণ্ডবাসী তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে এল। তারপর থ্রী-মেরিনারস এর দিকে চলতে শুরু করল। এখন সে এইজন্যেই বেশী উদ্বিগ্ন। তার লেখা চিরকুটের কি হ'ল না হ'ল সে চিন্তা হয়তো লেখার সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে গেছে। এলিজাবেথ লক্ষ্য করছিল—ছেলেটি চলে গেলে, খানসামাটা চিরকুট নিয়ে মেয়রের হাতে দিল। হেনচার্ড কিছুটা অমনোযোগের সঙ্গে চিরকুটের ভাঁজ খুলল এবং পড়ে ফেলল। তারপরই যেন মুখের চেহারা পাল্টে গেল তার। শস্যদানার আলোচনা শুরু হওয়ার পর থেকে তাকে যতটা মনমরা দেখাচ্ছিল, এখন যেন তার দ্বিগুণ উৎসাহ ফিরে পেয়েছে সে। লেখাটা সে আবার পড়ল ধীরে ধীরে এবং গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। মনে হচ্ছিল এতদিনে সে ঠিক চিন্তার বিষয় খুঁজে পেয়েছে।

খানাপিনা শেষ হয়ে এখন গান শুরু হয়েছে। পচা-গমের কথা ভুলে গেছে সবাই। দুজন তিনজনে বসে খোসগপ্পো করছে আর মূকাভিনয়ের মত হাসছে। কারও কারও চোখের দৃষ্টি শূন্য হয়ে আসছে। তারা যে কিভাবে কোথায় এসেছে, আর কিভাবেই বা বাড়ী যাবে, সে কথা বুঝি চিন্তা করতে পারছে না। অতএব বোকার মত হাসতে হাসতে আপাততঃ বসে থাকাই উচিত ভাবছে। কারও কারও ঘাড়ের থেকে মাথা ঝুলে পড়েছে। লম্ব-চওড়া চেহারা কেউ হঠাৎ কুঁজো হয়ে গেল। কেউ বা ছাদের

দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই। কেবল হেনচার্ড এদের সবার থেকে পৃথক—সোজা লম্বভাবে বসে, নীরবে চিন্তা করছে সে।

ন'টা বাজল। এলিজাবেথ মায়ের দিকে ফিরে বলল—ও মা! রাত হয়ে যাচ্ছে, এখন কি করবে?

মাকে অত ভেঙে পড়তে দেখে এলিজাবেথ আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার মা বিড়বিড় করে বলল—যেখানে হোক শুয়ে পড়লেই হয়। মিঃ হেনচার্ডকে দেখা আমার হয়ে গেছে—আর কোন বাসনা নেই।

এলিজাবেথ সান্ত্বনা দেওয়ার স্বরে বলল—আচ্ছা, আজ রাতটা থাক, কাল সকালে ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে। এখন তো আমাদের একটা থাকার জায়গা দরকার।

মা কোনও কথা বলছে না দেখে, এলিজাবেথের মনে পড়ে গেল 'থ্রী মেরিনারস' হোটেলটাতে খরচ খুব অল্প। একজনের কাছে যখন ভাল তখন অপরের কাছেও ভাল হওয়া স্বাভাবিক। এলিজাবেথ মাকে বলল—ঐ ছেলেটি যেখানে গেল, চল সেখানে যাই। বেশ ভদ্রঘরের ছেলে, তাই না?

তার মা মাথা নাড়ল। দুজনে হাঁটতে শুরু করল তারপর।

মেয়র ওদিকে চিরকুটটা পড়ে এতই গভীর চিন্তায় ডুবেছিল যে অন্য কিছু খেয়াল ছিল না। খানিকক্ষণ পরে পাশের লোককে সভা চালাতে বলে সে বাইরে এল। ঠিক তার একটু আগেই এলিজাবেথ এবং তার মা ওখান থেকে চলে গেছে। বাইরে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সেই খানসামা। হাত ইশারা করে তাকে ডেকে, হেনচার্ড জিজ্ঞাসা করল, মিনিট পনেরো আগে কে তাকে ঐ চিরকুটটা পাঠিয়েছিল।

একটা যুবক ছেলে, স্যার! মনে হচ্ছিল এখানে বেড়াতে এসেছে। হয়তো স্কচম্যান হবে।

কে দিয়েছে সে কথা কিছু বলল?

ও' তো নিজেই লিখল এই জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে।

তাই নাকি! নিজে লিখল! ছেলেটা বুঝি এই হোটেলে থাকে?

না স্যার, ওকে বোধহয় এখন 'থ্রী মেরিনারস' এ পাওয়া যেতে পারে।

মেয়র পেছনে হাত দিয়ে কতক্ষণ পায়চারী করল হোটেলের দালানে। বোধহয় ভেতরের গরম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সে একটু ঠাণ্ডা পরিবেশ খুঁজছিল। এই নতুন চিন্তা যে তার মগজে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে এ কথা বোঝা যাচ্ছিল বেশ। অবশেষে হলঘরের দিকে এগিয়ে দেখল—তাকে ছাড়া গানবাজনা, খানাপিনা ভালই চলছে। বরং এখন যেন, পানীয়ের ক্রিয়ায় পদমর্য্যাদা এবং বিষয়সম্পত্তির সমস্ত ভেদাভেদ ঘুচে গেছে, দিনের বেলা যেগুলো পরস্পরকে লোহার খাঁচার মত বন্দী

করে রাখে। এই দেখে মেয়র তার টুপিটা নিল, খানসামা ওভারকোটটা পরিয়ে দিল গায়ে। বেরিয়ে এসে সে গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াল একটু।

এখন রাস্তায় লোকজন কমে এসেছে—প্রায় নেই। সামনেই কয়েক শো হাত দূরে 'থ্রী মেরিনারস'-এর দিকে তাকিয়ে দেখল সে। পুরনো বাড়ী, বিশাল গেট, ভেতরে সিঁড়িতে এবং দালানে আলো দেখা যাচ্ছে। সে হাঁটতে শুরু করল ঐ দিকে। আদ্যিকালের বাড়ী। চুণবালি খসে পড়ছে সবদিকে। ঘুলঘুলির মত জানালা। নিচের তলায় বহু জিনিসের দোকান। জুতো-সারাই, চানাচুর ভাজা, বিড়ি সিগারেট কি নেই! সরাইখানায় ঢোকবার পথটি সরু, লম্বা, প্রায় অন্ধকার। দু'পাশে ঘোড়ার আস্তাবল। একটু হন্তদন্ত হয়ে চলতে গেলেই অন্যলোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। ঘোড়ার ক্ষুরের তলায়ও পা পড়ার সম্ভাবনা। তবুও খদ্দের নেহাৎ কম হয় না। অন্ততঃ ভাল আস্তাবল আর তাজা মদ তো পাওয়া যায়। ক্যাস্টারব্রিজে যাদের প্রায়ই আসতে হয়, তারা খুব বোঝে কত ধানে কত চাল।

ঢোকবার মুখে হেনচার্ড একটু থমকে দাঁড়াল। জামার কলারের উপর দিয়ে কোটের বোতামটা এঁটে দিল। কোনরকমে নিজের পদমর্য্যাদা গোপন করে, ঘাড় গুঁজে সে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

সাত

এলিজাবেথ ও তার মা একটু আগেই এসে পৌঁছেছিল। দেখেশুনে বেশ সাধারণ মনে হ'লেও, আর থাকাখাওয়ার খরচ সামান্য বলে শুনলেও, তাদের মধ্যে কুলোবে বলে ভরসা হচ্ছিল না—খানিকটা চিন্তা করে অবশেষে ঢুকে পড়ল তারা। দু'একজন ঝি চাকর দেখা গেল। তা সত্ত্বেও মালিক নিজেই আস্তে আস্তে ঘর দেখাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। এতই আস্তে যে মনে হচ্ছিল ইচ্ছে করলে সে না'ও দেখাতে পারে। নেহাৎ কিনা তার ইচ্ছাটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই—একটু বড় আকারের একটা চেয়ারে সমাসীন, এক বিপুলাকৃতি মহিলার দ্বারা চালিত, তাই। মহিলার শরীরের কোনও নড়ন-চড়ন নেই। কিন্তু চোখ-কান খুব সজাগ। এলিজাবেথ এবং তার মাকে একটা নিরুৎসাহ ঠাণ্ডা আমন্ত্রণ জানানো হ'ল।

সরাইখানাটা বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, ভেতরটা বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার। বারান্দা, ঘরের মেঝে কার্পেটে মোড়া। দেখেশুনে অতিথিদের একটু চোখে ধাঁধিয়ে

গেল। তারা দুজন একাএকা হলে, বয়স্কা মহিলাটি বলল—এই জায়গা আমাদের মত লোকের জন্যে নয়।

ও, এলিজাবেথ উত্তর দিল—তাবলে, আমাদেরও তো মান সম্মান আছে।

মানসম্মানের জন্যে তো আর পয়সার চিন্তা ভুললে চলবে না। মিঃ হেনচার্ড আমাদের স্তরের লোক নন। তাঁর কাছে সাহায্যের আশা করা বৃথা।

নিচে ব্যবসা-সংক্রান্ত কি কথাবার্তা চলছিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারা শুনল। তারপর এলিজাবেথ বলল—দেখি, কি হয়। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সে নিচে খাওয়ার ঘরের দিকে চলল।

মেয়েটির অনেক গুণের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বিশিষ্ট, তা হ'ল, সে অপরের সুবিধার জন্যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। নীচে গিয়ে, সেই মহিলাকে মালিকানী বলেই চিনতে পারল সে। জিজ্ঞাসা করল—আপনাকে তো খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে। আমার মায়ের শরীরটা আবার ভাল না। তা আমাদের খাবার-দাবার, বিছানাপত্রগুলো কি আমি নিজেই নিয়ে যেতে পারি?

হাতল-ওয়ালা চেয়ারে বসা সেই মহিলাকে মনে হচ্ছিল, কোনরকমে গালিয়ে চেয়ারটার সঙ্গে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। এখন আর ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। হাতলের উপরে লম্বা করে হাত দুটো পাতিয়ে তিনি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকালেন। এলিজাবেথের মুখে যেন নতুন কথা শুনলেন তিনি। তবে মালিকানী হিসেবে অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্বদাই নজর তাঁর। তাই আপত্তি করলেন না। মালিক-ভদ্রলোক হাত দিয়ে ইশারা করে ঘাড় নেড়ে দেখিয়ে দিলেন— কোথায় কি আছে। সেই সব নিয়ে এলিজাবেথকে বারদুইতিন ওঠানামা করতে হ'ল।

এমন সময়ে মালিকানী খুব ন্যায্য একটি 'ফরমাশ' করল এলিজাবেথকে—স্কচম্যান ঐ নতুন ছেলেটিরও খাবার দেওয়া হয় নি। দেখ তো, ওঁর খাবারটাও সাজানো হয়ে থাকলে, নিয়ে যেও। এই ঘরের ঠিক উপরের ঘরটা।

এলিজাবেথ নিজে খিদেয় কাতর হলেও, প্রতিবাদ করল না। রান্নাঘরে পাচকদের কাছে খবর নিয়ে দেখল, খাবার তৈরী। সাজিয়ে নিয়ে সে উপরে চলে গেল। এলিজাবেথ দেখল তাকে এবং তার মাকে যে ছোট্ট কুঠুরিটায় থাকতে দেওয়া হয়েছে, এই ভদ্রলোক ঠিক লাগোয়া বড়ঘরটিতে জায়গা পেয়েছেন।

ঘরে ঢুকে সে দেখল, ভদ্রলোক একা, সঙ্গে আর কেউ নেই। এ সেই যুবক যাকে সে একটু আগে বড় হোটেলটার সামনে রাস্তায় দেখেছিল। তিনি আরাম করে গা এলিয়ে একটা স্থানীয় সংবাদপত্র পড়ছেন। কে ঢুকল না ঢুকল অত খেয়াল করলেন না। এলিজাবেথ তাই ভাল করে তাকিয়ে দেখল—ভদ্রলোকের

কপালটা আলো ঠিকরে পড়ে চকচক করছে। চুলগুলো সুন্দর করে ছাঁটা। বেশ ভরাট গোল চিবুক। ভ্রুদুটো আর চোখের পাতা, আহা কি সুন্দর! চোখ নীচু করে পড়ছিলেন তিনি।

এলিজাবেথ থালাটা নামিয়ে, বাটিগুলো সাজিয়ে দিল, কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল। নীচে গেলে তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মালিকানী যেমন মোটা এবং অলস, তেমনই তিনি দয়ালু। খুব যেন মায়া হচ্ছিল তাঁর। এলিজাবেথকে নিজেই সেধে বললেন, সে আর তার মা রাত্রে যদি কিছু খায় তো খেয়ে নিক।

এলিজাবেথ তাদের মত অল্পস্বল্প খাবার নিয়ে উপরে উঠে গেল। থালার কানা দিয়ে দরজা ঠেলে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। আশ্চর্য্য হয়ে দেখে, তার মা বিছানায় শুয়ে নেই। সোজা হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময়ে ওষ্ঠ বিস্ফারিত। এলিজাবেথ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে বলল।

এলিজাবেথদের ঘরটা বোধহয় কখনও পাশের বড় ঘরটার সঙ্গে যুক্ত ছিল। মাঝখানের দরজাটা পাতলা কাঠ বা পিচবোর্ডে পেরেক এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বড় হোটেলের মতই এই 'থ্রী মেরিনার্স'-য়েও পাশের ঘরের কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যায় এপার থেকে।

এলিজাবেথ টুঁ শব্দটি না করে থালাটা নামিয়ে রাখল। মা কানে কানে বলল—ঐ যে তিনি।

কে? —মেয়ে প্রশ্ন করল।

মেয়র।

মেয়ের মনে কোন পাপ ছিল না তাই, নইলে সুসান হেনচার্ডের কাঁপা-কাঁপা গলা শুনে অন্য যে কোন লোকের সহজেই ধারণা হত মেয়রের সঙ্গে মহিলাটির নিশ্চয়ই কোনও সন্দেহজনক সম্পর্ক আছে।

পাশের ঘরে দু'জন লোকে কথা বলছিল। যুবক সেই স্কচম্যান আর হেনচার্ড। এলিজাবেথ যখন রান্নাঘরে ব্যস্ত, সেই সময়েই সরাইখানার মালিক নিজে হেনচার্ডকে ওপরে এনে পৌঁছে দিয়েছিল। থালায় খাবার সাজিয়ে, মেয়ে মাকে ইঙ্গিত করল তার সঙ্গে খাওয়া শুরু করতে। মা যন্ত্রের মত খাওয়া শুরু করল পাশের ঘরের কথাবার্তায় কান পেতে।

বাড়ী যাওয়ার পথে একবার একটু এলাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে—মেয়র খুব আলতো ভদ্রতা করে বললে—কিন্তু তোমার দেখছি এখনও খাওয়া হয় নি।

হুঁ। এখুনি হয়ে যাবে খাওয়া। আপনি একটু বসুন, বেশীক্ষণ লাগবে না। অবশ্যি আপনি এখানেও বলতে পারেন।

হেনচার্ড একটা চেয়ারে বসে পড়েই বলতে শুরু করল—প্রথম কথা হচ্ছে, এ লেখাটা কি তোমার? এক টুকরো কাগজ তার হাতে।

হ্যাঁ—স্কচম্যান উত্তর দিল।

তাহলে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল আমাদের। কাল সকালেই অবশ্যি দেখা হওয়ার কথা, তাই তো? আমিই হেনচার্ড। আড়ৎদারের ম্যানেজার চেয়ে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম আমিই। তুমি নিশ্চয় সেইজন্যেই এসেছ?

না তো। বিস্ময়ের সঙ্গে বলল ছেলেটি।

হতেই হবে। জোর দিয়ে বলতে লাগল হেনচার্ড—তুমিই আসবে বলে চিঠি লেখ নি আমাকে? কি যেন নাম—যোশুয়া, যোশুয়া—জিপ—জোপ—

আপনি ভুল করছেন। ছেলেটি আবার বলল—আমার নাম ডোনাল্ড ফারফ্রী। আড়ৎদারীর ব্যবসা আমার জানা আছে বটে, কিন্তু আমি কোনও বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্তও করি নি—চিঠিও লিখি নি। এখন আমি ব্রিষ্টলে যাচ্ছি। সেখান থেকে কপাল ঠুকে পশ্চিমে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছে আছে। শুনেছি গমের চাষ ওখানে খুব ভাল হচ্ছে। আমার বিদ্যেবুদ্ধি এখানে পরীক্ষা করার সুযোগ নেই, তাই—

কোথায়? আমেরিকা। বেশ, বেশ। হেনচার্ড নিরাশ হওয়াতে ঘরের আবহাওয়া যেন স্যাঁৎসেঁতে হয়ে পড়ল—আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস তুমিই দরখাস্ত করেছিলে।

স্কচম্যান বিড়বিড় করে না না বলে চুপ করে গেল। একটু পরে হেনচার্ডই বলতে শুরু করল—তুমি যে চিরকুটটা লিখে পাঠিয়েছিলে, সেজন্য ধন্যবাদ।

এমন কিছুই নয়।

এই মুহূর্তে আমার কাছে অনেক কিছু। আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি যে এত হাজার হাজার বস্তা গম থেকে পচা গন্ধ বেরুচ্ছে। লোকে কিনা নালিস করল তাই! কিন্তু এখন আমি কি করি! তুমি যদি সত্যিই এমন কোনও পন্থা বার করতে পার, যে এই গন্ধটা অন্ততঃ কেটে যায়, তাহলেই একটা উপায়। লেখা দেখেই আমার মনে হল তুমি পারবে, কিন্তু হাতেহাতে না দেখাতে পারলে, আমি বিশ্বাস করছি না। অবশ্যি সেজন্যে তোমাকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দেব।

যুবকটি দু' এক মিনিট চিন্তা করল। তারপর বলল—আমি দেখিয়ে দিতে রাজী আছি। আমি তো অন্যদেশে চলে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে পচাগম ভাল করার কাজ করতে হবে না, বরং আপনারই এখানে বিদ্যেটা কাজে লাগবে বেশী।

তারপরে সে তার থলে থেকে মুঠ করে কতকগুলো নমুনা বার করে ভাল করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে—কিভাবে কতবার রোদ্দুরে দিতে হবে, ডলা দিয়ে সাদা সাদা ছেৎলাগুলো তুলে ফেলতে হবে—হাওয়া দিতে হবে ইত্যাদি।

এই ক'টা দানা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, কিভাবে গন্ধটা কেটে গেছে।

হুঁ, তা ঠিক। অনেকটাই—প্রায় সবটা গেছে।

এর থেকে বেশী আর হয় না। প্রকৃতির ওপরে তো আর কর্তৃত্ব করা যায় না। এইটুকুতে যদি আপনার কাজ হয় তো আমি খুব খুশী হব।

শোন, আমার কথা শোন। হেনচার্ড বলতে লাগল—আমার ব্যবসা হ'ল আড়ৎদারীর আর খড়-বিচুলির ব্যবসা। খড়-বিচুলিটাই আমি বুঝি বেশী, যদিও আড়ৎদারীর কাজ বেড়ে গেছে বহুগুণ। তুমি যদি রাজী থাকো তো, আড়ৎদারীর কাজটা তোমাকে পুরো দিয়ে দিই। মাইনে ছাড়াও লাভের অংশ পাবে।

আপনার প্রস্তাব খুবই ভাল, খুবই উদার। কিন্তু আমি থাকতে পারব না। তার কথায় মনে হচ্ছিল যেন তার উপায়ান্তর নেই।

তবে তাই হোক। হেনচার্ড শেষমেশ বলল—এখন তাহলে অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে এই অখাদ্য না খেয়ে বরং আমার সঙ্গে চলো আমার বাড়ী।

ডোনাল্ড ফারফ্রী কৃতজ্ঞ বোধ করল, কিন্তু বলল তার কোন উপায় নেই, কারণ আগামী কালই ভোরবেলা তাকে চলে যেতে হবে।

তাহলে আর কি করা যাবে! হেনচার্ড বলল—যাক, আমার অনেক উপকার করলে তুমি, এখন তোমাকে কি দিয়ে খুশী করব বলো!

কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন, কাজে লাগে কিনা। আমার মনে হল, আপনি একটু বেকায়দায় পড়েছেন, সবাই ঠেসে ধরেছে, তাই বললাম।

হেনচার্ড একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল—আমি সহজে ভুলব না তোমাকে। লেখাটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয়েছিল, আমি এই লোককেই খুঁজছি, আর সেও নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে। ভাবলাম—যাক, যোগ্য লোক পাওয়া গেল। কিন্তু এখন দেখছি, তুমি সে নও।

হুঁ, আমি সে নই।

আবার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হেনচার্ড বেশ গম্ভীরভাবে বলল—ফারফ্রী! তোমার কপালটা ঠিক আমার ভাইয়ের কপালের মত দেখতে। নাকটাও অনেকটা সেইরকম। সে অবিশ্যি মারা গেছে অনেকদিন আগে। চেহারাটা তোমার খুব রোগা—গায়ের জোরও আমার থেকে কম নিশ্চয়ই। আমি হিসেব-টিসেব অত শত বুঝি নে—আর তুমি ঠিক উল্টোটি। বছর দুই যাবৎ আমি তোমার মত একটা লোকই খুঁজছি। আচ্ছা, যাবার আগে একটা কথা বলি—তুমি নাহয় আমার সেই লোক নাই হলে, কিন্তু তুমি থেকে গেলে ক্ষতি কি? আমেরিকায় যাবেই একেবারে পণ করে বসে আছ নাকি? আমার কাছে থাকলে কিন্তু খুব উপকার হত আমার

—আর তোমাকেও পুষিয়ে দিতাম আমি।

কিন্তু আমার তো সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। যুবকটির রাজী হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।—একরকম ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি তো. কাজেই আর বেশীবার বলবেন না আমাকে। আসুন, একটু পান করা যাক—ক্যাস্ট্যারব্রিজের এ' পানীয়টি দেখছি শরীরকে বেশ তাজা রাখে।

না, না, ইচ্ছা থাকলেও আমার খাবার উপায় নেই। হেনচার্ড গম্ভীর ভাবে বলল। চেয়ার সরানোর শব্দে মনে হ'ল সে উঠে পড়েছে।—আমার যুবক বয়েসে একবার খুব কড়া পানীয় খেয়ে ফেলেছিলাম। খুবই কড়া! তাতে এমনই একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি যে সারাজীবন আমাকে সেই লজ্জা বয়ে বেড়াতে হবে। তাই সেখানে, সেই মুহূর্তে আমি দিব্যি করেছিলাম—যতটা বয়েস হয়েছিল আমার সেই সময়, আগামী ততদিন আমি চা ছাড়া কোনও কড়া পানীয় গ্রহণ করব না। আমার সে শপথ রেখেছি। তাই, বুঝলে, ফারফ্রী! কখনও কখনও মনে হয় ঢক ঢক করে এক ব্যারেল খেয়ে ফেলি, তবে যদি আমার তৃষ্ণা মেটে। কিন্তু দিব্যি করেছি মনে পড়লেই, পিছিয়ে যাই।

তা'লে আমি আর বেশী বলব না।

যাক্ গে, ম্যানেজার আমার কোথাও জুটে যাবে। হেনচার্ড বেশ দৃঢ়স্বরে বলল —কিন্তু সঠিক লোক হয়তো মিলবে না।

হেনচার্ড যে তার যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয়, একথা ভেবে যুবকটি বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল সে। এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। অবশেষে বিদায় মুহূর্তে বলল—থাকতে পারলে ভালই হত, কিন্তু সে সম্ভব নয়—জগৎটা একবার দেখতে হবে আমাকে।

॥ আট ॥

দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এলিজাবেথ আর তার মা'র তখনও খাওয়া শেষ হয় নি। হেনচার্ড যে পুরনো ভুলের জন্যে যারপরনাই লজ্জিত, একথা ভেবে এলিজাবেথের মায়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দুইঘরের মধ্যিখানের বেড়া নড়ে ওঠায় মনে হল ডোনাল্ড ফারফ্রী ঘন্টি বাজিয়েছে—নিশ্চয়ই খাওয়া হয়ে গেছে তাই বাসনপত্র নামিয়ে নিতে বলছে। ফারফ্রী গুনগুন করে কি সুর ভাঁজছিল

আর পায়চারী করছিল। নীচ থেকে গানবাজনা কোলাহলের আওয়াজ ভেসে আসছে। বাইরে বেরিয়ে আগ্রহ বোধ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ফারক্রী।

খাওয়া সারা হলে, নিজের আর মায়ের এঁটো বাসনগুলো নামিয়ে দিতে এলিজাবেথ নীচে এল। ঠিক এই সময়টাতে প্রত্যেকদিনের মতো উচ্চগ্রামে আলাপ-আলোচনা চলছে। একতলায় বড় হলঘরটাতে উঁকি দেওয়ার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু দৃশ্যটা এত অপরিচিত যে, সমুদ্রের তীরে কুঁড়েতে বাস করে এতদিন তার মনে অমন দৃশ্যের ধারণাই গড়ে ওঠে নি। এলিজাবেথ দেখল প্রায় দু'তিন ডজন বড় বড় চেয়ারে বেশ হোমরা-চোমরা চেহারার কতকগুলো লোক বসে আছে। একটা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখা যায়, কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

তরুণ স্কচম্যানটি এই অতিথিদের সমাবেশে সবে যোগ দিয়েছে। জানালার কাছাকাছি, সুবিধাজনক সীটগুলিতে একটু মান্যগণ্য ব্যক্তিদের আসন। তাদের পেছনে, অন্ধকারে, আর একটু গরীবশ্রেণীর লোকদের জন্যে বেঞ্চির ব্যবস্থা। এদের পানপাত্রগুলোও সাধারণ পেয়ালামাত্র, গেলাসের ব্যবস্থা নেই। এলিজাবেথ ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কয়েকজনকে সে 'কিংস আর্মস' হোটেলটার বাইরেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

এদের সবার পেছনে একটা ছোট্ট জানলা। একটা কাচের মধ্যে চক্রাকৃতি ঘুলঘুলি বসানো। সেটা বিকট আওয়াজ করে কখনও হঠাৎ খুলে যায় আবার বন্ধ হয়ে যায়, আবার খুলে যায়। যথার্থ মনোযোগের সঙ্গে এইসব দেখতে দেখতে, একটা অপূর্ব সুন্দর গানের কলি যেন তার অন্তরে গিয়ে বিঁধলো। আগে থেকেই গানবাজনা হচ্ছিল। যুবক সেই স্কচম্যানটি এখন, অন্যদের দু'একবার অনুরোধ শুনেই গান ধরেছে। গান শুনতে খুব ভালবাসত এলিজাবেথ, না দাঁড়িয়ে পারল না। যতই শুনছিল, ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এমন গান সে আগে শোনে নি, অন্যরাও যে শোনে নি, সেটা বোঝা যাচ্ছিল, তাদের আচরণে। কেউ ফিসফিস করছে না, ভর্তি গেলাস সামনে রেখেও সুরাপান ভুলে গেছে। গেলাসে পাইপ ডোবাতে ভুলে গেছে, এমন কি পাশের লোককে কাপটাও এগিয়ে দিচ্ছে না। গায়ক নিজেই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। এলিজাবেথের মনে হল, গায়কের চোখের কোণে বুঝি এক'ফোঁটা জল—গান হচ্ছিল—

ধন্য—আমি ধন্য—ধন্য আমি—যে
ধন্য—আমি ধন্য—ধন্য মোর দেশ।
অশ্রু মোর আঁখিপাতে মনপ্রাণ হর্ষে মাতে
অ্যানন নদী পার হব যেই, শরীর জুড়োয় আনন্দেতে

কুসুমে যবে কোরক জাগে, বৃক্ষে জাগে নতুন পাতা
বিহগের সুরে ভেসে আসে, আমার দেশের সেই বারতা।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে ফেটে পড়ল হলঘর। তারপরেই গভীর নিঃস্তব্ধতা। সে যেন হাততালির থেকেও বেশী মুখর। এতই স্থির নিঃস্পন্দ চারিদিক যে অন্ধকার কোণে বসে সলোমন লংওয়েজ—এর মনে হল এই মুহূর্তে গেলাসে পাইপ ডোবানোটা ঠিক হবে না—পাছে কোন শব্দ হয়। এমন সময় জানালায় বসানো চক্রাকৃতি ঘুলঘুলিটা ক্যাঁ—চ—র করে ঘুরতে শুরু করল হঠাৎ। ডোনাল্ডের গানের করুণ রস মাঠে মারা গেল।

ও কিছু না, ও কিছু না। বলল ক্রিস্টোফার কোনী। সেও এসেছিল এখানে। ঠোঁটের থেকে পাইপটা আঙুলখানেক সরিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল—আর একখানা হোক, আর একখানা হোক।

আবার হোক, আবার হোক, বলল এক ছুতোর-কাচওয়ালা। মাথাটা তার একটা বালতির মত, পেটানো চেহারা।—এদিককার লোকে কেউ অত গলা ছেড়ে গায় না, তাই না!—বলে পাশ ফিরে সে নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল—কে হে এ ছোকরা? স্কচম্যান, বলছিলে না?

হুঁ, একেবারে স্কটল্যাণ্ডের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে মনে হচ্ছে—বলল কোনী।

ফারফ্রী শেষের লাইন ক'টা আবার গাইল। 'থ্রী মেরিনাস'-এত করুণ গান বহুকাল শোনা যায় নি। ছেলেটির গানের গলা, দেশের টান দেওয়া উচ্চারণ আবেগ আর কী অদ্ভুত দরদ! সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল—এখানকার গায়কদের গানে এত আবেগ কেউ কখনো দেখে নি।

দ্বিতীয়বার গান গাওয়ার পর, স্কচম্যান যেই 'ধন্য মোর দেশ' টান দিয়ে শেষ করল—আগেকার সেই ছুতোর লোকটি বলে উঠল—

এত সুন্দর গানটা, কিন্তু এই ঠগ-বদমাসের জায়গায় কে তার মানে বুঝবে? দেশটা ছেয়ে গেছে শুধু চোর আর জোচ্চোরে। ক্যাস্টারব্রিজের জন্যে এসব গান নয়।

সত্যিকথা! বাজফোর্ড নামে এক দোকানদার বলল টেবিলের দিকে তাকিয়ে—ক্যাস্টারব্রিজ হল যত পুরনো বদমাইসের আড্ডা। ইতিহাসেই তো লেখা আছে, একশো, দুশো বছর আগে আমরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম। রোমান আমলে তো এখানকার অনেককেই গ্যালোজ হিলে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল—আমি কিন্তু বাপু, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি সে কথা।

অতই যদি দেশের জন্যে দরদ, তো, দেশ ছেড়ে-না চলে এলেই হ'ত! ক্রিস্টোফার কোনী মন্তব্য করল পেছন থেকে। আগের বিষয়টাই যেন তার বেশী পছন্দ।—এ

কথাটা ঠিকই—আমাদের উপযুক্ত নয়। মিষ্টর বিলি উইলস ঠিকই বলেছে—আমরা হচ্ছি কিনা হেঁজিপেঁজি মানুষ—শীত কি আর গ্রীষ্ম কি—ওসব সৎ গুণ আমাদের জন্যে নয়—এতগুলো মুখের খাবার জোগাড় করতে হবে—তার ওপর আছে ভগবানের মার—ওসব সুন্দর মুখ আর ফুলের কাহিনী শুনবার সময় কোথায়? তার থেকে বরং ফুলকপির চাষ করব আর শূয়োর পালব—

কিন্তু, না—সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, গম্ভীরমুখে বলল ডোনাল্ড ফারক্রী—আপনাদের মধ্যে সৎলোক নেই? হতেই পারে না, আপনারা কেউ কি চুরি-ডাকাতি করেন?

আরে রামোঃ, না না—বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল সলোমন লংওয়েজ—ও সব উল্টোপাল্টা কথাবার্তা। ও'র মুখে লাগাম নেই, ভাই! যত কুকথা লেগেই আছে। (ক্রিষ্টোফারকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল তারপর)—যে ভদ্রলোকের সম্পর্কে তুমি জান না কিছুই, বিশেষতঃ যিনি সেই উত্তরমেরুর দেশ থেকে এসেছেন এতদূর—তাঁর সঙ্গে না বুঝেসুঝে কথাবার্তা বল কেন হে?

ক্রিষ্টোফার কোনী চুপ করে গেল। অন্য কারও সমর্থন বা সহানুভূতি নেই দেখে, সে নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগল—হুঃ, আমি যদি ও'র অর্ধেকও ভালবাসতাম নিজের দেশকে, তো দেশত্যাগী হওয়ার থেকে বরং প্রতিবেশীর শূয়োরের খোঁয়াড় সাফাই করতাম। আমি বাপু, বটানি উপসাগর যত ভালবাসি, তার থেকে নিজের দেশকে একটুও বেশি ভালবাসি না।

থাক, হয়েছে—বলল লংওয়েজ—ভদ্রলোককে বরং গানটা শেষ করতে দাও, নৈলে সারারাত কাটাতে হবে এখানে।

ও গান ওখানেই শেষ—গায়ক খুব বিনয়ের সঙ্গে জানাল।

ও মা সেকি! তাহলে আরেকটা হোক—বলল একজন দোকানদার।

আচ্ছা, মেয়েদের নিয়ে বেশ একটা মজার গান গাইতে পারো? একটি মোটাসোটা আধবুড়ী গোছের মহিলা জিজ্ঞেস করল।

একটু দম ফেলতে দাও, ও মাসি! দম ফেলতে দাও একটু—এই তো সবে একটা শেষ হল—আগেকার সেই কাচওয়ালা বলে উঠল।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—উৎসাহের সঙ্গে বলল সেই যুবক। তারপরই 'ও ন্যানী' বলে গান ধরল সে। গানের সুর, তাল একেবারে নিঁখুৎ। একই ধরণের আরো দু'তিনটি গান গাইল সে, অবশেষে সবার অনুরোধে—'ওউল্ড ল্যাং সাইনে' গানটা দিয়ে শেষ করল।

এতক্ষণে সমস্ত শ্রোতাকুলের মধ্যে ফারফ্রী নায়ক হয়ে উঠেছে। এমন কি

বৃদ্ধ কোনীও তার গুণে মুগ্ধ হয়ে গেল। ক্যাস্টারব্রিজের লোকেরও সেন্টিমেণ্ট আছে, মনে রোমান্স আছে—কিন্তু এই অপরিচিত যুবকের সেন্টিমেণ্ট যেন একেবারে অন্যরকমের। বা হয়তো পার্থক্য এমন কিছুই নেই—ঠিক যেন এক নতুন কবি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে ঝড় তুলে দিলেন। নতুন কিছু বলার জন্যে নয়, সবার অনুভূতিকে স্পষ্ট করে বলাটাই তাঁর কৃতিত্ব।

হোটেলের মালিক নির্বিবাদী মানুষ। সেও এসে দাঁড়িয়েছিল গান শুনতে। এমন কি তার ওপর যিনি মালিক, সেই গিন্নীও কোনরকমে চেয়ার থেকে নিজেকে মুক্ত করে, দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তেলের পিপে যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে আনতে হয়, মিসেস ষ্ট্যানিজকেও অনেকটা সেই উপায়ে এতখানি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছে।

তা আপনি কি ক্যাস্টারব্রিজে থেকে যাওয়াই মনস্থ করলেন?—ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করল।

না—আ—গলার স্বরে বিষাদ ঢেলে বলল ফারফ্রী—আমাকে চলে যেতে হবে। এখান থেকে ব্রিষ্টল—সেখান থেকে একেবারে পশ্চিম—অ-নে-ক দূর।

আ-হা, এতো খুবই দুঃখের কথা, বলল সলোমন লংওয়েজ, কালেভদ্রে এমন গান শুনতে পাই আমরা। তাছাড়া আপনি তো আসছেন সেই চিরতুষারের দেশ থেকে যেখানে নেকড়েবাঘ আর বুনো শুয়োর ঘুরে বেড়ায় কুকুরবেড়ালের মত। এমন লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়াই কি কম ভাগ্যের কথা। আবার তাঁর গলায় গান শোনা।

না, আপনারা আমার দেশ সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছেন—দুঃখিতভাবে সবার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ফারফ্রী বলল তাদের ভুল শুধরে দিতে—সে দেশে বাঘভালুকও নেই, সর্বদা বরফও পড়ে না। হ্যাঁ শীতকালে অবিশ্যি বরফ পড়ে, আর মাঝেমাঝে গরমের সময়ও পড়ে বটে।—তা একবার গেলেই হয় গরমকালে এডিংবোরো—রাজা আর্থারের দেশ—সে শুধু পাহাড় আর নদী—আহা কি অপরূপ দৃশ্য! মে-জুনমাসে যেতে হয়—গেলে পরে আর নেকড়েবাঘ, বরফের দেশ বলে মনে হবে না।

না, না, সে তো একশোবার—বাজফোর্ড বলল—না জানলে পরে লোকে অমন কত কথা বলে! ও মুখ্যু-সুখ্যু লোক—ভদ্রসমাজে কি কখনো মিশেছে যে জানবে—না, না আপনি কিছু মনে করবেন না ভাই।

তা'লে কি আপনি লেপ-তোষক, কাঁথা-কম্বল নিয়েই চললেন? না কি যেমন দেখছি, এই খালি হাতে?—ক্রিষ্টোফার কোনী জিজ্ঞেস করল।

জিনিসপত্র সব আগে পাঠিয়ে দিয়েছি। বেশি কিছু নয় অবিশ্যি। অনেকদূর যেতে হবে তো!—ডোনাল্ডের চোখদুটো ছোট হয়ে দৃষ্টি যেন কোন সুদূরে প্রসারিত

হয়ে গেল—তবে আমি নিজেকে বলি—কষ্ট না করলে তো কেষ্ট মিলবে না—ঠিক যখন করেছি—যাবই।

একটা সার্বজনীন দুঃখ সবার মনে ভার হয়ে চেপে বসল। এলিজাবেথও তা থেকে বাদ গেল না। দরজার পাল্লার পেছন থেকে দেখতে দেখতে সে ভাবছিল—আহা, গানের গলা যত মধুর, কথাবার্তাও কি সুন্দর! কোথাও যেন তার মনের সঙ্গে ওরও একটা মনের মিল আছে। জীবনের গম্ভীর দিকগুলোকে গুরুত্ব দিয়েই দেখা উচিত। ক্যাস্টারব্রিজের ঐসব উধো-বুধোগুলোর মত, লোকটি বদমাইসি আর যত শয়তানির মধ্যে হাসি-ঠাট্টার কিছু দেখে নি। ঠিকই তো—এ তো আর আমোদের ব্যাপার নয়। ক্রিষ্টোফার কোনী আর তার দলবলের ঠাট্টা-মস্করা এলিজাবেথের একদম পছন্দ হয় নি—ওঁরও ভাল লাগে নি। এলিজাবেথের মতই লোকটির যেন ধারণা—জীবনের বেশিরভাগটাই দুঃখকষ্টে গড়া—আনন্দ আর মজা মূল নাটকের প্রক্ষিপ্ত অংশ মাত্র। কি করে এত মিল হল দুজনের ভাবনায়!

এখনও বেশি রাত হয় নি। কিন্তু স্কচম্যান ভদ্রলোকটি উঠে পড়তে চাইছিল। তাই দেখে হোটেলের মালিকানী এলিজাবেথকে ফিসফিস করে বলল, ওপরে গিয়ে ওঁর বিছানাটা পেতে দিতে। একটা বাতি নিয়ে এলিজাবেথ তার কর্তব্য পালন করতে চলে গেল। বিছানা পাতা অল্প কিছুক্ষণের ব্যাপার। বেরিয়ে, নেমে আসার পথে, ঠিক সিঁড়ির গোড়াতেই দেখা গেল ফারফ্রী উঠে আসছে। তখন আর এলিজাবেথের ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। সিঁড়িতেই তাদের দেখা হয়ে গেল পরস্পরের সঙ্গে।

সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ সত্ত্বেও এলিজাবেথকে নিশ্চয়ই কোন কারণে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল—অথবা হয়তো সাধারণ পোষাকেই তাকে মানাত ভালো—এমনই এক সরলতার দীপ্তি তার চোখেমুখে। ঘটনার আকস্মিকতায় এলিজাবেথের মনে হল যেন পালাতে পারলে বাঁচে। বাতিটাকে ঠিক নাকের সামনে ধরে, শিখার দিকে চোখ রেখে কোনমতে নেমে এল সে। ঠিক সামনাসামনি আসতে ফারফ্রী হেসে ফেলল। তারপরে লঘুচিত্ত ব্যক্তির মত, সুরের রেশ যার গলা থেকে তখনো মিলিয়ে যায় নি, গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল। এলিজাবেথের মনে হল সেটা এক পুরাতন গীতি—

আমার চিলেকোঠার দরজা খুলে
ক্লান্ত আঁখি মেলে দেখি,
সিঁড়ির পথে নেমে এল
আমার হৃদয়পুরের চেনা পাখি।

থতমত খেয়ে পালাল এলিজাবেথ। আর স্কচম্যানের গলা মিলিয়ে গেল তার

ঘরের দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে।

এই দৃশ্য এবং অনুভূতির আপাততঃ শেষ হল এখানে। একটু পরে মেয়ে যখন মায়ের কাছে ফিরে এল, তার মা তখন চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে—তবে সে মগ্নতার কারণ ঐ যুবকের গান বা স্বর নয়।

একটা ভুল হয়ে গেছে—ফিস ফিস করে বলল তার মা (যাতে স্কচম্যান না শুনতে পায়)—কোনমতেই তোর ঐ খাবারদাবার আনতে যাওয়া উচিত হয় নি। নিজেদের জন্যে তো কিছু নয়, কিন্তু কথাটা 'ওঁর' কানে গেলে কি হবে! যদি আমাদের চিনতে পারেন আর থেকে যেতে বলেন, তাহলে যখন শুনবেন, তুই আজ এখানে যা করেছিস—এখানকার 'মেয়র' হয়ে ওঁর মানসম্মান কোথায় যাবে! ভীষণ খারাপ হল কাজটা!

এলিজাবেথ যদি প্রকৃত সম্পর্কের কথা একটুও জানত, তাহলে হয়তো তার উদ্বেগটা হত আরও বেশী। কিন্তু এম্নিতে তার মোটেও খারাপ লাগে নি। কারণ তার 'উনি'-টি তার মায়ের 'উনি' থেকে ভিন্ন আরেকজন। সে বলল—তাতে কি হয়েছে মা? আমার একটুও খারাপ লাগে নি। কী ভদ্র আর শিক্ষিত! এখানকার কেউ ওঁর মত নয়। ওরা বোধহয় ভেবেছিল খুব সাদাসিধে লোক—এখানকার হালচাল কিছু জানেন না। জানেন না ঠিকই—ওঁর মনটা এদের থেকে অনেক উঁচু। এলিজাবেথ মাকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

ইতিমধ্যে তার মায়ের 'উনি'-টি কিন্তু বেশীদূর যান নি। 'থ্রী মেরিনার্স' থেকে বেরিয়ে তিনি রাস্তায় পায়চারী করতে করতে শুনতে পেলেন ফারফ্রীর গান। জানালার খড়খড়িপথে সে স্বর তাঁর কানে আসছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনলেন।

নাঃ আর ভুল নেই! ছোকরা নিশ্চিত টানছে আমাকে—হেনচার্ড নিজের মনে বলল—বোধহয় আমি এত একা তাই। নাহয় ওকে ব্যবসার তিনভাগের একভাগ অংশীদারই করে নেব।

॥ নয় ॥

পরের দিন সকাল হলে, এলিজাবেথ যখন জানালার কপাট খুলে দিল, একরাশ হিমেল হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর। গ্রামদেশের মতই মনে হল—শরৎকাল এসে পড়েছে। ক্যাস্টারব্রিজ গঞ্জ হলেও, আশপাশের গ্রামগুলোর পরিপূরকমাত্র, ঠিক বিপরীতধর্মী কোন শহর নয়। মৌমাছি আর প্রজাপতিরা, ওপরের দিকের

ফসলের ক্ষেত থেকে নিচের মাঠে নামতে হলে, ঘুরপথে যায় না—বরং শহরের ভেতর দিয়েই হাই ষ্ট্রীট বেয়ে সোজা নেমে যায় অভ্যস্তভঙ্গিতে—একবারও যেন তাদের মনে হয় না—অচেনা কোন পরিবেশে এসে পড়েছে। শরৎকাল এলে পরে, একই রাস্তায় দেখা যায় বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে থিসলডাউনের বীচিশুদ্ধ আঁশ—কোথাও সেগুলো দোকানের গায়ে আটকে আছে, কোথাও বা পড়ে আছে নর্দমায়। অসংখ্য হলদে বা বিচিত্র রঙের পাতা পড়ে আছে ফুটপাথে—কোথাও বা খোলা দরজা পথে ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে—মেঝের পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে খসখসে আওয়াজ তুলে—সতর্ক সাবধানী নারীর স্কার্টের শব্দের মত।

একেবারে পাশের ঘর থেকেই গলার স্বর শুনতে পেয়ে এলিজাবেথ মাথা টেনে নিল ভিতরে—এবারে জানালার পর্দার আড়াল থেকে দেখতে লাগল আগ্রহভরে। মিঃ হেনচার্ডের চালচলন এখন বড় সম্মানীয় ব্যক্তির মত নয়, শুধু একজন অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারের মত—চলতে চলতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছেন তিনি—আর স্কচম্যানটি ঠিক এলিজাবেথের পাশে জানালা থেকেই তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। হেনচার্ড, মনে হচ্ছে, আগের দিনের এই পরিচিত ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়ার আগে, সরাইখানা ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েক পা পিছিয়ে এলেন তিনি—ফারফ্রীও তার জানালা আরও খানিকটা খুলে দিল।

তুমি বোধহয় বেরুবে এখুনি? মিঃ হেনচার্ড ঘাড় উঁচু করে বললেন।

হ্যাঁ, এই এখুনি আর কি। অপরজন বলল—একটু হেঁটেও যেতে পারি গাড়ীর দেখা না পাওয়া পর্য্যন্ত।

কোনদিকে যাবে?

এই আপনি যেদিকে যাচ্ছেন।

তাহলে, এসো, হাঁটতে হাঁটতে শহরের মুড়ো পর্য্যন্ত যাই।

আচ্ছা, আসছি, দাঁড়ান এক মিনিট।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি নেমে এল। হাতে সেই ব্যাগ। মিঃ হেনচার্ড ব্যাগটার দিকে এমন করে তাকালেন, যেন সেটি তাঁর প্রতিপক্ষ। ছেলেটি যে চলেই যাবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। হেনচার্ড বললেন শোনো ভাই! তুমি আমার সঙ্গে থাকলে, বুদ্ধিমানের কাজ করতে।

হুঁ, সেটাই বোধহয় ভাল হ'তো। ডোনাল্ড বলল। আশপাশের বাড়ীগুলোর দিকে সে যেন অণুবীক্ষণের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। আসলে আমি কী যে করি, কিছু ঠিক ঠিকানা নেই।

কথা বলতে বলতে তারা অনেকদূর চলে গেল। আর তাদের কথা শোনা যাচ্ছিল

না। তবে এলিজাবেথ দেখতে পাচ্ছিল—মিঃ হেনচার্ড হাত নেড়ে নেড়ে কিছু একটা বোঝাচ্ছেন খুব জোর দিয়ে। আস্তে আস্তে তাঁরা বড় হোটেলটা, সদর বাজার, সেণ্ট পীটার্স গীর্জা ছাড়িয়ে চলে গেলেন। দূর থেকে তাঁদের দুটো গমের দানার মত দেখাচ্ছিল। মোড় ঘুরে তাঁরা ব্রিষ্টলের রাস্তায় পড়লেন।

এলিজাবেথ মনে মনে বলল—কী ভালো মানুষ! চলে গেল! আমি ওর তুলনায় কিছুই নই। তা আমার কাছে বিদায়ই বা চাইবে কেন!

এ'রকম ভাবার কারণ আর কিছুই নয়—ছেলেটি দরজা খুলে বাইরে এসেই কেন যেন এলিজাবেথের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল, হাসলো না, মাথাও নাড়ল না, কোন কথাও বলল না।

ঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ বলল—মা! তুমি এখনও ভাবছ?

হুঁ ভাবছি মিঃ হেনচার্ডের এই ছেলেটাকে হঠাৎ ভাল লাগার কথা। উনি চিরকালই ঐ রকম। অনাত্মীয়, অপরিচিত লোককে এতখানি ভালবাসছেন যখন, নিজের আত্মীয়দের কি ভালবাসবেন না?

কথা বলতে বলতে তারা দেখল পাচটা অতিকায় গাড়ী বোঝাই হয়ে খড়-বিচুলি এল শহরে। এত উঁচু করে সাজানো যে একতলা প্রায় ছাড়িয়ে যায়। গ্রামের দিক থেকে এল—ঘোড়াগুলোর গা ঘামছে দরদর করে। সারা রাত ধরেই বোধহয় হাঁটছে তারা। প্রতিটি গাড়ীর গায়েই একটা বোর্ডে সাদা রঙে লেখা—"হেনচার্ড—মহাজন ও আড়ৎদার"। এইসব দেখে হেনচার্ডের স্ত্রী ঠিক করল, মেয়ের প্রয়োজনেই, শত কষ্টস্বীকার ক'রেও হেনচার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে।

সকালের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের আলাপ-আলোচনা চলল। মিসেস হেনচার্ড স্থির করল—ভালই হোক আর মন্দই হোক, খবরটা সে এলিজাবেথকে দিয়ে হেনচার্ডের কাছে পাঠাবে। বলবে, সুসান নামে এক নাবিকের স্ত্রী এখানে এসেছে। তারপর তিনি চিনতে পারলেন কি না সেটা যেন এলিজাবেথ তাঁর ওপরেই ছেড়ে দেয়। সে শুনেছিল যে, হেনচার্ড এখন নিঃসঙ্গ বিপত্নীক। এবং পুরনো ভুলের জন্যে যে তিনি অনুতপ্ত, এটা তো নিজের কানেই শুনেছিল। দুটোতেই কিছু আশার হাতছানি ছিল।

এলিজাবেথ জামাটামা গায়ে দিয়ে যাবার জন্য তৈরি হলে, তার মা আরও বলল—উনি যদি বলেন না, কিম্বা অমন কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়, তবে বলিস—তাহলে আমরা আর আপনাকে বিরক্ত করব না—যেমন নীরবে ক্যাস্টারব্রিজে এসেছি তেম্নি নীরবেই আমাদের দেশে ফিরে যাব। আমার তো মনে হচ্ছে উনি এইকথা বললেই ভাল হয়। কত বছর ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ নেই

আর তাছাড়া আমাদের সম্পর্কও তো খুব দূরের কিনা!

আর যদি বলেন হ্যাঁ—মেয়ের মনে ভরসা ছিল, তাই জিজ্ঞেস করল।

তাহলে—মিসেস হেনচার্ড খুব সাবধানে বলল—বলিস আমাকে একটা চিঠি লিখতে। কোথায় আর কিভাবে আমাদের সঙ্গে বা শুধু 'আমার' সঙ্গে দেখা হতে পারে।

এলিজাবেথ কয়েক পা এগিয়ে গেল। মা আরও বলল—বলবি, আমার তাঁর উপরে কোন দাবি বা জোর নেই। তাঁর আরও উন্নতি হলে আমি খুশী হবো। আরও দীর্ঘ, সুখী জীবন হোক তাঁর। যা আয় গে যা। খুবই দ্বিধাজীর্ণ চিত্তে, খানিকটা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, মা তার সরল মেয়েকে পাঠাল খবরটা দিয়ে।

সকাল প্রায় দশটা বাজে। আজ হাটবার। এলিজাবেথ আস্তে আস্তে দেখতে দেখতেই চলেছিল। তার নিজের কাছে তো ব্যাপারটা এক ধনী আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ছাড়া কিছু নয়। প্রায় সব বাড়ীরই সদর দরজা খোলা। ভেতরে তাকালে মনে হচ্ছিল—সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ভেতরবাড়ীর বাগান উঠোন দেখা যাচ্ছে। বাজারের মধ্যে এসে এলিজাবেথ দেখে বহু গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দু'ধারে। হাটবার বলে আশপাশের সব গ্রাম থেকে এসেছে। তাছাড়া রাস্তার অনেকখানি জায়গাই দু'পাশের দোকানদাররা যথাসম্ভব পক্ষবিস্তার করে জিনিসপত্র সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। অদূরেই দু'জন কনেষ্টবল দাঁড়িয়ে কিন্তু তাদের সে ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ নেই।

হাট করতে এসেছে যেসব গাঁয়ের লোকজন, তাদের কথাবার্তা কেমন যেন স্পষ্ট নয়, আধো-আধো। হাত, মুখ, টুপি, লাঠি; সারা শরীরই যেন তাদের জিভের সঙ্গে কথা বলে। খুব খুশী হলে তাদের গাল টানটান হয়ে যায়, চোখ মুদে যায় আর ধড়টা যায় পিছনে হেলে। অবাক হলে কিন্তু তাদের চোখদুটো ঘুরপাক খেতে থাকে আর মুখের রং হয়ে যায় লাল। আশপাশের সমস্ত এলাকার মধ্যে ক্যাস্টারব্রিজ হ'ল রাজধানী। গাঁয়ের চাষীদের আশা-ভরসার স্থল। ক্যাস্টারব্রিজেরও পেশা বলা যায় চাষবাস—কারণ গাঁয়ের চাষীর সুখ দুঃখের হিস্যে এখানকার ব্যবসাদারদের কাঁধেও এসে পড়ে কিছুটা।

এলিজাবেথকে খুব বেশী খুঁজতে হ'ল না। হেনচার্ডের বাড়ী শহরের ভাল বাড়ীগুলোর মধ্যে একটা। ইঁটের দেওয়াল লাল রং করা। সদর দরজা খোলা—এলিজাবেথ ভেতরে তাকিয়ে বাগান-বাগিচা সবই দেখতে পাচ্ছিল।

মিঃ হেনচার্ড বাড়ী ছিলেন না। ভেতরদিকে উঠোনে কাজ কর্ম দেখাশোনা করছিলেন। সেখানেই গিয়ে হাজির হ'ল সে। উঠোনে অনেকগুলো বিচালির

গাদা। সকালবেলায় দেখা গাড়ীভর্তি খড়বিচালি সে তুলনায় কিছুই নয়। তার পাশে কাঠের তৈরী গোলা। এই গোলাতেই গম রাখা হয়। মই বেয়ে উঠে ভেতরে ঢুকতে হয় গোলার। এলিজাবেথ এখানেই কিঞ্চিৎ অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করছিল প্রার্থিত সাক্ষাতের আশায়। একটা বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানল যে মিঃ হেনচার্ড পাশের অফিস ঘরে বসে আছেন। দরজায় টোকা দিতেই বেশ জোর গলায় আহ্বান শোনা গেল—ভেতরে এসো।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে, এলিজাবেথ টেবিলের উপর কতকগুলো নমুনা—ব্যাগ দেখতে পেল। কিন্তু সেখানে মালিকের বদলে দাঁড়িয়ে আছে সেই যুবক স্কচম্যান মিঃ ফারফ্রী। হাতে সে গমের দানা নিয়ে পরখ করছে। ঘরের এককোণে পেরেকের গায়ে ঝোলানো তার টুপি আর ব্যাগ। ব্যাগের গায়ে আঁকা গোলাপফুল-গুলো যেন হাসছে।

এলিজাবেথ এতক্ষণ মিঃ হেনচার্ডকে কি বলবে সেটাই তৈরী করছিল মনে মনে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুখের কথা হারিয়ে গেল তার।

কাকে চাই? স্কচম্যান জিজ্ঞেস করল—যেন সে এখানকার পুরনো লোক।

এলিজাবেথ বলল সে মিঃ হেনচার্ডের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ও! আচ্ছা! একটু অপেক্ষা করতে হবে। উনি এখন ব্যস্ত আছেন। যুবকটি বলল। মেয়েটিকে সে আগে দেখেছে বলে মনেই হ'ল না। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে, বসতে ইঙ্গিত করে সে আবার নিজের কাজে মন দিল।

সেদিন সকালে হেনচার্ড আর ফারফ্রী, দুই সদ্যোপরিচিত বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয় নি। শহরের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে তাদের চোখে পড়ল—উত্তর ও পশ্চিমের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর। সামনেই সুদীর্ঘ পথ। এই পথেই যেতে হবে ফারফ্রীকে। হেনচার্ড তার ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—আচ্ছা বন্ধু, শুভেচ্ছা রইল। তার কথায় একটা পরাজয়ের অসৌজন্য। আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়বে কিভাবে, আমার এক প্রয়োজনের মুহূর্তে তুমি এসে উপস্থিত হয়েছিলে।

যুবকটির হাত ধরা অবস্থাতেই সে আরও বলল—তাহলেও, তুমি চলে যাওয়ার আগে আর একবার জিজ্ঞাসা করি—থাকবে এখানে? ঐ যে তোমার পরীক্ষাগার পড়ে আছে সামনেই। বুঝতেই পারছ, আমার বারবার বলার মধ্যে নিজের স্বার্থ হয়তো কিছুটা আছে, কিন্তু তা ছাড়াও আরও কিছু ছিল, সে কথা বোধহয় আর বলা ঠিক হবে না। বলো, তুমি কি চাও? আমি যে কোনও শর্তে রাজী। লাভ লোকসান ছেড়ে দাও ফারফ্রী! তোমাকে আমার ভাল লেগেছে।

যুবকটির হাত তখনও হেনচার্ডের হাতের মধ্যে। সে একবার বিস্তৃত মাঠের দিকে তাকাল। তারপর পিছন ফিরে তাকাল ফেলে-আসা শহরের দিকে। তারপর সে হেসে ফেলল।

আমি একবারও ভাবি নি এ'কথা—সে বলল—সবই কপাল। এজায়গা কি ছেড়ে যাওয়া উচিৎ? নাঃ, আমেরিকায় আমি যাব না, আপনার কাছেই থেকে গেলাম।

এতক্ষণ তার হাত হেনচার্ডের হাতের মধ্যে ধরা ছিল। এবারে সেও হেনচার্ডের হাত চেপে ধরল মুঠো করে।

ঠিক তো? বলল হেনচার্ড।

ঠিক। উত্তর দিল ডোনাল্ড ফারফ্রী।

উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল হেনচার্ডের মুখ।—এখন যথার্থই তুমি আমার বন্ধু। সে চেঁচিয়ে উঠল—চলো আমার বাড়ী চলো, এখুনি আমরা চুক্তিটা সেরে ফেলব। যাতে পরে আর কখনও ভুল বোঝাবুঝি না হয়। ফারফ্রী ব্যাগটা কাঁধে ফেলে, পুরনো পথেই ফিরে এল হেনচার্ডের সঙ্গে সঙ্গে।

কাউকে যদি আমার ভাল না লাগে, তো একেবারে সম্পর্কই রাখি না—হেনচার্ড বলল—আর কাউকে যদি ভাল লেগে যায়, তো পুরোটাই ভাল লাগে। তুমি নিশ্চয়ই অত ভোরে কিছু খেতে পার নি। এসো, আর একবার সকালের খাবার খাওয়া যাক। সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়াটাও সেরে ফেলা যাবে। তবে আমার কথার কখনও নড়চড় হয় না। চলো, কি খাবে বলো—তোমার প্রিয় তাজা পানীয়টিও পাবে, বাড়ীতেই তৈরী।

এত সকালে ওটি না খেলেই ভাল—ফারফ্রী হেসে বলল।

হুঁ, তা ঠিক, তা ঠিক, আমি নিজে খাই না তো। তবে নিজে না খেলেও অন্য লোকদের জন্য রাখতে হয়।

কথা বলতে বলতে তারা ফিরে এল। ফারফ্রীর খাওয়ার জন্য প্রচুর ব্যবস্থা করল হেনচার্ড। লেখাপড়া, চুক্তি ইত্যাদিও হয়ে গেল সেখানেই বসে। তাতেও সন্তুষ্ট হ'ল না হেনচার্ড—ফারফ্রীকে দিয়ে চিঠি লেখাল—ব্রিস্টল থেকে তার জিনিসপত্র যাতে এখানে চলে আসে। ঠিক হ'ল ফারফ্রী হেনচার্ডের বাড়ীতেই থাকবে—অন্ততঃ যতদিন না ভাল বাসা পেয়ে চলে যায়। হেনচার্ড তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো বাড়ীটা, গমের গোলা ইত্যাদি দেখাল। তারপর তারা ঢুকলো অফিস-ঘরে। সেখানেই ফারফ্রীকে দেখতে পেল এলিজাবেথ।

॥ দশ ॥

অফিস ঘরে এলিজাবেথ বসেছিল অনেক সময়। খানিকক্ষণ পরে হেনচার্ড নিজেই ভেতর দিকের আর একটা দরজা খুলে এলিজাবেথকে ভেতরে ডাকল। এমন সময়ে আর একটা লোক এগিয়ে এসে বলল—আমি স্যার, নতুন ম্যানেজার. যোশুয়া জোপ। আজ থেকে আমার কাজ সুরু করার কথা।

নতুন ম্যানেজার! ঐ তো অফিসে বসে আছে। হেনচার্ড সোজাসুজি দেখিয়ে দিল।

অফিসে বসে আছে? লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল।

হ্যাঁ। আমি তোমাকে বৃহস্পতিবারে আসতে বলেছিলাম। তুমি এলে না। তাই আমাকে নতুন ম্যানেজার নিতে হল। তা'ও আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তুমিই হবে বোধহয়। ব্যবসাপত্তরের কাজে তো দেরী করলে চলবে না।

আপনি বলেছিলেন বৃহস্পতিবার অথবা শনিবার। লোকটা একটা চিঠি বার করল।

তুমি দেরী করে ফেলেছ। মহাজন উত্তর দিল—আর কিছু আমি বলতে পারছি না, খুব দুঃখিত।

আর কিছু করার ছিল না। লোকটা ফিরে গেল। এলিজাবেথ তাকিয়ে দেখল—রাগে তার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেছে।

তারপরে এলিজাবেথ ঢুকলো দেখা করতে। খানিকটা উদাসভাবে তার দিকে তাকিয়ে হেনচার্ড বলল—বল তো খুকুমনি, কি চাই তোমার!

ব্যবসা ছাড়া আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলা যাবে? সে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, বলতে পার। উৎসুকদৃষ্টিতে তাকাল হেনচার্ড।

আমি একটা খবর এনেছি আপনার জন্যে। সে সরলভাবে বলতে লাগল—আপনার একজন আত্মীয়, এক নাবিকের বিধবা স্ত্রী, সুসান নিউসন এখানে এসেছেন, তা আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?

হেনচার্ডের সুস্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতায় যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল—এঁ্যা, সুসান? সে এখনও বেঁচে আছে? কোন রকমে জিজ্ঞাসা করল হেনচার্ড।

হ্যাঁ আছেন।

তুমি কি তার মেয়ে ?

হ্যাঁ তাঁর একমাত্র মেয়ে।

কি তোমার নাম ?

এলিজাবেথ।

নিউসন ?

হ্যাঁ, এলিজাবেথ নিউসন।

মুহূর্তের মধ্যেই হেনচার্ডের খেয়াল হ'ল যে ওয়েডনের মেলায়, তার বিবাহিত জীবনের সেই দুঃস্বপ্নের মত ঘটনাটা তাহলে মেয়েটির জানা নেই। তার স্ত্রী এদিক দিয়ে তার সম্মান যথেষ্ট বাঁচিয়েছে।

হুঁ, আমি তোমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে চাই। হেনচার্ড বলল—চলো যাই, ভেতরে গিয়ে কথা বলি।

এতদূর ভদ্র আচরণ এলিজাবেথকে বিস্মিত করল। হেনচার্ড নিজেই পথ দেখিয়ে অফিস-ঘরের মধ্য দিয়ে (সেখানে ফারফ্রী নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল) খাওয়ার ঘর পেরিয়ে—টেবিলের উপর অনেক ভুক্তাবশেষ ছড়ানো, বসার ঘরে এনে বসালো। সুন্দর মেহগনি কাঠের টেবিল। খান-দুই তিন বই সাজানো, তার মধ্যে একখানা বাইবেল। এলিজাবেথ ভাল করে সব দেখার আগেই হেনচার্ড বলল—বসো, এলিজাবেথ বসো। গলাটা যেন হেনচার্ডের ধরে গেছে। সে নিজে বসে প্রশ্ন করল—তোমার মা তাহলে ভাল আছেন ?

না, ভাল নয়, ঘুরতে ঘুরতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

সেই নাবিক-ভদ্রলোক কবে মারা গেলেন ?

বাবা মারা গেছেন গত বছর।

হেনচার্ডের কানে 'বাবা' কথাটা যেন মধুবর্ষণ করল, সে জিজ্ঞেস করল—তোমরা কি এখন আমেরিকা থেকে আসছ ?

না, আমরা ইংল্যাণ্ডে এসেছি কয়েক বছর আগে। আমার তখন বারো বছর বয়েস। সেই সময় আমরা কানাডা থেকে চলে আসি।

ও! আচ্ছা! এতদিনে সে বুঝতে পারল। কেন সে শতচেষ্টা করেও তার স্ত্রী এবং কন্যার খোঁজ পায় নি, ভেবে নিয়েছিল তারা নিশ্চিত পরপারে চলে গেছে। বর্তমানে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল—তোমার মা এখন কোথায় ?

'থ্রী মেরিনার্স' হোটেলে আছেন।

তুমিই তাঁর মেয়ে এলিজাবেথ ? হেনচার্ড আবার বলল। কাছে এসে তার দিকে ভাল করে তাকাল। তার চোখদুটো কেমন যেন ভেজা-ভেজা—তুমি তোমার

মার জন্যে একটা চিঠি নিয়ে যেতে পারবে? আমি তাঁকে দেখতে চাই। তাঁর স্বামী দেখছি তাঁর জন্যে কোন ব্যবস্থাই করে যান নি। এলিজাবেথের পোষাক-আশাক পরিষ্কার হলেও পুরোনো।

না বিশেষ কিছু রেখে যান নি। এলিজাবেথ খুশী হ'ল যে সে নিজে না বলতেই তিনি এ'টা বুঝতে পেরেছেন।

হেনচার্ড টেবিলে বসে একটা চিঠি লিখে ফেলল। তারপর পকেট থেকে একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট বার করল। কি ভেবে আরও পাঁচ শিলিং বার করে সে চিঠিটার সঙ্গে একটা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে—মিসেস নিউসন, থ্রী মেরিনার্স ইন্ লিখে মেয়েটির হাতে দিয়ে দিল।

এটা একদম তাঁর হাতে দেবে কেমন! বলল হেনচার্ড—তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগল—এলিজাবেথ! খু-উ-ব ভাল। পরে আবার অনেকক্ষণ ধরে কথা বলব—কেমন!

যাবার সময়ে সে তার হাত ধরে আদর করল। এলিজবেথ এত বন্ধুত্বের স্বাদ কখনও পায় নি। কেমন যেন বোধ করতে লাগল সে, চোখে জল এসে গেল। মেয়েটি চলে গেলে হেনচার্ড দরজা বন্ধ করে চুপচাপ সোজা হয়ে বসে থাকল দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। সেখানে যেন সে নিজের ইতিহাস পড়ে দেখছিল।

গুলি মারো! সে চেঁচিয়ে উঠলো। একবারও তো খেয়াল করি নি—ঠকিয়ে গেল না তো আমাকে? সুসান আর তার মেয়ে হয়তো মরেই গেছে কবে!

তবুও এলিজাবেথকে দেখে কেমন যেন মনে হয়েছিল হেনচার্ডের। যাই হোক্, আর কয়েক-ঘন্টার মধ্যে সবই জানা যাবে—সুসান সত্যি তার মা কিনা! কারণ সেদিনই সন্ধ্যেবেলা সে দেখা করার কথা লিখেছিল চিঠিতে।

ঈশ্বর যখন দেন, হাত উপুড় করে দেন—হেনচার্ড নিজে নিজে বলল, কোথায় সে ফারফ্রীকে পেয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকবে—তা নয়, নতুন আরও কি সব ঘটনা এসে জুটে গেল। এদিকে ডোনাল্ড ফারফ্রী সারাদিনে তার মনিবের দেখা পেল না আর একবারও। ভাবল, কি জানি বাবা, কেমন মেজাজের লোক!

এলিজাবেথ সরাইখানায় পৌছে দেখে, তার মায়ের চোখেমুখে ঔৎসুক্য। চিঠিটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা খুলে পড়ল না, বরং জিজ্ঞেস করল, কিভাবে মিঃ হেনচার্ড তার সঙ্গে কথা বললেন, কি কি জিজ্ঞেস করলেন, কতক্ষণ ছিলেন তার সঙ্গে ইত্যাদি। তারপর এলিজাবেথ পেছন ফিরলে, তার মা, চিঠিটা খুলে পড়ে ফেলল—

আজ সন্ধ্যেবেলা. আটটার সময়, পার তো, আমার সঙ্গে দেখা কোর। বাডমাউথের রাস্তার মোড়ে। খুব সহজেই খুঁজে পাবে জায়গাটা। এখন আর কিছু

লিখছি না, তোমাদের সংবাদ পেয়ে খুব বিচলিত বোধ করছি। তোমার মেয়ে বোধহয় কিছুই জানে না। আমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু বোল না ও'কে।

এম. এইচ.

পাঁচ পাউণ্ড টাকার কথা সে কিছুই লেখে নি। টাকার অঙ্কটা কিন্তু লক্ষ্য করার মতন। ঠিক যেন টাকা মিটিয়ে, তাকে ফিরিয়ে নিল হেনচার্ড। দিন কতক্ষণে ফুরোয়—সেজন্যে অপেক্ষা করতে থাকল সুসান। তারপর এলিজাবেথকে বলল, সে হেনচার্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাবে—একাই। কিন্তু দেখা করার জায়গা হেনচার্ডের বাড়ী কি অন্য কোথাও—তা কিছু বলল না। চিঠিটাও তার হাতে দিল না।

।। এগার ।।

ক্যাস্টারব্রিজ শহরের দর্শনীয় বস্তু ছিল সুবিশাল এক রোমান অ্যাম্ফি-থিয়েটার-এর ভগ্নাবশেষ। এই জায়গাটারই স্থানীয় নাম, দি রিং। সারা ব্রিটেনে এমনটি আর ছিল কিনা সন্দেহ।

রোম-সাম্রাজ্যের ফেলে-যাওয়া চিহ্ন এই শহরের অলিতে, গলিতে, পার্কে, বাড়ীতে, সর্বত্র। যে কোনও বাড়ীর উঠোন বা বাগানে দু'এক ফুট গর্ত করলেই হয়তো বেরিয়ে পড়বে—পনেরোশ' বছরের ক্লান্তিহীন নিদ্রায় শায়িত কোনও রোমান সৈনিকের লম্বা-চওড়া শরীর। অ্যাম্ফি-থিয়েটারটা এক বিরাট গোলাকার পাঁচিল-ঘেরা জায়গা। পাঁচিল প্রায় সর্বত্রই ভেঙ্গে পড়েছে। উত্তরে ও দক্ষিণে দুটো আসা-যাওয়ার পথ। ভেতরে ঠিক মধ্যিখান থেকে চারদিক ঢালু হয়ে উঠে গেছে। বর্তমানের রোমে 'কলিসিয়ম' দেখে যে অনুভূতি হয়, ক্যাস্টারব্রিজের অ্যাম্ফি-থিয়েটার দেখলে তেমনই ধারণা হওয়ার কথা। সন্ধ্যাবেলার আলো-আঁধারিতেই জায়গাটার অতিকায় প্রাচীন রূপ মালুম হত বেশী। দুপুরের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে এক ঝলক দেখলে, কল্পনা তেমন পাখা বিস্তার করতে পারে না। প্রকাণ্ড, বিষাদমাখা, নিঃসঙ্গ, কিন্তু দুর্গম নয়। এই জায়গাটাতেই গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করার সুবিধা। তাই অনেকের কাছেই এর উপযোগিতা ছিল বেশ। তবে একটা ব্যাপার এখানে হ'ত না—সুখী যুবক-যুবতীরা প্রেম করতে কখনও আসত না এখানে।

এত খোলামেলা অথচ নিঃস্তব্ধ, প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিমাখা এই ধ্বংসাবশেষ গোপন কথা বলার পক্ষে উত্তম জায়গা ঠিকই, কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনক্ষেত্র

কেন যে হতে পারে নি—সেটা প্রশ্ন করার মত বটে। কারণটা হয়তো পুরনো কিছু কিছু ঘটনা। প্রথমতঃ এখানে যেসব খেলাধূলা একসময়ে হত, রক্তপাত আর প্রাণ সংশয়ই ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। তাছাড়া—এখানেই এক কোনে, কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছিল এই শহরের ফাঁসিকাঠ। আরও একটা ভয়ঙ্কর গল্পের কথা এখনও শুনতে পাওয়া যায়। ১৭০৫ সালে এখানে একটি মেয়েলোককে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, না হলেও দশ হাজার লোকের চোখের সামনে। অপরাধ—সে নাকি তার স্বামীকে খুন করেছিল। পুড়তে পুড়তে একসময় নাকি মেয়েলোকটার হৃদপিণ্ডটা—তার দেহ ছেড়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তাই দেখে দশহাজার লোকের আর একটিও দাঁড়ায় নি সেখানে। শরীরের বাকী অংশটুকু পুড়ল কি পুড়ল না, সে খবরও নেওয়ার দরকার মনে করে নি।

আজকাল অবশ্যি একেবারে মধ্যিখানের সমতল মাঠটাতে ছেলেরা খেলাধূলো করে, জায়গাটা একটু মাতিয়ে রাখে। হেনচার্ড এই স্থানটিকেই গোপনে দেখা করার উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করেছিল। এখানে নতুন এলেও তার স্ত্রীর পক্ষে জায়গাটা সন্ধ্যের পরে খুঁজে বার করা যেমন অসুবিধা নয়, তেমনই তার নিজের পক্ষেও অন্যলোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। শহরের মেয়র হওয়াতে এখনই সুসানকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে তোলা'য় অসুবিধা অনেক! মানসম্মানের প্রশ্ন জড়িত—তাই আগে ভেবেচিন্তে ঠিক করা দরকার কি ভাবে কি করা যাবে।

সন্ধ্যের পরে পরেই হেনচার্ড এসে হাজির হ'ল। কতকগুলো পুরনো নর্দমা আর ইটের স্তূপ পেরিয়ে সামনে এগোতেই দেখে, উল্টো দিক দিয়ে একটি মহিলা এগিয়ে আসছে। প্রায় মাঝখানে এলে দু'জনের দেখা হ'ল। দুজনের কেউই প্রথমে কথা বলল না। কথা বলার কোন প্রয়োজনও ছিল না। বেচারী মেয়েলোকটি হেনচার্ডের বুকে মাথা লুকোল। হেনচার্ড দুই বাহু মেলে আশ্রয় দিল তাকে।

আমি আর মদ খাই না। সে বলল, আস্তে আস্তে, থেমে থেমে, মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গীতে। শুনছ সুসান, আমি আর এখন মদ খাই না। সেইদিন থেকে আর খাই নি। হেনচার্ড প্রথম কথা বলল।

সে অনুভব করল, স্ত্রী বুঝতে পেরেছে বলে মাথাটা আরও নুইয়ে দিল তার বুকের মধ্যে। দু-এক মিনিট পর আবার বলল—

অমি যদি জানতাম যে তোমরা বেঁচে আছো—কম খুঁজেছি তোমাদের? ঘুরে বেড়িয়েছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। তারপরে ভাবলাম নিশ্চয়ই কোথাও যাওয়ার পথে জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা গেছ তোমরা। এতদিনে কেন একবার খবর দাও নি?

সেই যে আমাকে কিনে নিয়ে গেল, আমি বোকার মত ভেবেছিলাম, তার বৌ

হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যি সে যখন আমার জন্যে দাম দিয়েছে, তখন আমার তাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত না। এখনও তো সে মারা গেছে বলেই, তোমার কাছে এসেছি। তোমার ওপরে তো আমার কোন দাবী নেই। সে মারা না গেলে হয়তো আমি কোনদিনই আসতাম না।

ইস্-স্-স্—তুমি এখনও এত সরল আছ?

জানি না। অন্যরকম কিছু করলে নিশ্চয়ই আমার পাপ হত। সুসান প্রায় কেঁদে ফেলল।

হুঁ বুঝেছি। এই জন্যেই তোমাকে এত নিষ্পাপ মনে হয় আমার। কিন্তু এখন আমি কি করি?

কেন, মাইকেল? সে ভয় পেয়ে গেল।

কেন,—বলছি—তুমি আমি আর এলিজাবেথ আবার একসঙ্গে থাকা যাবে কি করে? মেয়েকে সব খুলে বলাটা ঠিক হবে না। ও' যদি অন্যরকম ভাবে তো সেটা আমার খুব খারাপ লাগবে।

সেইজন্যেই ওকে তোমার সম্পর্কে কিছু বলি নি। সেটা আমারও সহ্য হত না।

এখন তাহলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যে ওকে বুঝতে না দিয়েও, সবকিছু ঠিক করে নেওয়া যায়। জানো তো, আমার অনেক বড় ব্যবসা এখানে। অনেক খাতক, খরিদ্দার। তাছাড়া আমি এখানকার মেয়র।

হুঁ জানি।

এই সব কারণে, তাছাড়া আমাদের সন্তানের কাছেও, নিজেদের মুখরক্ষে করার জন্যে আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। এতদিনকার ছাড়াছাড়ির পর আমি হঠাৎ আজকে তোমাদের আমার বৌ বা মেয়ে বলে আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারি না।

আমরা আজকেই চলে যাব। শুধু দেখা হল এই যথেষ্ট।

না, না, সুসান, তোমাকে চলে যেতে বলি নি। আমাকে ভুল বুঝো না। সে খুব সহানুভূতিমাখা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল। শোন, আমি একটা চিন্তা করেছি, তুমি আর এলিজাবেথ, মিসেস নিউসন আর তার মেয়ে এই পরিচয়ে এখন কোনও ভাড়াবাড়ীতে থাকো। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের খোঁজ খবর নেব, যাতায়াত করব। আমাদের পরস্পরকে ভাল লাগবে—তারপর দুজনে বিয়ে করে ফেলব আবার। এলিজাবেথ তোমার মেয়ে হিসেবে তোমার সঙ্গে আমার বাড়ীতেই চলে আসবে। এ'রকমটা হলেই বোধহয় কেউ কিছু ভাববে না। আমার গোঁয়াতুর্মির অপমানজনক অতীতও কেউ জানবে না—খালি তুমি আর আমি ছাড়া। তা সত্ত্বেও

বেশ স্বামী আর মেয়ে নিয়ে সংসার করতে পারবে তুমি।

তুমি যেমন ভাল বোঝ। খুব ক্ষীণ গলায় উত্তর দিল সে। আমার এখানে আসা শুধু এলিজাবেথের জন্যে। আমাকে তুমি বলো তো কাল সকালেই আমি চলে যেতে পারি। আর কোনদিন আসব না।

থাক্ থাক্—আর বলো না। হেনচার্ড শান্তভাবে বলল—এখন আমি যা বললাম, ভেবে দেখ, অন্য কিছু ভাল হলে তা'ও করা যেতে পারে। আগামী দু'একদিন আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে ব্যাবসাপত্তরের কাজে। ঐ সময়টাতে তুমি একটা বাসা খুঁজে নিও। আমি বলে দিচ্ছি, শোন, তোমাদের থাকার মত বাসা পাবে বড় রাস্তার ওপরেই। একটা ছোটখাট বাড়ীই নিয়ে নিও।

ওখানে তো ভাড়া অনেক বেশী হবে বোধহয়।

তা হোক। আমাদের পরিকল্পনা মত চলতে হলে, তোমার ভদ্রপল্লীতে থাকা দরকার। টাকার জন্য চিন্তা কোর না। আমি যে ক'দিন না ফিরে আসি, চলবে তো?

তা চলবে।

এখন যেখানে আছ, কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?

না।

আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে এলিজাবেথ যেন কিছু টের না পায়। ও'টাই আমার সবথেকে বড় চিন্তা—

ও কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না একথা।

হুঁ, ঠিকই।

আমাদের আবার বিয়ে হবে ভাবতে খারাপ লাগছে না! মিসেস হেনচার্ড একটু থেমে বলল—এত কাণ্ডের পর এটাই একমাত্র উপায়। আমি এলিজাবেথকে গিয়ে বলব'খন আমাদের আত্মীয় মিঃ হেনচার্ড, এখানেই থাকতে বলেছেন আমাদের।

ঠিক আছে—সেটা তুমি'ই ভাল করে ভেবে নিও। চলো, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

না, না, দরকার নেই। যদি কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সুসান উদ্বিগ্নভাবে বলল—আমি ঠিক রাস্তা চিনে চলে যাব। বেশী রাতও হয় নি। তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই।

আচ্ছা। বলল হেনচার্ড। একটা কথা, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ তো সুসান?

সুসান বিড়বিড় করে কি যেন বলল—তার কোন কথা বোঝা গেল না।

যাক গে, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এখন ভবিষ্যৎ দেখে বিচার কোর আমাকে। চলি।

হেনচার্ড পিছন ফিরে খানিকটা গিয়ে, অ্যাম্ফিথিয়েটারের পাঁচিলের ওপর বসে থাকল কিছুক্ষণ। তার স্ত্রী পুরোটা পথ নেমে গেল একা একা। তারপর শহরের ভিড়ে মিশে গেল। খানিকক্ষণ পরে হেনচার্ড বাড়ীর রাস্তা ধরল। এত জোরে হেঁটে এল সে, যে তখনও তার স্ত্রীকে হাঁটতে দেখা যাচ্ছিল অদূরে। হেনচার্ড ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখল, তারপর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

॥ বারো ॥

দুপাশের উঠোন আর বাগান পেরিয়ে হেনচার্ড যখন বাড়ীর ভিতরে এল, অফিসঘরে তখনও আলো জ্বলছে। ডোনাল্ড ফারফ্রীকে যেভাবে বসে কাজ করতে দেখে গিয়েছিল, সেইভাবেই বসে আছে। যাবতীয় খাতা-পত্র পেড়ে, উল্টে পাল্টে দেখে, সে ম্যানেজারের কাজকর্ম বুঝে নিচ্ছিল। হেনচার্ড ঢুকল, আলতোভাবে বলল—তুমি কাজ করলে, করো।

ফারফ্রীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে হেনচার্ড দেখছিল—কী করুণ অবস্থা হয়ে আছে তার হিসাবপত্তরের। এমন কি ফারফ্রীও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ঠিকমত সব উদ্ধার করতে। মহাজনী কারবারে উন্নতি করলেও হেনচার্ডের কোন বিষয়ে অত খুঁৎখুতুনি ছিল না। পুরনো জাবেদা-খাতার ধুলো ঘেঁটে হিসাব মেলানো—কোনদিনই সম্ভবপর ছিল না তার দ্বারা। সাহস করে লাফঝাঁপের কাজে তার জুড়ি ছিল না, কিন্তু বসে বসে কলম দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটা তার ধাতে সইত না একদম।

নাও, আজ থাক। খাতার উপর বিশাল হাত মেলে দিয়ে, হেনচার্ড বলল, কালকে অনেক সময় পাবে, এখন চলো, রাতের খাওয়াটা খেয়ে নেওয়া যাক। আমি ঠিকই বুঝেছি, তুমিই পারবে। বন্ধুর মত জোর করে সে জাবেদা-খাতা বন্ধ করে দিল।

ডোনাল্ড বাসা ঠিক করে চলে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু দেখল, তার বন্ধু এবং মনিব নিজের ইচ্ছা বা অনুরোধের কোনরকম এদিক-ওদিক হওয়া পছন্দ করেন না। অতএব সানন্দে থেকে যেতে বাধ্য হ'ল সে। হেনচার্ডের এত উষ্ণ ভালবাসায় তার অসুবিধা হ'লেও হেনচার্ডকে ভাল লাগছিল তার। হয়তো চরিত্রের বৈপরীত্যই দুজনের পারস্পরিক আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার কারণ।

অফিসঘর তালা বন্ধ করে তারা ভেতরবাড়ীর দিকে পা বাড়াল। বাতাসে ম ম করছে ফুলের সুগন্ধ। বাগানটা নৈঃশব্দ আর শিশিরে আচ্ছন্ন। একটু কাছে

আসতে, ফুলগুলো দেখা যাচ্ছে—বাগান পেরিয়ে তারা ভেতরবাড়ীতে এল।

সকালের মতই আতিথ্যের কোন ত্রুটি হ'ল না। খাওয়া-দাওয়া সারা হলে, চেয়ারটা ফায়ার-প্লেসের কাছে টেনে নিয়ে, হেনচার্ড বলল—তোমারটাও টেনে নাও ফারফ্রী, আরাম করে বস। আশ্চর্য্যের ব্যাপার দেখ, ব্যবসার প্রয়োজনেই আমাদের দেখা, আর আজ প্রথম দিনেই আমি এক পারিবারিক সমস্যার কথা বলতে যাচ্ছি তোমাকে। গুলি মারো! আমি একা মানুষ, বুঝলে, আমার সুখদুঃখের কথা শোনার কেউ নেই। তোমাকে বললেই বা ক্ষতি কি, এ্যাঁ?

বলুন। যদি কোনও সাহায্যে লাগতে পারি আপনার। ডোনাল্ড দেয়াল ও ছাদের দিকে তাকিয়ে কাঠের কাজ দেখতে দেখতে বলল। দেয়ালে ঝোলানো পুরনো আমলের ঢাল, মহিষের শিং, অ্যাপোলো আর ডায়ানার মূর্তি, আরও কত কি।

আমি কিন্তু চিরকাল এ'রকম ছিলাম না—হেনচার্ড বলে যেতে লাগল। তার গম্ভীর দৃঢ় স্বর একটুও কাঁপল না। অনেকসময় মনের এমন অবস্থা হয় যে, নতুন-পাওয়া বন্ধুকেও হৃদয়ের গোপন-কথা সব খুলে বলা যায়, যা সচরাচর পুরনো বন্ধুদের কাছে বলা যায় না। আমি জীবন শুরু করেছিলাম, মাঠে মাঠে জন খেটে খাওয়া মানুষের মত। ঐ অবস্থাতেই আঠেরো বছর বয়সে করলাম বিয়ে। আমাকে দেখলে মনে হয়, কখনও সংসারধর্ম ছিল আমার?

হ্যাঁ, আমি শুনেছি যে আপনার স্ত্রী গত হয়েছেন।

তা শোনারই কথা বটে। এখন থেকে বছর উনিশেক আগে আমি আমার স্ত্রীকে হারাই। দোষটা আমারই। শোনো, কি হয়েছিল। এক গরম কালের সন্ধ্যেবেলা—কাজের খোঁজে বেরিয়েছিলাম। সঙ্গে আমার স্ত্রী আর তার কোলে একমাত্র সন্তান। ঘুরতে ঘুরতে এক মেলায় গিয়ে হাজির হ'লাম। তখন পানাভ্যাসটা খুব বেশী ছিল আমার।

হেনচার্ড একটু থামল। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর বলে গেল আদ্যোপান্ত সব ঘটনা। কিভাবে সে তার স্ত্রীকে এক নাবিকের কাছে বিক্রী করে দিয়েছিল। বলতে বলতে তার কপালের রগদুটো ফুলে উঠছিল—হাতদিয়েও ঢেকে রাখতে পারছিল না। ফারফ্রী প্রথমে যতটা ওপর ওপর শুনছিল, এখন তার আগ্রহ বেড়ে গেল অনেক।

হেনচার্ড বলে গেল, কত কষ্ট করে সে তার স্ত্রী এবং কন্যার খোঁজ করেছিল। শপথ করেছিল যে মদ আর খাবে না। তারপরে তার এই সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবনের ইতিহাস। গত উনিশ বছর আমি আমার কথা রেখেছি—সে বলে গেল—আর আজকে আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ।

তারপর শোন। এতদিন আমার স্ত্রী'র কোন খবর ছিল না—খানিকটা নারীবিদ্বেষী বলেই আমার বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় নি তাতে। বললাম তো, এতদিন তাদের কোনও খোঁজ পাই নি—কাল পর্য্যন্তও না। কিন্তু এখন সে ফিরে এসেছে।

ফিরে এসেছেন? তিনি!

হুঁ, আজই সকালবেলায়। এখন বলো তো, আমার কি করা উচিত?

তাকে ফিরে গ্রহণ করুন, একসঙ্গে সংসারধর্ম করুন আবার।

আমিও তাই ভেবেছি, ওকে সে প্রস্তাবও দিয়েছি। কিন্তু ফারফ্রী!—হেনচার্ড চিন্তিতভাবে বলল—সুসানের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহার করতে গেলে, আমি আর একটি নিরপরাধ মেয়ের প্রতি অন্যায় করে ফেলছি।

কই, সে কথা তো কিছু বলেন নি আমায়?

শোন, ফারফ্রী, আমার মত লোক বিশ বছরের জীবনে একটির বেশী ভুল করবে না, এ' হতে পারে না। অনেকদিন থেকেই, আমার ব্যবসার কাজে আমাকে জার্সিতে যেতে হয়—বিশেষ করে আলু কপি আর বীটগাজরের সীজনে—ঐ সময়ে বেশ বড় কেনাবেচা হয় আমার ওখানে। একবার হ'ল কি, ওখানেই আমি খুব অসুখে পড়ে গেলাম। বাঁচার আশা ছিল না প্রায়। আর এই নিঃসঙ্গ জীবনে বাঁচবার সার্থকতাও কিছু খুঁজে পেতাম না তখন। মনে হ'ত কি ভয়ঙ্কর খারাপ দিনেই না জন্ম হয়েছিল আমার।

আমার কখনই ও'রকম মনে হয় না। বলল ফারফ্রী।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, বন্ধু! কোনদিন যেন না হয়ও। যাই হোক্ সেই অবস্থায় আমাকে দেখে একটি মেয়ের খুব মায়া হ'ল। শুধু মেয়ে না বলে সুন্দরী বলাই ভাল। খুব ভাল বংশের মেয়ে, শিক্ষিতা, রুচিশীলা। তার বাবা ছিলেন একজন অপরিণামদর্শী মিলিটারী অফিসার। তখন তিনি মারা গেছেন—তার মা'ও ছিলেন না। অতএব সে'ও আমার মত একা। আমাকে শুশ্রূষা করতে করতে, বোকার মত সে ভালবেসে ফেলল আমাকে। ভগবান জানেন কেন, আমার তেমন কিছু গুণ ছিল না। একসঙ্গে কিছুদিন থাকার ফলে, আমিও তার অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লাম। এ'র বেশী তোমাকে আর বলা যায় না। শুধু জেনে রাখো, আমি তাকে বিয়ে করতে রাজী ছিলাম। ওখানে তখন লোকের মুখে মুখে নানারকম রটনা হতে লাগল। তাতে আমার কোনও ক্ষতি হ'ল না—কিন্তু তার যথেষ্ট হ'ল। শোনো, ফারফ্রী! বন্ধু হিসেবে তোমাকে বলছি—মেয়েদের নাচানোর মত কোনও গুণ বা দোষ যাই বল না কেন, আমার কখনই নেই। সুস্থ হয়ে আমি চলে এলাম।

সেজন্যে খুব কষ্ট পেয়েছিল সে। চিঠির পর চিঠিতে সে কথা লিখত আমাকে প্রায়ই। তখন আমি খানিকটা বিবেকের তাড়নায়, আর সুসানেরও কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছিল না তাই, ওকে প্রস্তাব দিলাম, আমি ওকে বিয়ে করতে রাজি। কিন্তু সুসানের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ও'তো আনন্দে নেচে উঠল। বিয়েও হয়তো হয়ে যেত আমাদের আর কিছুদিনের মধ্যে—কিন্তু দেখ, সুসান এসে হাজির।

ডোনাল্ড তার সাদামাটা জীবনে এতবড় সমস্যার সম্মুখীন হয় নি কখনও—তাই বেশ চিন্তায় পড়ে গেল।

মানুষের কি থেকে কি হয়ে যায়! অল্পবয়সে সেই মেলায় যা ভুল করেছিলাম, তার পরে'ও আবার জার্সিতে এই ঘটনায় যদি না জড়িয়ে পড়তাম! মেয়েটার'ও অপযশ না হতো! কিন্তু, আমার কি করার আছে? একজনকে আমার নিরাশ করতেই হবে—এবং সেটা এই দ্বিতীয়জনকেই। কারণ আমার প্রথম কর্তব্য সুসানের প্রতি। তাই কি না?

দু'জনেরই সামনে করুণ সমস্যা। বলল ফারফ্রী।

তা ঠিকই, আমার জন্যে তো ভাবি না। আমার জীবন এইরকমই কেটে যাবে। কিন্তু এদের দু'জনকে—হেনচার্ড চিন্তায় ডুবে গেল। আমি ভাবছি এই দ্বিতীয়জনকেও আমার যথাসাধ্য করণীয় করব।

তা ছাড়া তো উপায় নেই—অপর জন বলল। তার কথায় দার্শনিকের মত বেদনা। আপনি দ্বিতীয়জনকে সবকিছু জানিয়ে একটা চিঠি লিখুন। জানিয়ে দিন যে প্রথমজন ফিরে আসায়, আপনার পক্ষে তাকে বিয়ে করা আর সম্ভব নয়। সে যেন এ ব্যাপারে আর পীড়াপীড়ি না করে। তবে তার সবকিছু মঙ্গল হোক ইত্যাদি।

তাতে হবে না। আরও কিছু করা উচিত। সে অবিশ্যি বলত যে তার আত্মীয়স্বজনরা খুব পয়সাওলা লোক। আমি ভাবছি, ওকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। কিছু যদি উপকার হয়—বেচারী! এখন তুমি আমার হয়ে বেশ করে গুছিয়ে সব ঘটনা জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দিতে পারো! চিঠি লেখাটা আমার মোটেও আসে না।

আচ্ছা দেব'খন।

শোনো, এখনও সব তোমাকে বলা হয় নি। সুসানের সঙ্গে আমার মেয়েও আছে। যে মেয়েকে কোলে করে সেই মেলা থেকে, আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল তার। সে কিন্তু সুসানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিষয়ে কিছু জানে না। শুধু জানে আমি সুসানের শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে আত্মীয়। যে নাবিকের কাছে অমি সুসানকে

বিক্রী করে দিয়েছিলাম, তাকেই সে বাবা বলে জানে। ও'র মা, এবং এখন আমি দুজনেই মনে করি যে, আমাদের জীবনের এই লজ্জার কাহিনী আমাদের সন্তানকে না জানতে দেওয়াই উচিত। তুমি কি বল ?

আমি হ'লে সমস্ত সত্যি ঘটনাটাই বলে দিতাম। তাতে সে'ও আপনাদের দু'জনকে খুব সরলমনেই নেবে।

কক্ষণো না। হেনচার্ড বলল, ও'কে সবকথা বলা যায় না। ও'র মাকে আমি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছি যখন, তাতে ও'র মনেও কোন দাগ পড়বে না। আর সুসান নিজেকে নাবিকের বিধবা স্ত্রী বলেই মনে করে—কাজেই একটা আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া তারও মনে তৃপ্তি হবে না। সুসানের ভাবনাটাই ঠিক।

ফারফ্রী আর কোনও কথা বলল না। জার্সির সেই যুবতীকে সুন্দর করে একটা চিঠি লিখে দিল সে। সবশেষে ফারফ্রী চলে যাওয়ার সময় হেনচার্ড তাকে বলল—আঃ, ফারফ্রী তোমাকে সব বলতে পেরে আমার স্বস্তি হ'ল। এখন বুঝতে পারছ তো, ক্যাস্টারব্রিজের মেয়রের পকেটটা যত ভারী, তার থেকেও মনটা ভার অনেক বেশী।

হুঁ, আপনার জন্যে আমার দুঃখ হয়। বলল ফারফ্রী।

সে চলে গেলে, হেনচার্ড চিঠিটা দেখে দেখে লিখে ফেলল। একটা বড় অঙ্কের চেক সঙ্গে দিয়ে খামের মধ্যে পুরে, পোষ্টাফিসে দিয়ে এল। চিন্তিতমনে হাঁটছিল সে। এত সহজেই ব্যাপারটা মিটে যাবে! বেচারী! যাক্ সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এখন দেখি সুসানের কি করা যায়!

॥ তের ॥

মিসেস নিউসন নামে সুসানের জন্যে যে বাড়ীটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল সেটা শহরের পশ্চিম দিকে। হেনচার্ডই খরচ বহন করত তার। বিকেলের রোদ্দুরটা যেন এখানে অনেক বেশী হলুদ। বসার ঘর থেকে লম্বা দেওদারগাছগুলো দেখা যায় দূরে—কেমন একটা বিষণ্ণতা-মাখা। হেনচার্ড তাদের জন্যে একটা চাকরও ঠিক করে দিয়েছিল। মাঝে মাঝেই আসতে লাগল সে এখানে চা খেতে। ব্যাপারটা একটা ব্যবসায়িক প্রয়োজনের মতই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার কাছে। অনেকটা এই মহিলার প্রতি প্রাক্তন অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করার তাগিদে। কাজেই নিজের মানসম্মান ও সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন উহ্য রাখতে হয়েছিল। কথাবার্তা প্রায়ই সাধারণ আলাপের পর্যায়ে

থাকত—অন্ততঃ এলিজাবেথের উপস্থিতিতে।

একদিন বিকেলবেলা এলিজাবেথ বাড়ীর ভেতরে কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল। হেনচার্ড সেই সময় এল। এখনই কথা বলার সুযোগ দেখে সে খুব শুষ্কভাবে বলল—সুসান, এবার তাহলে আমাদের দিন ঠিক করে ফেলতে হয় একদিন।

সুসান ম্লান হাসি হাসল। শুধুমাত্র এলিজাবেথের জন্যে, তার এই সব সুখের অভিনয়। তাই তাতে প্রাণ ছিল না। মাঝেমাঝেই সে ভাবত এসব ভাল লাগে না। একদিন মেয়েকে সবকিছু খোলাখুলি বলে দেবে, কিন্তু বলা আর হয়ে উঠল না।

মাইকেল! তোমার কত সময় নষ্ট হচ্ছে আর কষ্ট হচ্ছে এ'তে। সুসান বলল। আমি কিন্তু কোনদিন ভাবি নি এ'সব। সুসান তার স্বামীর দামী পোশাকপত্তর আর তার ঘরের দামী আসবাবপত্রের দিকে তাকাতে লাগল।

মোটেই না। হেনচার্ড উদার ভাবে বলল। এমন কিছুই খরচা হচ্ছে না আমার। আর সময়? হেনচার্ডের মুখটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল—ভারী ভালো একটি কাজের ছেলে পেয়েছি আমি। শিগগিরই তাকে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে অবসর নেব। গত বিশ বছরের খাটুনিকে এইবার পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

হেনচার্ড এত বেশী ঘনঘন আসতে শুরু করল যে, শিগগিরই তাদের সম্পর্কে রটনা শুরু হ'ল। তারপর পথেঘাটে খোলাখুলি আলোচনা আরম্ভ হ'ল যে ক্যাস্টারব্রিজের দাম্ভিক, প্রভুত্বগর্বী মেয়র, মিসেস নিউসন নাম্নী কোমলপ্রাণ বিধবার প্রেমে পড়ে গেছে। সচরাচর মেয়েদের সঙ্গ সে এড়িয়ে চলত বলেই এমন একটা সম্ভাবনা খুব অস্বাভাবিক মনে হ'ল না। তথাপি মিসেস নিউসনের মত একটি বৈশিষ্ট্যহীনা মহিলার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া একটু আশ্চর্য্যজনক বৈ কি! আবার হতেও পারে! আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ভালবাসা তো! এ'শুধু সেন্টিমেন্টাল আবেগের ব্যাপার—নেহাৎ বিচিত্র কিছু নয়।

নানারকম সমালোচনা, এমন কি বাচ্চা ছেলেদের দূর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া মন্তব্য সবই হেনচার্ডের কানে যেতে লাগল। বাইরে থেকে দেখে কিন্তু মনে হ'ত না সে এমন কিছু রোমান্সের সুখ অনুভব করছে, বরং বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। প্রথমতঃ সুসানের প্রতি অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজনে, দ্বিতীয়তঃ এলিজাবেথের সুরক্ষা এবং পিতামাতার আশ্রয় দরকার, তৃতীয়তঃ নিজের বিবেকের কাছে বিদ্ধ হওয়ার তাগিদ।

এমনই সময়ে, এক নভেম্বরের সকালে, শহরের গীর্জায় বিবাহের আয়োজন করা হ'ল, ডোনাল্ড ফারফ্রীর তত্ত্বাবধানে। সুসানের জীবনে এই প্রথম বোধহয় সে জুড়িগাড়ীতে চড়ল। তাকে এবং এলিজাবেথকে নিয়ে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল

গীর্জার দরজায়, বাইরে রাস্তায় তামাসা দেখতে ভিড় হয়েছিল বেশ। তাদের মধ্যে ছিল ক্রিষ্টোফার কোনী, সলোমন লংওয়েজ, বাজফোর্ড আর তাদের সঙ্গোপাঙ্গরা।

এই পঁয়-তাল্লিশ বচ্ছর আছি এখানে, তা এমনটি আর দেখি নি। বলল কোনী। এতদিন সবুর করে একটা লোক কিনা এমন একটা মেয়েছেলেকে বিয়ে করতে পারে! এবার তাহলে তোরও একটা গতি হবে রে ন্যান্সি মকারিজ! তার পেছনেই দাঁড়ানো একটা মেয়েলোককে উদ্দেশ্য করে বলা হ'ল কথাগুলো। এদের সকলকেই, বিশেষতঃ এই মেয়েলোকটিকে দেখেছিল এলিজাবেথ—সেই প্রথম দিন, বড় হোটেলের বাইরে।

দূর পোড়ামুখো! তোকেই হোক, আর ওঁকেই হোক, আমি কেন বিয়ে করতে যাব রে! মেয়েলোকটি উত্তর দিল। তোর ক্ষ্যামতা কতদূর তাতো জানা আছে। আর ওনার কথা (গলার স্বরটা একটু নেমে গেল)—জন খেটেই তো খেত আগে, জানি নে সে সব ভেবেছিস!

চুপ থাক, চুপ থাক। ওঁর সময়ের কত দাম জানিস এখন। বলল লংওয়েজ। ঘাড় ফিরিয়েই সে দেখে, পাশে একটি গোলাকার চেহারা। জামা আর গাউনের ভাঁজ ছাড়া তাতে আর কোনও খাঁজ নেই। সব সমান। এ সেই 'থ্রী মেরিনাস'-এর সংগীত প্রিয় মোটাসোটা মহিলা। কি গো মাসি!—সে বলল—কেমন দেখছ! মিসেস নিউসনের মত শুঁটকো ষষ্ঠীও তুবার বিয়ে করলে! আর তোমার এই পাঁচমনী চেহারা নিয়ে কি করছ?

আমার আর দরকার নেই বাপু! একজনেই উঙ্গুভাজা হয়ে গেলাম। আবার বিয়ে না হ'লেও আমার বংশমর্য্যাদা কিছু কমবে না তাতে। মেয়েলোকটি উত্তর দিল।

তা ঠিক তা ঠিক। তোমার একটা বংশমর্য্যদা আছে! তোমার মাকেই তো অতগুলো স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ের জন্ম দেওয়ার জন্যে পুরস্কার দিয়েছিল না কৃষক-সমিতি—বলল ক্রিষ্টোফার কোনী।

হুঁ, তোমার মনে পড়ে ক্রিষ্টোফার! কি সুন্দর গানের গলা ছিল আমার মা'র! আর আমরা ভাইবোনেরা সব যেতাম মা'র সাথে সাথে। কোথায় সেই মেলষ্টক, কোথায় ওয়েদারবেরী, মনে পড়ে? একবার সেই শিনার এর মাসীর বাড়ীতে গেলাম কোথায় যেন—মনে পড়ে না ক্রিষ্টোফার! ভোজ-বাড়ীর খবর একবার পেলে হ'ল—আর পায় কে!

—খুব—খুব মনে পড়ে—হি হি হি—বলল ক্রিষ্টোফার কোনী।

তাদের এইসব স্মৃতিচারণে বাধা পড়ল নবদম্পতি বাইরে আসায়। এই অলস লোকগুলোর দিকে হেনচার্ড এমনভাবে তাকাল—যেন একচোখে তার গভীর তৃপ্তি,

আর অন্য চোখে তীব্র অবজ্ঞা।

দু'জনে একদম মানায় নি। বলল হ্যান্স মকারিজ। আমি বলছি—দেখে নিও, ওদের বনবে না। উনি যতই বলুক না কেন—মদ ছোঁয় না, দেখে তো মনে হ'ল, মেয়েলোকটাই ঐ রকম, আর উনি তার উল্টো।

ধুর বোকা, তুই একটা পাড়াকুঁদুলি! ওনার মত বর পেয়েছে, মেয়েলোকটার ভাগ্যি! ওই তো ছিরি! বামন হয়ে চাঁদ হাত দিয়েছে না!

ততক্ষণে ফারফ্রী'র ব্যবস্থাপনায় পাত্রপাত্রীর গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। আস্তে আস্তে লোকজনও সরে পড়ল। সলোমন বলল—ধুর! এসব দেখে আমাদের কি হবে? পকেটে একটা পয়সা নেই। 'ম্যারনাস'-এ গিয়ে যে একবার গলাটা ভেজাব—তা আছে মাত্র ন'টা পেনি পড়ে।

চল, আমিও তোর সঙ্গে যাই সলোমন! বলল ক্রিস্টোফার—আমারও তেষ্টা পেয়েছে খুব।

॥ চোদ্দ ॥

হেনচার্ডের গৃহিণী হয়ে সুসানের জীবন ধারাই পাল্টে গেছে। সমাজের উঁচু স্তরে মেলামেশা করতে হয়। ঘরদোরও সেইভাবে সাজানো হয়েছে। দরজা জানালা নতুন করে রং করা হয়েছিল। লোহার রেলিংগুলোও বহুযুগ পরে ঘষেমেজে পরিষ্কার করা হয়েছে। মিঃ হেনচার্ড তার স্বামী এবং মেয়র হিসাবে তার প্রতি যথেষ্ট নজর রাখেন। তাহলেও এ বিশাল বাড়ীতে এই দুজন নারীর অনুপ্রবেশ এমন কিছু পরিবর্তনের আভাস নিয়ে এ'ল না।

এলিজাবেথের সময় কাটছিল বেশ ভালই। অপার স্বাধীনতা, অনাস্বাদিতপূর্ব আদর-যত্ন—সবই তার কাছে আশাতীত। অফুরন্ত অবসর আর প্রাচুর্য্য তার জীবনে অনেক নতুন দিকের উন্মোচন করে দিল। মানসিক শান্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পুষ্টি এবং সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হল বেশ। নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টিজাত জ্ঞানের অভাব ছিল না তার—কিন্তু শিক্ষা ও রুচি সম্পূর্ণ হয় নি। শীত আর বসন্ত কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর ও মুখের কাঠিন্য মিলিয়ে গেল। চামড়ার খসখসে ভাবকে সে এতদিন ভাবত জন্মদত্ত অভিশাপ। এখন তার ধূসর চিন্তিত চোখে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে যায় কিন্তু তাতে উদ্দামতা নেই। শিশুকাল যাদের দুর্দশা ও কৃচ্ছ্রতায়

কাটে, উচ্ছ্বাস দমন করা তাদের স্বভাবজাত হয়ে যায়। তাই শত প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তারা চিন্তা না করে পা ফেলতে পারে না। কোথায় যে তার দুঃখ, সে নিজেও জানত না। তাই তার বর্তমান আনন্দ নিতান্ত সাময়িক না হয়ে, বরং ভবিষ্যতের গ্যারান্টি হিসেবে যথেষ্ট দৃঢ় এক ভারসাম্য এনে দিচ্ছিল তার মধ্যে।

বেশী সাজগোজের দরকার নেই বাবা! সে মনে মনে বলত। ভগবান যদি কোনদিন আবার দুঃখে ফেলে দেন আমাদের!

একদিন সকালবেলা তিনজনে মিলে খেতে বসেছে। এলিজাবেথ সেদিন চুল বেঁধেছিল খুব সুন্দর করে। হেনচার্ড অনেকক্ষণ থেকে ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। আগেও সে ভেবেছে কয়েকদিন—মেয়ের চুল এমন কটারংয়ের হয়ে গেল কেন!—আচ্ছা, এলিজাবেথের চুল—তুমি তো ছোটবেলায় বলতে না যে, ও'র চুল কালো হবে? সে জিজ্ঞাসা করল স্ত্রীকে।

সুসান চমকে উঠল। পা কাঁপতে লাগল তার। বলল—বলতাম নাকি?

একটুপরে এলিজাবেথ পাশের ঘরে চলে গেলে, হেনচার্ড আবার বলল—একদম ভুলে গিয়েছিলাম আমি। সব সময় খেয়াল থাকে না। যাক্ গে, তুমি কিন্তু বলতে যে বড় হলে ও'র চুল কালো হবে।

হতে পারে। তবে চুলের রং অনেকসময় পাল্টে যায়। উত্তর দিল সুসান।

সে তো কটাচুল কালো হয়ে যায়। কিন্তু কালোচুল আবার কখনও কটা হয়ে যায় নাকি?

হবে না কেন? সুসানের মুখ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু সেটা হেনচার্ডের চোখে ধরা পড়ল না। হেনচার্ড বলে চলল—শোনো! আমি ওকে আমার নামেই নাম দিতে চাই। মিস নিউসন না বলে ওকে মিস হেনচার্ড নামেই ডাকব। আমার নিজের সন্তান, অন্যলোকের নাম ব্যবহার করবে এ কেমন কথা?—ক্যাস্টারব্রিজের কাগজে একটা ঘোষণা করে দিলেই হবে। আমার মনে হয় ও নিজেও রাজী হয়ে যাবে।

না, ওগো না, শোনো—

আমি করবই—হেনচার্ড আপত্তি শুনল না—ও যদি চায়, আমিও চাইছি, তাহলে তোমার রাজী না হওয়ার কি আছে?

ঠিক আছে, ও যদি রাজী থাকে, তবে তাই করো। মিসেস হেনচার্ড উত্তর দিল।

তারপরেই মিসেস হেনচার্ডকে কেমন যেন বিচলিত দেখাতে লাগল। অবশ্যি মানুষের মন সব সময় একরকম থাকে না। একটু পরে উপরে গিয়ে সে দেখে, এলিজাবেথ তার ঘরে বসে সেলাই করছে। মেয়েকে সে তার নাম পাল্টানোর বিষয়ে আলোচনার কথা জানাল, জিজ্ঞাসা করল—তোর কি মত আছে? নিউসনের

অসম্মান হবে না এতে? বিশেষতঃ সে যখন আর বেঁচে নেই।

এলিজাবেথ বলল—দেখি, ভেবে দেখি।

পরে, বিকেলের দিকে হেনচার্ডের সঙ্গে দেখা হলে এলিজাবেথ নিজেই কথাটা পাড়ল—আপনার কি খুবই ইচ্ছা এই নাম বদলে নেওয়ার ব্যাপারে?

ইচ্ছা? আমার ইচ্ছা হবে কেন? ওঃ! তোমরা মেয়েরা তুচ্ছ ব্যাপার এত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে পারো! আমি শুধু একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এখন তুমি ভেবে দেখ। তা'বলে আমাকে খুশী করার জন্যে তোমাকে রাজী হতে হবে না।

ব্যাপারটা এখানেই চাপা পড়ে গেল। আলোচনাও আর হ'ল না। কিছু করা'ও হ'ল না। এলিজাবেথের পুরনো নামই চালু থাকল।

ইতিমধ্যে ডোনাল্ড ফারফ্রীর যোগ্যতায় ও তত্ত্বাবধানে হেনচার্ডের ব্যবসার রমরমা ভাব হয়ে উঠল। আগে চলত গড়িয়ে গড়িয়ে আর এখন চলতে লাগল দুলকি চালে। পুরনো মৌখিক ও স্মৃতিনির্ভর ব্যবস্থা সব উঠে গেল। মুখে মুখে কেনাবেচা না হয়ে, এখন সবকিছু কাগজপত্রে। ফলে একটা সুষ্ঠু পরিচালনার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল।

এলিজাবেথের ঘরটা বাড়ীর মধ্যে বোধহয় সবথেকে উঁচু। প্রায় চিলে-কোঠার কাছাকাছি। সেখান থেকে বাগান পেরিয়ে, সারবন্দী গমের গোলাঘর আর বিচুলি গাদা ভালই নজরে আসে। এলিজাবেথ লক্ষ্য করত, ডোনাল্ড আর মিঃ হেনচার্ড প্রায় অবিচ্ছেদ্য। রাস্তায় চলতে চলতে হেনচার্ড অভ্যস্ত ভঙ্গিতে, ছোট ভাইয়ের মত ফারফ্রীর কাঁধে চাপিয়ে দেয় তার বিশাল হাত—মনে হয় যেন কাঁধটা ভারে নুয়ে পড়ছে। কখনও কখনও কানে আসত, ডোনাল্ডের কথা শুনে, হেনচার্ডের হো হো করে হাসির গর্জন। অথচ ডোনাল্ড হয়তো তখন একটুও হাসছে না, উদাসভাবে দাঁড়িয়ে আছে। হেনচার্ডের নিঃসঙ্গ জীবনে বন্ধু এবং পরামর্শদাতা হিসাবে ডোনাল্ডের স্থান পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমদিনেই হেনচার্ড তাকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হিসেবে যে প্রশংসার দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিল, তার শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও, সেটাই বজায় থেকে গিয়েছিল এখন অবধি।

হেনচার্ডের ভালবাসায় যে একটা প্রভুত্বের মনোভাব আছে সেটা এলিজাবেথের দৃষ্টি এড়ায় নি। তা সত্ত্বেও অশোভন ব্যাপারে ডোনাল্ড প্রতিবাদ করতে ছাড়ত না। একদিন এলিজাবেথ ওপর থেকে শুনতে পেল—ফারফ্রী হেনচার্ডকে বলছে, সবসময়ই সর্বত্র তারা দুজন যদি একই সঙ্গে ঘুরবে, তাহলে দেখাশোনা করার জন্যে তাকে আর রাখার কি মানে হয়? মালিক যেখানে যেতে পারবেন না, সেখানেই ম্যানেজারের যাওয়া উচিত। হেনচার্ড চেঁচিয়ে উঠল—রাখো তো, উচিত-অনুচিত।

আলাপ করার জন্যে আমার একজন লোক দরকার। চলো, চলো, রাতের খাবার খেয়ে নেওয়া যাক। তুমি অত ভাবলে, আমার মাথাটাই খারাপ করে ফেলবে।

এলিজাবেথ যখন মায়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরুতো, দেখতো, ফারফ্রী উৎসুকদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। 'থ্রী মেরিনার্স'-এর স্মৃতিই এ'র কারণ হতে পারে না, কেন না তখন ফারফ্রী তার প্রতি মোটেই আগ্রহ দেখায় নি। তাছাড়া, ছেলেটার দৃষ্টি যেন তার মায়ের দিকেই বেশী। এলিজাবেথ ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিয়েছিল, যেন লক্ষ্যই করেনি। মনে মনে নিজের হতাশার জন্যে হয়তো মার্জনাও করতো সে ছেলেটিকে—আবার ভাবত, হয়তো ফারফ্রী কিছু না ভেবে এম্নিই তাকাচ্ছে।

ক্যাস্টারব্রিজ শহরের কোনও শহরতলী ছিল না। চারিদিকেই সবুজ মাঠ। মাঠের মধ্যে এখানে-সেখানে উঁচু উঁচু গুদামঘর। ফসল উঠলে পর প্রথমেই সেখানে গুদামজাত করা হয়—তারপর গাড়ী বোঝাই হয়ে চলে আসে বেচাকেনার প্রাণকেন্দ্র এই শহরে। মাঠের মধ্যে ঐসব ঘরে মজুররা থাকে কেউ কেউ—দিনের বেলা ক্ষেতে কাজ করে তারা।

হেনচার্ডের ব্যবসা ছড়ানো ছিল এইসব চাষীদের মাঝে। প্রায়ই তার গাড়ী যেত এইসব গুদামে—আর বোঝাই হয়ে ফিরে আসত শহরে। এই রকম এক গুদাম থেকে একদিন গম আসার কথা। এলিজাবেথ একটা চিরকুট পেল—তাতে লেখা, সে যেন এখুনি ডার্ণওভার হিলের ওপর গুদামঘরে পত্রলেখকের সঙ্গে দেখা করে—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ওখান থেকেই হেনচার্ডের মাল আসছিল এখন। এলিজাবেথ ভাবল হয়তো সেইসব সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে ডার্ণওভার হিলের দিকে যাত্রা করল। গুদামঘরটা মাটি থেকে বেশ উঁচু, মই বেয়ে উঠতে হয় ওপরে। দরজা খোলা, কিন্তু ভিতরে কেউ নেই। এলিজাবেথ নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। একটু পরে দেখা গেল, একটা লোক অদূরেই হাঁটতে হাঁটতে আসছে। সে ডোনাল্ড ফারফ্রী। এলিজাবেথ কী এক অকারণ লজ্জায়, ও'র সঙ্গে একা দেখা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না তাই, মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ফারফ্রী তাকে দেখতে পেল না। ফারফ্রী পৌঁছে দেখল, সেখানে আর কেউ নেই। একটুক্ষণ দাঁড়াতেই, দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তখন ফারফ্রী সরে গিয়ে ঘরটার নীচে দাঁড়াল যেখানে এলিজাবেথ দাঁড়িয়েছিল একটু আগে। একটা খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে থাকল সে। সে'ও নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে কারও জন্যে। এলিজাবেথের জন্যেই কি? হতেও পারে, কিন্তু কেন? একটু পরে ফারফ্রী ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করল—সেটা ঠিক এলিজাবেথের পাওয়া চিঠিরই আরেকটা কপি।

পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। যত সময় যাচ্ছিল, এলিজাবেথের অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছিল খুব। এখন মই বেয়ে ওপর থেকে নেমে যাওয়া মানে সে যে এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল সেটাই প্রকাশ করে দেওয়া। একেবারে'ই বোকার মত কাজ হয়ে যাবে—তাই সে অপেক্ষা করতে থাকল। এলিজাবেথের পাশেই ছিল একটা হাওয়া-দেওয়া মেসিন। এটা দিয়ে হাওয়া দিলে গমের দানা থেকে, নোংরা, চিটে ইত্যাদি উড়িয়ে পরিষ্কার করে দেয়। কৌতূহলবশে এলিজাবেথ একবার হাতলটা ঘোরাল। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ গমের ভুষি তার চোখে, মুখে, জামাকাপড়ে ছড়িয়ে পড়ল। শব্দ শুনে ফারফ্রী ওপরের দিকে তাকাল। তারপর মই বেয়ে উঠে এল।

ও! মিস নিউসন! ভেতরে তাকিয়েই ফারফ্রী বলল কথাটা—আপনি ছিলেন এখানে। আমি ঠিকমতই এসেছি, বলুন, কি করতে পারি?

মিঃ ফারফ্রী! এলিজাবেথের কথা বেধে যাচ্ছিল। আমিও তো সেজন্যেই এসেছি। আপনিই আমাকে আসতে বলেছিলেন, তাতো বুঝতে পারি নি—নইলে—

আমি আসতে বলেছি? কই না তো! আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে।

আপনি আমাকে আসতে বলেন নি? এ লেখাটা আপনার নয়? এলিজাবেথ তার চিঠিটা বার করে ধরল।

না, আমার লেখা হতে যাবে কেন? আচ্ছা দেখুন তো—এটা আপনার লেখা নয়? ফারফ্রী তারটাও বার করে দেখাল।

না তো।

আচ্ছা ব্যাপার তো! তাহলে বোধহয় কেউ একজন আমাদের দু'জনের সঙ্গেই দেখা করতে চান। আমাদের বরং আর একটু দাঁড়িয়ে দেখা উচিত।

এই ভেবে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। ফারফ্রী বারবার মুখ বার করে দেখছিল, তাদের আহ্বায়ক কেউ আসে কি না। বৃষ্টির ফোঁটা গুলো বিচুলি গাদার উপর পড়ে একটু একটু করে নেমে যাচ্ছিল বিচুলির গা বেয়ে বেয়ে। কিন্তু কাউকেই আসতে দেখা গেল না।

নাঃ, কেউ আসবে না। ফারফ্রী বলল। কেউ বোধহয় মজা করেছে। অনেকটা সময় নষ্ট হ'ল শুধু শুধু। এত কাজ পড়ে রয়েছে।

ইয়ার্কিটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে—এলিজাবেথ বলল।

হুম্।—একদিন নিশ্চয়ই টের পাওয়া যাবে কার কাজ এটা—তখন দেখা যাবে। অবশ্যি আমি এমন একটা কিছু মনে করি নি, আপনি?

আমারও কিছু খারাপ লাগে নি, সে উত্তর দিল।

আবার চুপচাপ হয়ে গেল দুজনে। একটু পরে এলিজাবেথ প্রশ্ন করল—আপনি কি স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যাবেন, মিঃ ফারক্রী ?

না তো, ফিরে যাব কেন ?

না, সেদিন 'থ্রী মেরিনার্স'-এ আপনি সেই গানটা গাইছিলেন না—আপনার দেশের গান। মনে হচ্ছিল আপনার দেশকে আপনি ভীষণ ভালবাসেন—তাই আমাদেরও খুব ভাল লেগেছিল আপনাকে।

হুম্। তা গেয়েছিলাম বটে। কিন্তু মিস্ নিউসন! ডোনাল্ডের গলায় যেন গানের সুর খেলে গেল—যেটুকু সময় গান গাওয়া যায়, ততক্ষণ আপনার খুব ভাল লাগবে—চোখ যেন জলে ভরে আসে—তারপর অনেক—অনেক দিন, দেশের কথা আর মনেই পড়বে না। আমি দেশে ফিরতে চাই না। গানটা অবশ্যি গাইতে পারি—আপনার ভাল লাগলে এখনই শোনাতে পারি।

না, এখন থাক, আমাকে যেতে হবে, বৃষ্টি বন্ধ হোক আর না হোক।

অ। তাহলে শুনুন, এই ধোঁকাবাজির কথা আর কাউকে বলবেন না। আর কেউ যদি বলতে আসে তো খুব সহজভাবে নেবেন—যেন আপনি কিছুই মনে করেন নি। তাহলে তার ঠাট্টাটাই মাঠে মারা যাবে। ফারক্রী বলতে বলতে এলিজাবেথের জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল—আপনার গায়ে যে ধূলো আর ভুষি ভর্তি। টেরই পান নি বোধহয় ? খুব সৌজন্যের সঙ্গে বলল সে—এ'র ওপরে জল পড়লে তো একেবারে সেঁটে যাবে, আর ছাড়ানো যাবে না। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি উড়িয়ে দিচ্ছি।

এলিজাবেথ হ্যাঁ'ও করল না, না'ও করল না। ডোনাল্ড ফারক্রী ফুঁ দিয়ে তার পেছনের চুল, পাশের চুল, কাঁধ, গলা, গাউন সবের থেকে ভুষি উড়িয়ে দিল। প্রতিটি ফুঁ দেওয়ার সময় এলিজাবেথ বলছিল—ধন্যবাদ। এখন সে পরিষ্কার হয়ে গেল। ফারক্রীর কাজ মিটে গেলেও, এলিজাবেথের চলে যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।

দাঁড়ান, আপনাকে একটা ছাতা এনে দিই—ফারক্রী বলল।

এলিজাবেথ রাজী হ'ল না। বাইরে বেরিয়ে, চলে গেল সে। ফারক্রী পেছন পেছন আস্তে আস্তে হেঁটে এল। দূরে এলিজাবেথের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে সে ভাবছিল আর গুণ গুণ করে গাইছিল—"আমার চলার পথে"—

।। পনের ।।

ক্যাস্টারব্রিজের কোন লোকই এতদিন মিস নিউসনকে উঠতি সুন্দরী বলে স্বীকার করত না। একমাত্র ডোনাল্ড ফারফ্রীর চোখে ধরা ছাড়া, আর বিশেষ কারও দৃষ্টি সে আকর্ষণ করতে পারে নি। কারণ নিজের সম্পর্কে সে বিশেষ মনোযোগী ছিল না। পোষাক পরিচ্ছদ নিতান্ত সাধারণ। এখন সঙ্গতি হয়েছে বলেই যে দামীদামী জামাকাপড় পরতে হবে—এমনটি মনে হয় নি কোনদিন। কিন্তু শখ থেকে মানুষের সাধ-আহ্লাদ জন্মায়, আর সাধ-আহ্লাদ মেটান'র অপর নাম অভাববোধ। হেনচার্ড এলিজাবেথকে একজোড়া সুন্দর দস্তানা কিনে দিয়েছিল, একদিন সেটা তার পরবার শখ হল। কিন্তু উপযুক্ত ফুলহাতা জামা ছিল না—অতএব সুন্দর দেখে একটা জামা কিনতে হ'ল। তা থেকেই একে একে এল আরও অনেক কিছু। যাহা বাহান্ন, তাহা তেপান্ন—একটুর জন্যে কোন কিছু অসম্পূর্ণ রাখা ঠিক নয়।

এখন অনেকের চোখ পড়তে লাগল তার দিকে। এলিজাবেথ নিজেও বুঝল অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে। মনে মনে ভাবল—জীবনে এই প্রথম খুব প্রশংসা পাচ্ছি—মন্দ নয়—তবে এই সমস্ত লোকের থেকে প্রশংসা পাওয়া না-পাওয়া সমান কথা। অবশ্যি ডোনাল্ড ফারফ্রীও ছিল তার গুণগ্রাহী। মোটের উপর সময়টা বেশ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কাটছিল। একদিন বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসে জামাকাপড় না ছেড়েই সে খাটের উপর ধপ করে শুয়ে পড়ল। ফিসফিস করে বলল—হায় ভগবান! আমাকেই সবাই শহরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলছে!—নিজের নারীত্ব সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে উঠছিল আস্তে আস্তে। কিন্তু তার মনে হত এত প্রশংসা হয়তো তার প্রাপ্য নয়!

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে দেখল হেনচার্ড আর ফারফ্রী, উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মেয়রের হাঁকডাক সেই একই রকম আর ডোনাল্ডের আচরণ তার স্বভাবসুলভ সৌজন্যমাখা। মানুষে-মানুষে বন্ধুত্ব যে কত গ্রানাইটের মত শক্ত হতে পারে, এদের দুজনকে দেখে তার ধারণা করা যায়। তথাপি—সে পাথরে ফাটল ধরাতে পারে এমন একটি বীজ অজান্তে পরিণত হচ্ছিল খুবই গোপনে।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কাজকর্ম গোছগাছ করে সকলেই বাড়ী যাওয়ার উদযোগ করছে। একটা উনিশ-কুড়ি বছরের অলস জোয়ানকে চেঁচিয়ে ডাকল হেনচার্ড—এ্যাই-অ্যাবেল হুইট্‌ল্!

লোকটি পেছন ফিরে দৌড়ে এসে দাঁড়াল। সে যেন বুঝতে পারছিল, এরপর তাকে কি বলা হবে।

তোমাকে আবার বলে দিচ্ছি, কাল সকালে যেন দেরী না হয়। যা বলছি শুনতে পাচ্ছ তো! আবার আমাকে বিরক্ত করবে না আশা করি।

হ্যাঁ, স্যার বলে অ্যাবেল হুইট্‌ল্ চলে গেল। আর কাউকে দেখা গেল না।

বেচারী অ্যাবেল—এর একটা ভয়ানক বদভ্যাস ছিল দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা। তাই কাজে আসতেও দেরী করত সে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে একদিনও সবার আগে আসতে পারে নি। বরং অতিরিক্ত সাবধান ছিল বলে, পায়ের গোছে একটা দড়ি বেঁধে জানালা দিয়ে সে বাইরে ঝুলিয়ে রাখত। বন্ধুরা কাজে বেরিয়ে সেই দড়িটা ধরে টানাটানি করলে, ঘুম ভাঙত তার। কোনদিনই সে সময়মত হাজিরা দিতে পারে নি।

বেশীর ভাগ সময়েই তার কাজ ছিল, বস্তাগুলো ওজন করা, অথবা গুদাম থেকে বস্তা বার করা, বা বাইরে থেকে এনে ভেতরে ঢোকানো। এ সপ্তাহে দু'দিন দেরী করে আসাতে, এক ঘণ্টার ওপরে কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল অন্যদের। সেইজন্যেই হেনচার্ড সতর্ক করে দিল তাকে। এখন দেখা যাক্ আগামীকাল কি করে।

পরের দিন সকাল ছ'টায় হুইট্‌লের দেখা নেই। সাড়ে ছ'টায় হেনচার্ড উঠোনে নেমে এল। গাড়ী-ঘোড়া সবই তৈরী। আজ বাইরে থেকে মাল আসবে। অন্য লোকটি প্রায় বিশ মিনিটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হেনচার্ডের রাগ চড়ে গেল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এল হুইট্‌ল্। হেনচার্ড কোনরকমে নিজেকে সংযত করে হুইট্‌ল্‌কে শেষকথা বলে দিল—আগামীকাল থেকে এসব আর চলবে না।

আমার মাথায় কি যেন আছে হুজুর! অ্যাবেল বলল—সত্যিই বিশ্বাস করুন। মাথার ভেতরে—মগজটা কেমন যেন জমাট বেঁধে যায়। ভগবানের নামও করতে পারি নে একটু। বিছানায় শুয়ে একটু আরামও করতে পারি নে। শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়ি। আবার ঘুম ভাঙতেই উঠে পড়ি। বিছানাটা কেমন জিনিস বুঝতেই পারলাম না। কত চেষ্টা করি—রাত্রে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি—

ওসব আমি শুনতে চাই নে। গর্জন করে উঠল হেনচার্ড। কালকে ঠিক ভোর চারটেয় গাড়ী ছাড়বে, তার মধ্যে যদি তুমি না আসতে পার, তোমার চামড়া খুলে নেব।

আমার কথাটা শুনুন, মালিক!

হেনচার্ড মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, অথচ আমার কথা শুনলেন না। অ্যাবেল অন্য সবার দিকে তাকিয়ে বলল। এখন ওঁনার ভয়ে সারারাত আমাকে ঘরের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াতে হবে।

পরের দিন গাড়ী যাওয়ার কথা অনেকদূর, 'ব্ল্যাকমুর ভেল'-এ। ভোর চারটে না বাজতেই আঙ্গিনায় আলোর চলাফেরা দেখা গেল। কিন্তু অ্যাবেল আসে নি। অন্য দুজনের একজন ছুটে যাচ্ছিল অ্যাবেলকে ডাকতে। তার আগেই হেনচার্ডকে দেখা গেল বাগানের দরজায়।—অ্যাবেল হুইট্‌ল্ কোথায়? এত বলার পরেও আসেনি? ও'র চামড়াই ছাড়িয়ে নিতে হবে, অন্য কিছুতে হবে না। আচ্ছা, আমি দেখছি।

হেনচার্ড অ্যাবেলের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল। দরজায় তার খিল দেওয়া থাকত না। চুরি যাওয়ার মত কিছুই ছিল না। হুইটল্-এর বিছানার কাছে গিয়ে চিৎকার করে একবার ডাক দেওয়াতেই ঘুম ভেঙে গেল তার। লাফ দিয়ে উঠে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে হেনচার্ড স্বয়ং তার সামনে। ঢালাই লোহার মত বাঁকাচোরা বন্ধ হয়ে গেল তার। নীচু হয়ে পাৎলুনটাও পরে নিতে পারল না।

চলো। এখুনি চলো। কাল থেকে আর দরকার হবে না তোমাকে। চলো ঐ ভাবেই চলো। শিক্ষা একটু হওয়া দরকার—পাৎলুন থাক পড়ে।

হুইট্‌ল্ যেতে যেতে কোনরকমে কোটটা টেনে নিল। জামার উপরে সেটা গলিয়ে দিল সিঁড়িতে নামার সময়, জুতোদুটোও ঢুকিয়ে নিল পায়ে। আর হেনচার্ড তার মাথায় ছুঁড়ে দিল টুপিটা। হুইট্‌ল্ চলল আগে আগে, হেনচার্ড পিছনে।

এই সময়ে ফারফ্রী'ও হেনচার্ডের খোঁজে বেরিয়েছিল। পেছন দিকের দরজায় এসে, ভোরের আধো-অন্ধকারে, সাদা কি একটা পৎ পৎ করতে দেখল সে। কাছে গিয়ে দেখে হুইট্‌লের কোটের নিচে জামার বেরিয়ে থাকা অংশটা হাওয়ায় উড়ছে।

হায় ভগবান! এটা আবার কি? অ্যাবেলকে দেখে ফারফ্রী বলল। হেনচার্ড তখন আরও খানিকটা পিছনে।

দেখুন মিঃ ফারফ্রী! ভয়-জড়ানো হাসি হেসে বলল অ্যাবেল—উনি বলেছিলেন আমার চামড়া ছাড়িয়ে নেবেন—আর তাই করলেন শেষ পর্যন্ত। আমার কিছু করার নেই মিঃ ফারফ্রী? এ'রকম হয় মাঝে মাঝে। এখন আমাকে এই জাঙ্গিয়া পরে ব্ল্যাকমুর যেতে হবে। মালিকের ইচ্ছা যখন—কিন্তু তারপর আমি আত্মহত্যা করব। এত অপমান আমার সইবে না। মেয়েরা সব জানালা খুলে দেখবে—কেমন আমার চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে—আর হেসে গড়িয়ে পড়বে। ইস্ কেমন লাগবে আমার বলুন তো মিঃ ফারফ্রী—আমি ঠিক কিছু একটা করে ফেলব।

যা, বাড়ী যা—পাৎলুন পরে আয়। পুরুষ মানুষের মত কাজে আসবি, নৈলে তোকে মেরে ফেলব আমি।

কি ক-রে যাব? মিঃ হেনচার্ড বলেছেন এইভাবে—

কে কি বলেছে আমি জানতে চাই নে। অসভ্যতার একটা সীমা আছে! যাও

জামাকাপড় পরে এসো এক্ষুণি।

কে? কে? পেছন থেকে হেনচার্ড এগিয়ে এল—কে ওকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছে?

সকলেই তখন ফারফ্রীর দিকে তাকাল।

আমি—বলল ডোনাল্ড—আমি মনে করি, ও'র যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

আমি মনে করি হয় নি। চলো গাড়ীতে ওঠো হুইট্‌ল্!

আমি যদি ম্যানেজার হই, তাহলে ও উঠবে না—বলল ফারফ্রী। হয় ও বাড়ী চলে যাবে, নইলে আমি এখান থেকে চলে যাব।

হেনচার্ড কঠিন রক্তিমচোখে তার দিকে তাকাল। ডোনাল্ডও তাকাল তার দিকে। ডোনাল্ড এগিয়ে গেল। সে বুঝল যে হেনচার্ড অনুতপ্ত।

চলুন—বলল ডোনাল্ড আসতে আসতে—আপনার মত লোকের এ'টা শোভা পায় না। আপনারই অসম্মান হবে এ'তে।

মোটেই না—অভিমানী ছেলের মত বলল হেনচার্ড—ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। খুব যেন আহত হয়েছিল সে। তুমি কেন ওদের সামনে ওভাবে কথা বললে? আমাকে আলাদা বলতে পারতে। হুঁ, বুঝেছি। তোমার কাছে আমি আমার কিছুই গোপন রাখি নি—সেই বোকামির সুযোগ নিচ্ছ তুমি।

আমার ভুল হয়ে গেছে। ফারফ্রী সহজভাবে বলল।

হেনচার্ড মাটির দিকে তাকিয়ে, আর কিছু না বলে, চলে গেল। বেলা হলে, ফারফ্রী জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল—হেনচার্ড সারাটা শীতকাল, অ্যাবেলের মাকে বিনাপয়সায় খাবার জুগিয়েছে। মনিবের প্রতি তার মন কিছুটা প্রসন্ন হ'ল। হেনচার্ড কিন্তু সারাদিন চুপচাপ নিজের মেজাজ নিয়ে থাকল। একজন লোক জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল, ভুট্টার বস্তা কিছু ওপরে তোলা হবে কিনা, সে ছোট করে উত্তর দিল—মিঃ ফারফ্রীকে জিজ্ঞাসা করো—উনিই এখানকার মালিক।

বস্তুতঃ ফারফ্রীই মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আগেকার মত হেনচার্ড সবার কাছে প্রাণপুরুষ বলে গণ্য হ'ত না। একদিন ডার্ণওভারের এক চাষী মারা গেলে, তার মেয়ে মিঃ ফারফ্রী'র কাছে লোক পাঠিয়েছিল, তাদের বাড়ী গিয়ে বিচুলিগাদার একটা দাম কষে দিতে। খবরটা নিয়ে এসেছিল একটা বাচ্চাছেলে। সে ফারফ্রীর বদলে হেনচার্ডকে দেখল উঠোনে দাঁড়িয়ে।

ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। হেনচার্ড বলল।

কিন্তু, মিঃ ফারফ্রী কি যাবেন না? ছেলেটা প্রশ্ন করল।

আমিই যাচ্ছি ওদিকে—আবার ফারফ্রী কেন? হেনচার্ড নিশ্চিতভাবে বলল—সব কথায় ফারফ্রীকে খোঁজে কেন লোকে?

কারণ সবাই বোধহয় ওঁকে ভালবাসে।

ও! তা'ই বলে বুঝি সকলে? ভালবাসার কারণ বোধহয় সে হেনচার্ডের থেকে বেশী চালাক। জানেও অনেক বেশী। সোজা কথা হেনচার্ড ও'র নখেরও যুগ্যি না—তাই না?

হুঁ, ঠিক বলেছেন, তাই হবে।

ও! আর কি বলে? বলো তো, এই নাও তোমাকে ছ'টা পয়সা দেব—'

আর ওঁর মেজাজটা খুব ভাল। সবাই বলে হেনচার্ড বোকা। কতকগুলো মেয়েলোক তো সেদিন বাড়ী যেতে যেতে বলছিল—লক্ষীছেলে, সোনার ছেলে, ভারী ভালো। আরও বলছিল, ওঁর বুদ্ধি অনেক বেশী। হেনচার্ড মালিক না হয়ে, উনি মালিক হলে নাকি ভাল হ'ত।

যা বলে বলুক। হেনচার্ড দুঃখ চেপে রেখে বলল—আচ্ছা, তুমি এখন যাও। আমি যাচ্ছি। দামটা বলে দিয়ে আসব খন, বুঝেছ?—ছেলেটা চলে গেলে হেনচার্ড বিড়বিড় করে বলল—সবাই বলছে, উনি মালিক হলে ভালো হ'ত—এঁ্যা!

হেনচার্ড ডার্ণওভারের দিকে চলল। যাওয়ার সময় সে ফারফ্রীকে ডেকে নিল সাথে। একসঙ্গেই হাঁটছিল তারা কিন্তু হেনচার্ড প্রায় সর্বক্ষণই মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

আপনাকে সুস্থ মনে হচ্ছে না তো? ডোনাল্ড জিজ্ঞাসা করল।

না, আমি খুব সুস্থ আছি। বলল হেনচার্ড।

কিন্তু মনটা বেশ ভার দেখছি আপনার! মন খারাপ করার কিছু নেই। ব্ল্যাকমুর থেকে আমরা খুব ভাল মাল পেয়েছি—ভালই লাভ থাকবে মনে হয়। ও একটা কথা—ডার্ণওভারে একটা বিচুলি গাদার দাম কষে দিয়ে আসতে হবে।

হুঁ, আমি সেখানেই যাচ্ছি।

চলুন, আমিও যাই।

হেনচার্ড কথাবার্তা বলছিল না দেখে, ফারফ্রী আপন-মনে একটা সুর ভাঁজছিল। চাষীর বাড়ীর সামনে এসে তার গান থামিয়ে দিল। বলল—এই শোকার্ত পরিবারের সামনে আমার গান করা উচিত না।

তুমি কি অন্যলোকের মনে দুঃখ দেওয়া নিয়ে এত চিন্তা কর? হেনচার্ড কপাল কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল—কর না জানি, অন্ততঃ আমার বেলায়।

আপনাকে যদি কখনও দুঃখ দিয়ে থাকি, আমি মার্জনা চাইছি। ফারফ্রী হাঁটা বন্ধ করে, হেনচার্ডের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল—কিন্তু আপনি এ কথা তুললেন কেন?

হেনচার্ডের কপাল থেকে মেঘ কেটে গেল। ডোনাল্ডের কথা শেষ হলে, হেনচার্ড মুখ উঁচু করে তাকাল, ডোনাল্ডের মুখের দিকে নয়—বুকের ওপরে।

অনেক কথা কানে আসছে আমার। সে জন্যে মনটা আমার খারাপ। হেনচার্ড বলল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি আসলে তেমন নও। যাও, ফারফ্রী বিচুলির দামটা তুমিই কষে দিয়ে এস। আমি আর যাব না। তুমি আমার থেকে ভাল পারবে। আসলে তোমাকেই ওরা ডেকে পাঠিয়েছিল। আমাকে এগারটার সময় টাউন কাউন্সিলের একটা মীটিংএ যেতে হবে। সময়ও হয়ে গেছে।

নতুন করে বন্ধুত্ব স্থাপন হ'ল তাদের। ডোনাল্ড অনেক কথার অর্থ পরিষ্কার না বুঝলেও, তা নিয়ে হেনচার্ডকে বিব্রত করল না, আর হেনচার্ড আবার তার পুরনো শান্তিতে ফিরে গেল। কিন্তু যখনই ফারফ্রীর কথা মনে হত, কেমন একটা ভয় এসে চেপে ধরত তাকে। মাঝে মাঝে দুঃখ হ'ত এই ভেবে, যে, ছেলেটাকে তার জীবনের অত কথা খোলসা করে না বললেই ভাল করত সে।

॥ ষোল ॥

ফারফ্রীর সঙ্গে হেনচার্ডের ব্যবহার অকারণে খনিকটা চাপা হয়ে গেল। এখন তার আলাপ-ব্যবহারে সৌজন্য খুব বেশী। ফারফ্রী হেনচার্ডের মধ্যে একটা সতেজ এবং বিশ্বস্ত হৃদয় আছে বলে জানলেও তাকে ভাবত বিশৃঙ্খল। আর কখনই মহাজন তার ম্যানেজারের কাঁধে বিশাল হাতখানা চাপিয়ে দিত না। ডোনাল্ডের বাসায় গিয়ে আগের মত হৈ হৈ করে চেঁচামেচিও করত না—এ্যাই ফারফ্রী! চল হে চল—আমার সঙ্গে একসাথে খাবে চল আজ। কিন্তু তাদের দৈনন্দিন কাজের রুটিনে কোনও পরিবর্তন হ'ল না।

এমন সময় একটা উৎসবের দিন এল। সারা দেশ মেতে উঠল আনন্দে। ক্যাস্টারব্রিজের লোকেরা স্বভাবতঃই ধীরপ্রকৃতির। প্রথম প্রথম তাই তেমন কোনও উৎসাহ দেখা যাচ্ছিল না। ডোনাল্ড ফারফ্রী একদিন হেনচার্ডের কাছে কথাটা তুলল। জিজ্ঞেস করল, গোটা কয়েক তাঁবু আর ত্রিপল পাওয়া যায় কিনা—তারা কয়েকজনে মিলে একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছে, সেজন্যে হয়তো অল্পকিছু প্রবেশমূল্যও ধার্য্য করতে পারে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যতগুলো ইচ্ছে নাও না। হেনচার্ড উত্তর দিল।

ম্যানেজার চলে গেলে, হেনচার্ডের মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল। এমনদিনে মেয়র হিসেবে তারও কিছু করা উচিত। অন্ততঃ সময় থাকতে একটা মীটিং ডাকা উচিত ছিল। কিন্তু ফারফ্রী এত ঝটপট সব করে ফেলে—বয়স্ক লোকদের উদ্যোগ করে কিছু করবার আর উপায় নেই। যাই হোক, এখনও সময় আছে। আরও খানিক ভেবে সে ঠিক করল, কাউন্সিলের অন্য মেম্বাররা যদি রাজী থাকেন, তাহলে সে নিজেই বিধিব্যবস্থা করে কিছু আমোদফুর্তির আয়োজন করবে।' মেম্বারদের অধিকাংশই হাঁটুধরা বুড়ো। ও সব ঝুট ঝামেলা পছন্দ করেন না। অনর্থক দেরী না করে সম্মতি দিয়ে দিলেন তাঁরা।

এখন হেনচার্ডকে যোগাড়যন্তরে নামতে হল। একটা দেখবার মত ব্যাপার করতে হবে। অন্ততঃ এই প্রাচীন শহরের নামটা যেন থাকে। ফারফ্রীর ও'সব ছোট খাট নাচাকোঁদা, হেনচার্ডকে পাত্তা দিতে গেলে চলে না। শুধু এক-আধবার মনে পড়লে ভাবত, ও আবার টিকিটের ব্যবস্থা করেছে! স্কচম্যানই বটে! কে যাবে পয়সা দিয়ে তোর নাচন দেখতে? মেয়রের নিজের অনুষ্ঠান বলে কথা—বিনিময়ে পয়সা নেওয়ার চিন্তা সে মাথায় স্থান দিতেই পারে না।

ডোনাল্ডের উপর তার নির্ভরতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, এক-আধবার তাকে ডেকে পরামর্শ করার কথা মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছিল সে। ফারফ্রী হয়তো এমন এমন কথা বলে বসবে যে তার নিজের প্ল্যান সব ভেস্তে যাবে। ম্যানেজারের বুদ্ধিশুদ্ধির কাছে তখন নিজেকে শুধু তবলার পাশে বাঁয়া হয়ে থাকতে হবে।

মেয়রের এই বিশাল আয়োজনের ইচ্ছা সকলেরই খুব প্রশংসা পেল। বিশেষতঃ তিনি নিজেই সমস্ত খরচাটা বহন করবেন। ক্যাস্টারব্রিজ শহরের পাশ দিয়েই ছোট্ট একটা গৃহস্থ-নদী বয়ে গেছে। তার পাড়ে মোটামুটি বড় একটা পতিত জমি ছিল। খেলাধুলো, মেলা, আমোদ-প্রমোদের যাবতীয় ব্যবস্থা হত এখানেই। হেনচার্ডও ঠিক করল এখানেই হবে তার অনুষ্ঠান।

সারা শহরে গোলাপী রঙের পোষ্টার পড়ে গেল। সব রকম খেলাধুলোর আয়োজন করা হয়েছে। বহুসংখ্যক কর্মী দিবারাত্র পরিশ্রম করতে লাগল এজন্যে। কেউ তেল-মাখানো খুঁটি পুঁতছে—মাথায় বাঁধা থাকবে রুটি আর মাংস। নদীর ওপর দিয়ে একটা করে বাঁশ বেঁধে পোল তৈরী করা হ'ল। ওপারে বাঁধা জ্যান্ত একটা ছাগল-ছানা। যে পার হয়ে যেতে পারবে—তার হবে সেটা। কুস্তি, বক্সিং ইত্যাদি বহুতর ব্যবস্থা। সবশেষে ঢালাও চায়ের আয়োজন—প্রত্যেকের জন্যে—এবং বিনা পয়সায়।

যাওয়া-আসার পথে, ফারফ্রী কি করছে না করছে নজরে পড়লো মেয়রের।

পাশাপাশি কতকগুলো গাছে-ঘেরা মধ্যিখানে ফাঁকা একটা জায়গা। ফারফ্রী সেখানে ফাঁকা জায়গাটাকে ঢাকার ব্যবস্থা করছিল তাঁবু দিয়ে—গাছের ডালে বেঁধে বেঁধে। হেনচার্ডের মনে এখন আর কোনও অতৃপ্তি ছিল না। কারণ তার নিজের আয়োজনের সঙ্গে এর কোনও তুলনাই চলে না।

নির্ধারিত দিনে সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা করল। আগের দু'তিনদিন ছিঁটে ফোঁটা মেঘও ছিল না আকাশে। আজ বাতাস বইছিল পূর্বদিক থেকে। বৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। হেনচার্ড ভাবল আগে থেকে সাবধান হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু এখন আর সময় নেই। বেলা বারটা নাগাদ বৃষ্টি নামল। ধীরে ধীরে, কিন্তু অবিশ্রান্ত ধারায়। মনে হচ্ছিল এযেন আর কোনদিন থামবে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পথঘাট জলে থৈ থৈ করতে লাগল।

বেশ কিছু উৎসাহী লোক জড় হয়েছিল খেলাধূলো দেখতে। কিন্তু বেলা তিনটে নাগাদই হেনচার্ড বুঝতে পারল—তার সমস্ত আয়োজন মাঠে মারা যাবে। খুঁটির মাথায় রুটি আর মাংস জলে ভিজে মরা ইঁদুরের মত হয়েছে। আর ছাগলছানা বৃষ্টিতে ভিজে প্রায় আধমরা। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। দু'চারজন লোক হয়ত এদিক-ওদিক আশ্রয় নিয়েছিল। কাদামাটি মেখে, কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে বাঁচল তারা।

সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ তাণ্ডব থেমে গেল। এখনও দু'একটা অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। সমবেত নাচের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। একটু পরে হেনচার্ড বলল—কিন্তু লোক কোথায়? দু একটা পুরুষ আর মেয়েছেলেকে এগুতে দেখা গেল। দোকানপাট সব আজ বন্ধ—তবে লোকজন নেই কেন?

ওরা সব ফারফ্রীর তামাশা দেখতে গেছে। পেছন থেকে একজন কাউন্সিলম্যান বলল। সে তখনও মেয়রকে ছেড়ে যায় নি।

কিছু যেতে পারে, কিন্তু বাকি সবাই কোথায়?

বাইরে যারা বেরিয়েছে, সবাই ওখানে গেছে।

তার মানে সব বোকার হদ্দ আর কি!

হেনচার্ড মেজাজের মাথায় পায়চারী করতে লাগল। দু'একজন যুবক ছেলে এগিয়ে এসেছিল। শারীরিক কসরৎ দেখান'র জন্যে। কিন্তু হেনচার্ড বিরক্ত হয়ে বলল—ওসব এখন বন্ধ থাক। খাবারদাবার সব গরীবলোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হোক। কিছুক্ষণের মধ্যেই, গোটাকয়েক বাঁশ, খুঁটি আর তাঁবু ছাড়া কিছুর চিহ্ন পাওয়া গেল না সারা চত্বরে। পুরো দৃশ্যটা পরিত্যক্ত ম্লান হয়ে রইল!

হেনচার্ড বাড়ী ফিরে স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে বসে চা খেল। তারপর বাইরে বেরিয়ে

গেল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সে দেখল অধিকাংশ লোকেরই গতি একমুখী—সেটা ফারফ্রীর তামাশাস্থল। হেনচার্ডও সেইদিকে পা বাড়াল। সেখানে পৌঁছে দেখে, সরবে ব্যাণ্ড বাজছে। ফারফ্রী বেশ বুদ্ধি করে, খুঁটি বা দড়িদড়া ছাড়াই বিশাল এক তাঁবুর ব্যবস্থা করেছে। কড়ি বরগা ছাড়া সে এক বিরাট ছাদ। যেদিক থেকে হাওয়া বইছে সেদিকটা ঢাকা, আর অন্যদিকগুলো খোলা। হেনচার্ড ঘুরে ঘুরে সবটা দেখল, তারপর ভেতরদিকে তাকাল।

চতুর্দিকে ঘিরে বসে আছে নানা রকমের মেয়ে আর পুরুষ। মাঝখানে নাচের ব্যবস্থা। ফারফ্রী নিজে পরেছে বিচিত্র এক পোষাক। পালক-টালক দিয়ে অনেকটা শিকারীর মত। তালে তালে পা ফেলছে আর গান গাইছে। হেনচার্ডের হাসি পেল হঠাৎ। মেয়েদের মুখের দিকে সে তাকিয়ে দেখল, ফারফ্রীর প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি। নতুন একটা নাচের আয়োজন হতেই ডোনাল্ড পোশাক বদলাতে গেল। অম্নি মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কে তার সঙ্গে নাচবে।

সারা শহর ভেঙ্গে পড়েছিল ফারফ্রীর আসরে। এমন একটা খোলা হলঘরের কথা কারও মাথায় আসেনি এ'র আগে। এলিজাবেথ আর তার মা'ও কখন এসে দাঁড়িয়েছিল ভিড়ের মধ্যে। এলিজাবেথের চোখে চিন্তিত কিন্তু আগ্রহী দৃষ্টি। কেমন যেন একটা আশার হাতছানি সে মুখে। হেনচার্ড একবার ভাবল চলে যাবে। আবার ভাবল ওদেরকে সাথে করে নিয়ে যাওয়াই ভাল। আলো থেকে অন্ধকারে সরে দাঁড়াল সে। কিন্তু তাতে তার তিক্ততা গেল আরও বেড়ে।

মিঃ হেনচার্ডের লম্ফঝম্প এ'র তুলনায় কিছুই না। একটা লোক বলছিল—কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কখনও কেউ, আজকের দিনে ঐ ফাঁকা মাঠে লোককে যেতে বলে।

অপরজন উত্তর দিল, মেয়রের শুধু যে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব তাই নয়—এই ছোকরা না থাকলে ওঁর ব্যবসা লাটে উঠত না? হেনচার্ডের কপাল ভাল তাই জুটে গেছে। আগে কোন হিসেবপত্তরের বালাই ছিল নাকি? খড়ির দাগ দিয়ে দিয়ে বস্তা গুণত, দেখেছি তো। আর ফারফ্রী এসে ভোল পাল্টে ফেলেছে একদম। তাছাড়া গমের স্বাদ! আগে তো ইঁদুরের নাদি ছাড়া রুটিতে কামড়ই দেওয়া যেত না। ফারফ্রী আসার পর থেকে দেখো—একখানা রুটিও খেয়েছ অমন? ছেলেটার যোগ্যতা আছে। হেনচার্ড ওকে ছাড়া চলতে পারবে না। ভদ্রলোক তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল।

কিন্তু ও'ও বেশীদিন এ'কাজ করবে না—জেনে রাখ। অপরজন বলল।

না, তা করতে হবে না। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলল হেনচার্ড।

নাচের আসরে ফিরে গিয়ে সে দেখল, ফারফ্রী এলিজাবেথের সঙ্গে নাচছে। একটাই নাচ জানা ছিল এলিজাবেথের! একটা গ্রাম্য নাচ। তা'ও ঠিকমত পা

মিলছিল না। ফারফ্রী মানিয়ে নিচ্ছিল কোনরকমে।

একটু পরেই নাচ শেষ হয়ে গেল। এলিজাবেথ হেনচার্ডের দিকে তাকাল সম্মতি প্রার্থনা করে—কিন্তু সম্মতি মিলল না। সে যেন দেখতেই পেল না তাকে। তারপর হেনচার্ড ফারফ্রীকে ডেকে অন্যমনস্কভাবে বলল—শোনো ফারফ্রী! কালকে পোর্ট ব্রেডির বড় হাটে আমিই যাব। তোমাকে আর যেতে হবে না। আজকের এত পরিশ্রমের পর তুমি না হয় পা দুটোকে বিশ্রাম দিও। হাসি দিয়ে শুরু করে সে ফারফ্রীর মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দিল।

এমন সময় বৃদ্ধ আরও কিছু লোক এগিয়ে এলে, ডোনাল্ড একদিকে সরে গেল। তাদের মধ্যে একজন ছিল অল্ডারম্যান, নাম তার টাবার। মেয়রের গায়ে বুড়ো আঙুলের খোঁচা দিয়ে সে বলল—কি গো, হেনচার্ড! তোমাকে টেক্কা দিয়ে দিলে, এঁ্যা? গুরুর চেয়ে চেলা দড়, এঁ্যা? তোমাকে একদম মাটিতে ফেলে দিয়েছে—কি বল?

দেখুন, মিঃ হেনচার্ড! একজন উকিল-বন্ধু বলল—আপনার মারাত্মক ভুলটা হ'ল, ঐ অতদূরে মাঠের মধ্যে করতে যাওয়াটা। আপনার এটুকু বোঝা উচিত ছিল—ঢাকা জায়গা না হ'লে খেলাধূলা কখনও সম্ভব? আপনি সেটা ভাবেননি—আর ও' ভেবেছে—এই তফাৎ। আর এ'জন্যেই মার খেলেন আপনি।

ও! ও দেখবে শিগগিরই ছাড়িয়ে যাবে সবাইকে। আর হিড়হিড় করে টান দেবে তোমাদেরও। হাসতে হাসতে বললেন মিঃ টাবার।

না। হেনচার্ড গোমড়ামুখে বলল—সেটা পারবে না—কারণ ও শিগগিরই আমার কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে ডোনাল্ড একটু কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে হেনচার্ড বলল—মিঃ ফারফ্রী! তুমি তো আমার ম্যানেজার হিসেবে আর বেশীদিন থাকছ না, না?

হেনচার্ডের মুখের রেখাগুলো হয়তো লেখা হয়ে ফুটে উঠেছিল। ফারফ্রী অর্থটা ঠিক ধরতে পারল। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সে। অন্যরা যখন খুব দুঃখ করতে লাগল আর জিজ্ঞাসা করল কেন, ফারফ্রী সহজভাবে উত্তর দিল—তার সাহায্য মিঃ হেনচার্ডের আর প্রয়োজন নেই।

হেনচার্ড আপাততঃ খুশী হয়ে বাড়ী গেল। কিন্তু সকাল হলে তার মনের গ্লানি যখন কেটে গেছে, গতদিনকার কথায় এবং আচরণে, লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল সে। আরও খারাপ লাগল এই ভেবে যে, এবারে ফারফ্রী আর হাল্কাভাবে নেয় নি তাকে। পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিয়েই বিষয়টা গ্রহণ করেছে।

॥ সতের ॥

হেনচার্ডের হাবভাবে এলিজাবেথ বুঝতে পেরেছিল যে, নাচতে গিয়ে সে এক মহাভুল করে ফেলেছে। সরল বুদ্ধিতে তার কুলোয় নি যে, এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়। একজন স্বল্পপরিচিতা তাকে বুঝতে সাহায্য করল। মেয়রের মেয়ে হিসেবে এত পাঁচমিশেলী লোকের সামনে, নাচতে রাজী হওয়াটা তার পক্ষে শোভনীয় হয় নি। লজ্জায় কান আর চিবুক রাঙা হয়ে গেল তার। মনে মনে ক্ষোভ হ'ল নিজের প্রতি—তার রুচি এখনও অপরিণত—নিজেকে সে কোন অপমান আর অপযশে হয়তো জড়িয়ে ফেলবে।

ভীষণ খারাপ লাগছিল। চারদিকে তাকিয়ে সে মাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু মিসেস হেনচার্ডের এইসব বুদ্ধিশুদ্ধি আরও কম ছিল। মেয়েকে যখন খুশী ফেরার স্বাধীনতা দিয়ে, সে আগেই চলে গিয়েছিল। গাছের ছায়ায় ঘন অন্ধকার পথে পা বাড়াল এলিজাবেথ বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্যে। চিন্তায় চিন্তায় তখন তার মন ক্ষতবিক্ষত।

একটু পরেই এক ভদ্রলোককে আসতে দেখা গেল এদিকে। তাঁবুর আলোয় মুখটা দেখা যাচ্ছিল। এলিজাবেথ চিনতে পারল—ফারফ্রী। হেনচার্ডের সঙ্গে সবে কর্মচ্যুতির আলাপ সেরে সে আসছে।

ও আপনি, মিস নিউসন! আমি অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি আপনাকে। বলল ফারফ্রী। মনিবের কথাবার্তা শুনে সে যতটা হতচকিত হয়েছিল, এখন সেটা অনেক কাটিয়ে উঠেছে। আপনার সঙ্গে রাস্তার মোড় পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে যেতে পারি?

এলিজাবেথ ভাবল—কাজটা বোধহয় ঠিক হবে না। কিন্তু প্রতিবাদও করতে পারল না। হাঁটতে হাঁটতে তারা এগিয়ে এল অনেকটা। অবশেষে ফারফ্রী বলল—আমি হয়তো শিগগিরই আপনাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

আমতা আমতা করে বলল এলিজাবেথ—কেন?

না, এম্নি ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে, অন্য কিছু নয়। হয়তো এতে ভালই হবে। আপনার সঙ্গে আর একদিন নাচতে পারলে খুব খুশী হতাম।

এলিজাবেথ বলল, সে নাচতে পারে না—ভালমত জানেই না।

না, না, আপনি পারেন। নাচে পা মেলানটাই বড় কথা নয়, আসলে অনুভূতি না থাকলে ভাল নাচ হয় না।....আমি হয়তো এ'জন্যে আপনার বাবার অসন্তোষের কারণ

হয়েছি। যাক্‌গে, এ'র পরে অনেকদূরে, হয়তো অন্যদেশেই চলে যেতে হবে আমাকে।

শুনে এলিজাবেথের মনটা এত খারাপ হয়ে গেল—একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। তা'ও আস্তে আস্তে, ভেঙে ভেঙে, যাতে ফারফ্রী না শুনতে পায়। অন্ধকারে মানুষ ছলনা ভুলে যায়। স্কচম্যান আবেগের বশে বলে যেতে লাগল—হয়তো সে শুনেও ফেলেছিল দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ—আমার যদি পয়সাকড়ি থাকত, মিস নিউসন! আর আপনার বাবা যদি অসন্তুষ্ট না হতেন, আমি হয়তো শিগগিরই একদিন আপনাকে একটা কথা বলতাম—হয়তো আজ রাত্রেই বলতে পারতাম—কিন্তু সে হবার নয়।

কি কথা যে সে বলত, তা ভাঙল না, আর এলিজাবেথও শোনার আগ্রহ না দেখিয়ে বোকার মত চুপচাপ থাকল। এইভাবে পরস্পরকে ভয় করতে করতেই তারা অনেকদূর হেঁটে এল। রাস্তায় আলো এসে পড়ছিল। তাতেই সাবধান হয়ে থেমে গেল তারা।

আমি এখনও বুঝতে পারলাম না, কে আমাদের সেদিন ডার্ণওভারে পাঠিয়েছিল ওভাবে—ডোনাল্ড তার ছন্দিত স্বরে বলল—আপনি কি জেনেছেন, মিস নিউসন!

উঁ হুঁ—উত্তর দিল সে।

কেনই বা করল এ'রকম?

হয়তো স্রেফ মজা করার জন্য।

হয়তো তা নয়। এমনও হতে পারে যে ভেবেছিল, আমরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব ওখানে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলব। যাক, —আমি চলে গেলেও বোধহয়, আপনারা অর্থাৎ ক্যাস্টারব্রিজের লোকেরা আমাকে মনে রাখবেন?

কেউ ভুলতে পারবে না, আমি নিশ্চিত। এলিজাবেথ খুব মরমের সঙ্গে বলল। আপনি না চলে গেলেই ভাল হয়!

রাস্তার আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল!—আচ্ছা, তাহলে চিন্তা করব—বলল ডোনাল্ড ফারফ্রী—এখন আর যাব না আপনার সঙ্গে। আপনার বাবা হয়তো আরও রেগে যাবেন তাহলে।

তারা পরস্পর পৃথক হয়ে গেল। এলিজাবেথ এগিয়ে গেল আর ফারফ্রী উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। কি করছিল অত না বুঝেই, এলিজাবেথ প্রায় দৌড়ে পৌছে গেল তাদের বাড়ীর দরজায়।—হায় ভগবান! কোন দিকে চলেছি—মনে মনে ভাবল সে—আর খুব জোরে শ্বাস নিল।

ফারফ্রী যে কি কথা বলতে চেয়েছিল, তা নিয়ে অনেক ভাবল সে শুয়ে শুয়ে। এলিজাবেথের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল। ইদানীং বাবার আচার আচরণ এবং লোকের মুখে কথা শুনে শুনে সে আগেই বুঝেছিল যে, ম্যানেজার হিসেবে এখানে

ফারফ্রীর দিন ফুরিয়ে আসছে। তাই এ' সংবাদে সে বিশেষ আশ্চর্য্য হয় নি। কিন্তু তার চাকরী চলে গেলেও কি আর সে থাকবে না এখানে? তাহলে হয়তো একদিন না একদিন সেই না-বলা কথাটি কি, জানা যাবে।

পরের দিন খুব হু হু করে বাতাস বইছিল। অফিসঘর থেকে ডোনাল্ড ফারফ্রীর লেখা একটা চিঠি উড়ে এসে পড়েছিল বাগানে। এলিজাবেথ বেড়াতে বেড়াতে সেটা কুড়িয়ে পেল। ঘরে নিয়ে এল সে চিঠিটা, হাতের লেখা নকল করতে লাগল। ডোনাল্ডের হাতের লেখা খুব ভাল লাগত তার। চিঠিটা শুরু হয়েছিল 'ডিয়ার স্যার' দিয়ে। একটা সাদা কাগজে এলিজাবেথ নিজের নাম লিখে 'স্যার' কথাটির উপর বসাল। এখন হল 'ডিয়ার এলিজাবেথ'। লেখাটা দেখে তার সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। লজ্জায় লাল হয়ে গেল মুখ, যদিও সে কি করছে না করছে আর কেউ দেখছিল না। তাড়াতাড়ি সে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল আর আপন মনে হাসছিল ঠিক আনন্দে নয়,বরং বেদনায়।

ক্যাস্টারব্রিজে এটা খুব শিগগিরই চাউর হয়ে গেল যে, ফারফ্রী আর হেনচার্ড নিজেদের সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছে। এলিজাবেথের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল খুব, সত্যিসত্যি ফারফ্রী চলে যায় কিনা ভেবে। অবশেষে সে জানতে পারল, ফারফ্রী একেবারে চলে যাচ্ছে না। ছোটখাট একজন আড়ৎদারের ব্যবসা সে কিনে নিয়েছে—এখানেই থেকে যাবে। এখন থেকে নিজেই সে ব্যবসা করবে। তা'বলে তার কথা শুনেই কি ডোনাল্ড এত বড় একটা ঝুঁকি নিল? মিঃ হেনচার্ডের রমরমা ব্যবসার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় সে? নিশ্চয়ই নয়। সেদিন হয়তো এম্নিই তাকে অমন আশ্বাস দিয়েছিল। যখনই সে দেখত তার মনটা পড়ে আছে ফারফ্রীর কাছে তখনই নিজেকে সাবধান করত—না, না, ওসব দিবাস্বপ্ন তোমার জন্যে নয়। অনেক চেষ্টা করত যাতে ফারফ্রীর সঙ্গে দেখা না হয়, তার চিন্তা মনে না আসে। প্রথমটায় সফল হলেও, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে সাফল্য অত সহজ ছিল না।

ফারফ্রী তার মেজাজ সহ্য করতে রাজী নয় দেখে, হেনচার্ড যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছিল। আরও ক্ষেপে গেল সে, যখন শুনল, ফারফ্রী নিজেই ব্যবসা করতে নামছে। একদিন টাউন-হলের মিটিংএ, এসব বিবরণ তার কানে এল। রাগে ফেটে পড়ল সে—তার কথা হয়তো সমস্ত শহরে গমগম করে প্রতিধ্বনিত হ'ত। এ সেই রাগ, যে রাগের বশে সে একদিন বৌ এবং মেয়েকে বিক্রী করে দিতে দ্বিধা করে নি। এত দিনকার আত্মসংযম তার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

সে আমার বন্ধু, আমিও তার বন্ধু। কিন্তু এই কি বন্ধুর আচরণ? আমি

ছাড়া আর বন্ধু কে আছে তার? যখন প্রথম এখানে এসেছিল, জুতোর ফিতে ছিল না। আমিই তাকে খাওয়া-পরা জুগিয়েছি। টাকা! শুধু টাকা কেন, যা চেয়েছে তাই—আমি কোনদিন শর্ত আরোপ করি নি—রুটির পোড়া আগাটা পর্য্যন্ত ভাগ করে খেয়েছি একদিন। আর আজ সে আমাকে দূরছাই করে! ঠিক আছে ব্যবসা করতে হয় করো—আমিও ব্যবসা করেই যাব—কিন্তু ছল-চাতুরী কোর না। আমিও দেখিয়ে দেব—ব্যবসার আমি কতটুকু বুঝি না বুঝি।

হেনচার্ডের কাউন্সিলর বন্ধুরা বিশেষ কোন কথাবার্তা বলল না। তার জনপ্রিয়তা এখন কমে গিয়েছিল অনেক। দু'বছর আগের তুলনায় প্রায় কিছুই নেই। হল থেকে বেরিয়ে, একা একা হাঁটতে লাগল সে।

বাড়ীতে এসে আর একটা কথা মনে পড়ল। এলিজাবেথকে ডেকে পাঠাল সে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকল এলিজাবেথ।

না, অন্যায় কর নি কিছু। মেয়েকে ঐভাবে দেখে বলল হেনচার্ড—তোমাকে শুধু একটু সতর্ক করে দিই—ঐ ফারফ্রী সম্পর্কে। তোমার সঙ্গে দু'তিনবার কথা বলতেও দেখেছি ওকে। তাছাড়া সেদিন একসঙ্গে নাচলে তোমরা, ও তো তোমাকে পৌঁছেও দিয়েছিল বোধহয়। না, তোমাকে কোন দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু শুনে রাখ—তুমি কি ওকে কোন কথা দিয়েছ? হাসি-ঠাট্টা ছাড়া অন্য কিছু?

না, আমি তো কোন কথা দিই নি।

বেশ। সব ভাল যার শেষ ভাল। আমার ইচ্ছা, তুমি আর ও'র সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কোর না।

ঠিক আছে।

কথা দিচ্ছ তো?

সে একটু ইতস্ততঃ করছিল, তারপর বলল—হাঁ, আপনি বলছেন যখন—

হাঁ, আমি বলছি, ও আমাদের পরিবারের শত্রু।

এলিজাবেথ চলে গেলে, হেনচার্ড বসে বসে একটা চিঠি লিখল—ফারফ্রীকে—

মহাশয়,

আমার অনুরোধ, এরপর থেকে আপনি আমার মেয়ে এলিজাবেথের সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ করবেন না। সে তার তরফ থেকে কথা দিয়েছে, আপনার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আশা করি, আপনি এ ব্যাপারে আর তাকে বিব্রত করবেন না।

ইতি—

এম, হেনচার্ড।

যে কোনও সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন লোকে হয়তো পরামর্শ দিত, এমন কি

উৎসাহও দিত, যে ফারফ্রীকে জামাই হিসাবে বরণ করে নেওয়া উচিৎ। কিন্তু একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে এত সহজে জয় করে নেওয়ার বুদ্ধি হেনচার্ডের গোঁয়ার মস্তিষ্কে খেলে নি। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের বৈষয়িক বুদ্ধি তার কোনদিনই ছিল না। মানুষকে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে তার বুদ্ধি ছিল ঠিক মহিষের মতো। তার স্ত্রীও অনেক কারণে এমন একটা যুক্তি দিতে ভরসা পায় নি। যদিও এমনটি হলে 'সে'ই খুশী হত সবথেকে বেশী।

ইতিমধ্যে ডোনাল্ড ফারফ্রী নিজের ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিল। ডার্ণওভার হিলের উপর তার দোকান। ইচ্ছে করেই অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিল সে, যাতে পুরনো বন্ধু ও মনিবের খরিদ্দাররা তার কাছে না চলে আসে। ফারফ্রী মনে করত এখানে আড়ৎদারীর ব্যবসা করার সুযোগ আছে অনেক। শহরটা ছোট হলেও, এই ব্যবসার সম্ভাবনাটা এখানে অনেক বেশী। সেই অতিরিক্ত সম্ভাবনাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিল ফারফ্রী।

মেয়রের সঙ্গে যাতে শত্রুতার সৃষ্টি না হয়, সেজন্যে প্রথম খরিদ্দারকেও ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি সে। এই খরিদ্দারটি ছিল একজন বড় চাষী যে গত তিনমাস ধরে হেনচার্ডের সঙ্গে বেচাকেনা করছিল।

উনি একসময়ে আমার বন্ধু ছিলেন—ফারফ্রী বলল। কাজেই তাঁর ব্যবসা ভাঙ্গিয়ে নেওয়া আমার উচিত হবে না। আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার একজন উপকারী বন্ধুর ক্ষতি হোক, এ'ও আমি চাই না।

এইরকম সৎপথে থেকেও ফারফ্রীর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল। ওয়েসেক্সের অলস ভদ্রলোকদের সমাজে তার বুদ্ধিবিবেচনা এবং অধ্যবসায়ের কোনও জুড়ি ছিল না।

এলিজাবেথের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ার অনুরোধটি যথাসময়েই ফারফ্রীর কাছে পৌঁছুল। ফারফ্রী এসব নিয়ে বিশেষ চিন্তা করত না, কাজেই তাকে এ ধরণের অনুরোধ করা নেহাৎই অবান্তর। তবুও মেয়েটার প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল, তাই অনেক ভেবেচিন্তে ফারফ্রী ঠিক করল, সবরকম রোমিও-গিরি সে ছেড়ে দেবে—অন্ততঃ বেচারী এলিজাবেথের মুখ চেয়ে। এভাবেই হয়তো একটা অপরিণত প্রেমের ফুল ঝরে গেল।

যতই সে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুক না কেন, একটা সময় এল, যখন আত্মরক্ষার খাতিরেই ফারফ্রীকে হেনচার্ডের মুখোমুখি হতে হ'ল। শুধু এড়িয়ে গিয়েই সে নিজেকে রক্ষা করতে পারছিল না। ব্যাপারটা বাধল দর দেওয়া নিয়ে। দরদামের এ লড়াই অন্যেরা দূর থেকে বেশ উপভোগ করতো প্রায়ই। দক্ষিণের গোঁয়ার্তুমির বিরুদ্ধে উত্তরের অন্তর্দৃষ্টির জয় হতে লাগল। প্রত্যেক শনিবারে হাটে তাদের দেখা হ'ত মুখোমুখি—একদল চাষীর সামনে।

ডোনাল্ড হয়তো হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করতে চাইত। কিন্তু হেনচার্ড এমনভাবে তাকাত তার দিকে যেন সে তার পাকাধানে মই দিয়েছে—বা ঠকিয়ে পালিয়ে এসেছে। বড় বড় চাষী, আড়ৎদার, মিলওয়ালা আর নীলামদারের নিজস্ব ঘর এবং গদি ছিল হাটের মধ্যে। প্রত্যেকের নাম লেখা—যেমন 'এভার্ডিন, 'হেনচার্ড', 'শিনার' 'ডার্টন' ইত্যাদি। তার সঙ্গে নতুন একটি নাম 'ফারফ্রী' ও জ্বলজ্বল করতে লাগল। হেনচার্ডের গায়ে যেন হুল ফুটিয়ে দিল কেউ—ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরে গেল সে।

সেই দিন থেকে হেনচার্ডের বাড়ীতে ডোনাল্ড ফারফ্রী'র নাম আর উচ্চারিত হ'ত না। কোনদিন খাওয়ার টেবিলে বসে, এলিজাবেথের মা যদি হঠাৎ তার প্রসঙ্গে বলে ফেলত, এলিজাবেথ প্রখরদৃষ্টিতে ইঙ্গিত করত চুপ করতে। আর তার স্বামী বলত—তোমরাও আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ?

॥ আঠার ॥

কিছুদিন যাবৎই এলিজাবেথের মনে এক দুর্ভাবনা জেঁকে বসেছিল। তার মা অসুখে পড়েছে। এতই অসুস্থ যে ঘর ছেড়ে বেরুতে পারে না। খুব একটা বিরক্ত হয়ে না থাকলে, হেনচার্ড স্ত্রীর শরীরস্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিত। শহরের সব থেকে প্রতিপত্তিশালী এবং ব্যস্ত ডাক্তারকে সে মনে করত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। তাঁকেই ডেকে দেখান হল। রাত্রে শোয়ার পরেও, সারা রাত একটা বাতি জ্বালা থাকত সুসানের ঘরে। দু এক দিনের মধ্যে সে একটু সামলে নিল।

রাত-জাগার অনিয়মে এলিজাবেথ একদিন সকালবেলা খাওয়ার টেবিলে হাজির হতে পারল না, হেনচার্ড একা একা বসে খাচ্ছিল। হঠাৎ সে 'জার্সি' থেকে তার নামে একটা চিঠি এসেছে দেখে প্রায় আঁৎকে উঠল। হাতের লেখাটি খুবই পরিচিত কিন্তু আবার কোনদিন চোখে পড়বে বলে সে ভাবে নি। চিঠিটা হাতে নিয়ে ছবি দেখার মত দেখতে লাগল সে। পুরনো কত কথা মনে পড়ে গেল। তারপর নিতান্ত অনাগ্রহভরে চিঠিটা খুলে ফেলল।

লেখিকা লিখেছেন, হেনচার্ডের পুনর্বিবাহের পরে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা একেবারেই অসম্ভব, একথা তিনি বুঝেছেন। এবং তিনি স্বীকার করেন যে এই পুনর্মিলনই হেনচার্ডের পক্ষে একমাত্র সরল সমাধান।

তাই অনেক ভেবে চিন্তে, আমার শতদুঃখ সত্ত্বেও, তোমাকে আমি দোষী করি

না। কি কুক্ষণে যে আমাদের দেখা হয়েছিল! বেশী ঘনিষ্ঠতার মধ্যে ঝুঁকি আছে সেকথা তুমি খুলেই বলেছিলে কিন্তু এই পনের-ষোল বছর পরে কে তা ভাবতে পেরেছিল? সবটাই আমি দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছি, তোমার কোন দোষ নেই।

মাইকেল! চিঠির পর চিঠিতে তোমাকে যে আঘাত দিয়েছি, সেগুলো তুমি ভুলে যেও। তখন তোমাকে ভীষণ নিষ্ঠুর ভাবতাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারি তোমার তখনকার অবস্থা কি ছিল। তোমাকে দোষারোপ করা কত অন্যায় হয়েছে।

আশা করি আমার ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করে, তুমি এ'টুকু বুঝবে যে আমাদের এই প্রাক্তন সম্পর্কের কথা, তৃতীয় কেউ জানলে, আমার কত ক্ষতি হবে। তুমি অবশ্যি কাউকে বলবে না বা লিখবে না জানি। তা সত্ত্বেও, তোমাকে একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দিই—আমার কোন লেখা বা টুকিটাকি জিনিসপত্র যদি তোমার কাছে থেকে থাক, ভুলেও বা অবহেলা করেও, সেগুলো আর তোমার কাছে রেখ না। সেইজন্যে, আমার অনুরোধ, যা কিছু তোমার কাছে আছে, বিশেষতঃ চিঠিপত্রগুলো আমাকে ফেরৎ দিয়ে দিও।

আমার হৃদয়ের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে তুমি যে বিরাট অঙ্কের চেক পাঠিয়ে দিয়েছ সেজন্যে ধন্যবাদ।

এখন আমি ব্রিষ্টলে যাচ্ছি, এক আত্মীয়ার বাড়িতে। ফেরার পথে ক্যাস্টারব্রিজ এবং বাডমাউথ হয়ে ফিরব। তুমি কি চিঠিপত্রগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা করতে পারবে? বুধবার দিন সন্ধ্যেবেলা, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ, অ্যান্টিলোপ হোটেলের সামনে আমি গাড়ী বদল করব। লাল রংয়ের একটা শাল গায়ে থাকবে আমার। খুঁজে পেতে তোমার একটুও অসুবিধা হবে না। এমনি পাঠিয়ে দেওয়ার থেকে চিঠিগুলো আমার হাতে দিয়ে দেওয়াই ভাল। ইতি তোমার চিরদিনের—

লুসেটা।

হেনচার্ড লম্বা করে শ্বাস নিল। বেচারী! কেন যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার মাথার দিব্যি, যদি কোনদিন আমাদের বিয়ে হওয়া সম্ভব হয়, তো নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বিয়ে করব।

মনে মনে তখন সে নিশ্চয়ই মিসেস হেনচার্ডের অসুখ এবং সম্ভাব্য পরলোক-প্রাপ্তির কথা চিন্তা করছিল।

লুসেটার চিঠিপত্রগুলো সে একটা বাণ্ডিল করে বেঁধে রাখল নির্ধারিত দিনে তাকে পৌঁছে দেবে বলে। হাতে হাতে দেওয়ার চিন্তাটা মনে হ'ল পুরনো কথাবার্তা বলার একটা ছুতো। তাই দেখা না করাটাই পছন্দ ছিল তার বেশী—তবুও এটুকু করলে যদি সে বাধিত হয়, তাই সন্ধ্যে নাগাদ সে দাঁড়িয়ে থাকল, গাড়ী বদল

করার জায়গায়।

সেদিন খুব কনকনে ঠাণ্ডা। গাড়ীও দেরী করে এল। রাস্তা পার হয়ে হেনচার্ড কাছে গেল, কিন্তু ভিতরে বা বাইরে কোথাও লুসেটাকে দেখা গেল না। সে ভাবল, কোন কারণে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে—অতএব দেখা হওয়ার আশা নেই। বাড়ী ফিরে গেল সে—কিন্তু মনের অস্বস্তি গেল না।

এদিকে মিসেস হেনচার্ড দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিল খুব। বাড়ীর বাইরে আর বেরোতেই পারত না একদম। একদিন কি সব চিন্তা করে খুব বিব্রত মনে হল তাকে। বলল—সে কিছু লিখতে চায়। বিছানার উপরেই একটা জলচৌকি, কাগজ আর কলম দেওয়া হলে, সে অন্যদের ঘর থেকে চলে যেতে বলল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কি লিখে, কাগজটা ভাঁজ করল সে, তারপর এলিজাবেথকে ডেকে বলল একটু মোম নিয়ে আসতে। তারপরে এলিজাবেথের সাহায্য ছাড়াই—কাগজটা সীলমোহর করে, নাম ঠিকানা লিখে, তার দেরাজে তালা বন্ধ করে রাখল। নামঠিকানার জায়গায় সে লিখেছিল—"মিঃ মাইকেল হেনচার্ড। এলিজাবেথের বিয়ের আগে যেন এটি খোলা না হয়"।

রাতের পর রাত এলিজাবেথ যতক্ষণ তার শরীরে কুলোয়, মায়ের পাশে জেগে বসে থাকত। বিশ্বজগৎকে ভালভাবে চিনতে হলে হয়তো এই 'জেগে বসে' থাকাই একমাত্র পথ। রাস্তা দিয়ে শেষ ডাক-গাড়ী চলে যাওয়ার পরে, ভোরবেলা চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শুরু হওয়ার মধ্যে, শব্দ বলতে এলিজাবেথের কানে আসত কেবলমাত্র দুই ঘড়ির ছন্দোবদ্ধ এগিয়ে যাওয়ার সরব ঘোষণা। ঘরের ভেতরে টাইমপিসটা টিক টিক করে; সিঁড়ির উপর বড় ঘড়িটার টক্ টক্ আওয়াজের উত্তর দিত অনবরত। এই দীর্ঘ সময় কেটে যেত এলিজাবেথের তীক্ষ্ণ অনুভূতির আত্ম-অনুসন্ধানে—কেন তার জন্ম হয়েছিল? কেন তার এই বাতির দিকে তাকিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকা? কেনই বা তার জীবনের ঘটনাগুলো এ'রকম না হয়ে ও'রকম হ'ল না? আশপাশের জিনিষগুলো যেন তার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে, কোনও যাদুদণ্ডের আঘাতে, সে তাদের পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে দেবে—এই প্রতীক্ষায়। এই সব ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো জুড়ে আসছিল। অনেকটা জেগে জেগেই ঘুমিয়ে পড়ল সে!

মায়ের কথায় ঘুম ভেঙে গেল। কোনরকম ভূমিকা না করেই, যেন আগের কোনও চিন্তার খেই ধরে মিসেস হেনচার্ড প্রশ্ন করল—তোর মনে পড়ে, তুই আর মিঃ ফারফ্রী একটা করে চিঠি পেয়েছিলি ডার্ণওভার হিলের ওপর একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তোরা ভেবেছিলি কেউ তোদের বোকা বানিয়েছে?

হ্যাঁ।

বোকা বানানো নয়। তোদের পরস্পরের দেখা করবার জন্যে,—আমিই পাঠিয়েছিলাম ও'টা।

কেন? এলিজাবেথ একটু চমকে উঠে বলল।

আমি—চেয়েছিলাম তোর বিয়ে হোক মিঃ ফারফ্রীর সাথে।

সত্যি! বলে এলিজাবেথ মাথা নীচু করল, কিন্তু ও'র মা কিছু বলছে না দেখে আবার বলল—কেন, মাগো?

কারণ একটা আছে—একদিন জানাজানি হবেই। বিয়েটা—আমি থাকতে থাকতে হয়ে গেলে স্বস্তি পেতাম। কি আর করা যাবে!—সব তো নিজের ইচ্ছায় চলে না। কিন্তু হেনচার্ড ওকে পছন্দ করে না।

ওঁদের বিবাদ বোধহয় মিটে যাবে আবার। মেয়েটি ধীরগলায় বলল।

কেউ কি তা বলতে পারে—বলে ও'র মা চুপ করে গেল। আর কোনও কথা বলল না।

এর কিছুদিন পর, এক রবিবারের সকালবেলায়, ফারফ্রী হেনচার্ডের বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখে, জানালার খড়খড়িগুলো সব বন্ধ। একটু দাঁড়িয়ে, খবর নিতে জানা গেল—মিসেস হেনচার্ড মারা গেছেন—এই একটু আগে।

॥ উনিশ ॥

মিসেস হেনচার্ড গত হওয়ার প্রায় সপ্তাহ তিনেক পরে, একদিন হেনচার্ড আর এলিজাবেথ ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে কথাবার্তা বলছিল। আঁচের ওপরে নাচছে আগুনের অশান্ত লাল শিখা। সেদিন আর বাতি ধরানো হয় নি। আঁচের আলোতেই ঘরের সবকিছু চোখে পড়ছিল বেশ। বিশাল আয়না, তার বাহারী ফ্রেম, এটা ওটা জিনিসের হাতল, পেতলের তৈরী গোলাপের আকৃতি ছিপি—সবকিছুর ওপরে আলো ঠিকরে পড়ছে।

এলিজাবেথ! তুমি কি খুব পুরনো কথা চিন্তা কর?—প্রশ্ন করল হেনচার্ড।

হুঁ, মাঝেমাঝে করি।

কার কথা বেশী মনে পড়ে?

মা আর বাবার কথা।

এলিজাবেথ কখনও রিচার্ড নিউসনকে 'বাবা' বলে উল্লেখ করলে' হেনচার্ডের বুকে বেদনা বাজত খুব। বহুকষ্টে সে তা গোপন করত।—ও! আমার কথা বুঝি একদম মনে হয় না? বলল সে। আচ্ছা, নিউসন তোমাকে ভালবাসত তো?

হুঁ, খুব ভালবাসতেন।

হেনচার্ডের মুখে ফুটে উঠছিল এক দৃঢ় নিঃসঙ্গতা। আস্তে আস্তে সেটা কোমল হয়ে এল। সে জিজ্ঞাসা করল, মনে কর, আমি যদি তোমার সত্যিকারের বাবা হতাম? তুমি আমাকে রিচার্ড নিউসনের মত ভালবাসতে?

সে কি করে বলি! এলিজাবেথ তখুনি উত্তর দিল, আমার বাবা ছাড়া অন্য কাউকে আমি বাবা ভাবতে পারি?

হেনচার্ডকে স্ত্রীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল মৃত্যু, নির্ভরযোগ্য বন্ধুকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল ভুলবোঝাবুঝি আর এলিজাবেথকে তফাৎ করে রেখেছিল সত্য সম্পর্কে তার অজ্ঞতা। মনে মনে ভেবে দেখল হেনচার্ড, এদের মধ্যে একজনকেই সে কাছে পেতে পারে। সে হ'ল এই শেষের জন। অন্তরে এক প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়ে গেল তার। মেয়ের কাছে সে সব কাহিনী খুলে বলবে, নাকি যেমন চলছে চলতে থাকবে? স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না হেনচার্ড, কয়েকবার পায়চারী করল তারপর মেয়ের চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল। নিজের আবেগকে সে আর রুখতে পারছিল না, জিজ্ঞাসা করল—তোমার মার থেকে তুমি কি কি শুনেছ আমার সম্পর্কে?

আপনি তাঁর শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে আত্মীয়।

আরও কিছু বলা উচিত ছিল তার। তাহলে আজ আমার ভারটা অনেক হাল্কা হ'ত।........এলিজাবেথ! আমিই তোমার বাবা। রিচার্ড নিউসন নয়। যতদিন তোমার মা বেঁচেছিল, লজ্জায় সে তোমাকে বলতে পারে নি এ'কথা।

এলিজাবেথের কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। হেনচার্ড বলে চলল—তুমি আমাকে অগ্রাহ্য কর, ভয় কর, সব আমি সইতে পারব, কিন্তু তুমি না জানার অন্ধকারে থাক—এ আমি চাই না।—তোমার মায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল খুবই অল্প বয়সে। আবার সেদিন আমাদের দ্বিতীয়বার বিয়ে হ'ল। মাঝখানে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াতে আমরা দুজনেই দুজনকে মৃত ভেবেছিলাম।—অতি সরল ছিল তোমার মা, তাই সে রিচার্ড নিউসনকে বিয়ে করেছিল।

পরিপূর্ণ সত্যিকথা না হলেও, হেনচার্ড এ'র বেশী কিছু বলতে পারল না। ব্যক্তিগতভাবে তার গোপন করার কিছু ছিল না। কিন্তু মেয়ে এখন বিবাহযোগ্যা—সুপাত্রে তাকে অর্পণ করতে হবে—অতএব তার মনে আরও আত্মগ্লানি ঢুকিয়ে

দেওয়া ঠিক নয়—এটাই ভাবল সে।

খোলাখুলি আরও অনেক কথা যখন সে বলল, এলিজাবেথের ছোটবেলার জীবনের সঙ্গে অনেক কিছু মিলে যেতে লাগল। বিশ্বাস হ'ল—এসব কথা সত্যি। উত্তেজনায় অধীর হয়ে টেবিলে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল সে।

কেঁদো না, কেঁদো না। বলল হেনচার্ড। গলায় তার জমাটবাঁধা দুঃখ। আমি তাহলে সহ্য করতে পারব না। এতে তো তোমার কাঁদবার কিছু নেই—আমিই তো তোমার বাবা। আমাকে দেখলে তোমার ভয় করে? ঘেন্না করে?—এলিজাবেথ! আমাকে অন্যরকম ভেব না। হেনচার্ড মেয়ের ভিজে হাতদুখানা ধরে প্রায় কান্নাজড়িত স্বরে বলল—আমি একসময় খুব মদ খেতাম, তোমার মার সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করেছি। কিন্তু তোমাকে নিউসনের থেকে অনেক বেশী ভালবাসব আমি। শুধু আমাকে তোমার বাবা বলে মেনে নিও, তোমার জন্যে আমি সব কিছু করব।

এলিজাবেথ একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। এসব কথা সে বিশ্বাস করেছে, সেটাই বোঝাবার চেষ্টা করছিল—কিন্তু দাঁড়াতে পারল না। হেনচার্ডের সামনে কেমন একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ত সে।

তোমাকে এখুনি সব বিশ্বাস করে নিতে বলছি না। হেনচার্ড প্রচণ্ড ঝড়ে দোল খাওয়া বটগাছের মত কেঁপে উঠল—এক্ষুণি নয়। এখন আমি চলে যাচ্ছি। কালকের আগে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। না হয় তারও দরকার নেই। তবে আমার কাছে কাগজপত্র প্রমাণ আছে, তোমাকে দেখাব একসময়। তোমার নামটাও রেখেছিলাম আমিই। তোমার মা তোমাকে 'সুসান' নাম দিতে চেয়েছিল—কিন্তু মনে রেখ আমিই পছন্দ করেছিলাম তোমার নামটা। বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দিল। মনে হল সে উঠোনে নেমে গেছে, কিন্তু একটু পরেই আবার দরজা ঠেলে ঢুকল। তখনও এলিজাবেথ সেইভাবে বসে।

আর একটা কথা, এলিজাবেথ! সে বলল—তুমি তাহলে এখন থেকে আমার নামের উপাধিটাই ব্যবহার কোর, কেমন! তোমার মা হয়তো চাইত না, কিন্তু আমি এটাই পছন্দ করি। তাছাড়া এটাই তো তোমার প্রকৃত উপাধি। অন্য আর কাউকে জানানোর দরকার নেই—যেন তুমি এমনিই উপাধি পাল্টে নিচ্ছ। আমি নাহয় একবার উকিলের সঙ্গেও পরামর্শ করে নেব'খন। কিন্তু তুমি রাজী তো? তাহলে খবরের কাগজে একটা ঘোষণা করে দিলেই হবে।

আমার প্রকৃত নাম যদি তাই হয়, তাহলে তো রাজী হতেই হবে। এলিজাবেথ উত্তর দিল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে—নামধাম যে যেমন ব্যবহার করে।

আমার মা কেন চাইতেন না, কিজানি?

ওইরকম একেকটা অদ্ভুত খেয়াল ছিল তার। যাক গে, নাও একটা কাগজ নাও, কটা লাইন লিখে ফেল তো। আগে একটা আলো ধরাও।

এই আলোতেই দেখা যাচ্ছে— সে বলল—এতেই হবে।

বেশ, লেখো।

হেনচার্ড বোধহয় আগেকার কোনও বিজ্ঞাপন দেখে কথাগুলো মুখস্থ করে রেখে-ছিল। এখন তাই দেখে ঝটঝট করে বলে দিল যে, এলিজাবেথ নিউসন এখন থেকে এলিজবেথ হেনচার্ড বলে পরিচিত হবে। লেখা হয়ে গেলে, কাগজটা মুড়ে, ঠিকানা লিখে, "ক্যাস্টারব্রিজ ক্রনিকল" খবরের কাগজের অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

নিজের কোন ইচ্ছা পূরণ হলে, হেনচার্ডের মুখে একটা খুশীর আগুন জ্বলে উঠত। এখন বরং সেই আবেগকে একটু স্নেহসিক্ত করে সে বলল—আমি ওপরে যাচ্ছি। দেখি কাগজপত্র ঘাঁটলে বোধহয় প্রমাণটা পেয়ে যাবো। তবে আজকে আর তোমাকে দেখাচ্ছি না। গুড্ নাইট এলিজাবেথ।

হতচকিত এলিজাবেথ এতক্ষণ কি হ'ল না হ'ল, বুঝে ওঠার আগেই, হেনচার্ড বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শুধু এইটুকুই ভাল লাগল তার যে, আজকে সন্ধ্যার মত সে অন্ততঃ একা থাকবে। আগুনের ধারে বসে এলিজাবেথ নীরবে কাঁদল অনেকক্ষণ। মায়ের জন্যে তেমন কিছু মনে হচ্ছিল না—মনে হচ্ছিল সেই হতভাগ্য নাবিক রিচার্ড নিউসনের প্রতি কিছু একটা অন্যায় করছে সে।

হেনচার্ড ওপরে গিয়ে শোয়ার ঘরের বড় দেরাজটা খুলল। এখানেই তার যাবতীয় দরকারী কাগজপত্র থাকত। খুলতে খুলতে এক অলস স্মৃতি পেয়ে বসল তাকে। অনেক কথা ভাবছিল হেনচার্ড। অবশেষে এতদিনে এলিজাবেথ তার নিজের হ'ল। এখন নিশ্চয়ই সে ভালবাসবে। ভারি ভাল মেয়ে। হেনচার্ড ছিল এমনই একটা মানুষ, ক্রোধ বা উচ্ছ্বাস যে কোনরকম আবেগের অতিশয্যকেই অন্য প্রিয়জনের উপর না চাপিয়ে পারত না। তাই এলিজাবেথের ভালবাসা শেষ পর্য্যন্ত তার কাছে একটা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্ত্রী বেঁচে থাকাকালীন, অতিকষ্টে যে ইচ্ছাকে সে সংযত রেখেছিল—এখন বিনা দ্বিধায় এবং বিনা ভয়ে সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত করল। ভাবতে ভাবতে সে কাগজপত্র ঘাঁটছিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, তার কাগজপত্রগুলোও, হেনচার্ড নিজের দেরাজে এনে রেখেছিল। এর মধ্যেই সেই চিঠিটাও পাওয়া গেল। উপরে লেখা—এলিজাবেথের বিয়ের আগে যেন খোলা না হয়। মিসেস হেনচার্ডের ধৈর্য্য-সহ স্বামীর থেকে বেশী থাকলেও, বাস্তববুদ্ধি একেবারেই ছিল না। চিঠিটা খামে ভরে' রাখা হয়নি—আর

মোম দিয়ে জোড়াটা এমনই আলগা যে এতদিনে সেটি তার গোপনীয়তা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া হেনচার্ড স্ত্রীকে কখনই খুব মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে নি, তাই ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ, তা সে ভাবে নি। বেচারী সুসানের কখন যে কি খেয়াল হ'ত! সে ভাবল—তারপর বিনা ঔৎসুক্যেই চিঠিটা মেলে ধরল চোখের সামনে।

প্রিয় মাইকেল,—আমাদের তিনজনেরই মঙ্গলচিন্তা করে, এতদিন তোমার থেকে একটা বিষয় গোপন রেখেছিলাম। আমার বিশ্বাস, কেন তা তুমি বুঝতে পারবে—তবে সেজন্যে হয়তো ক্ষমা করবে না আমাকে। কিন্তু সব দিক চিন্তা করে এছাড়া উপায় ছিল না। আমার এ চিঠি যখন তুমি পড়বে, ততদিনে আমি আর এ জগতে থাকব না, আর এলিজাবেথও হয়তো নিজের আশ্রয় খুঁজে পাবে। আমাকে গালমন্দ কোর না, মাইক! শুধু আমার পরিস্থিতিটা একটু চিন্তা কোর। লিখতে আমি পারছিনা—তবু আমায় লিখতে হচ্ছে—এলিজাবেথ তোমার সেই এলিজাবেথ নয়। যাকে কোলে নিয়ে, তোমাকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম, সে তার মাস তিনেক পরেই মারা যায়। এই এলিজাবেথ আমার অপর স্বামীর সন্তান। আমাদের প্রথম সন্তানের নামেই একে এলিজাবেথ নাম দিয়েছিলাম আমি। তাতে আমার কষ্ট কিছুটা দূর হয়েছিল। মাইকেল! আমি মৃত্যুশয্যায়—এসব কথা না ভাঙলেও ক্ষতি ছিল না—কিন্তু না বলে আর পারলাম না। এলিজাবেথের স্বামীকে, তুমি ইচ্ছা করলে জানাতে পার, না হলে না জানাতে পার। তবে, একদিন একটি নারীর প্রতি যে অবিচার করেছিলে, সে কথা মনে করে তাকে ক্ষমা কোর, যেমন আমি তোমাকে করেছি। ইতি—

সুসান হেনচার্ড।

চিঠির জানালা পথে মাইলের পর মাইল অতীতের দৃশ্য ভেসে উঠল হেনচার্ডের চোখের সামনে। ঠোঁটদুটো কাঁপছিল তার। শরীরটা কুঁকড়ে গিয়ে আরও কঠিন আঘাতের প্রতীক্ষা করছিল যেন। ভাগ্যের ভাল-মন্দ বিচারে সাধারণতঃ সে সময় নষ্ট করত না। গভীর বেদনার মুহূর্তে তার মুখে বড় জোর শোনা যেত—কপালে দুঃখ আছে, বুঝতে পারছি! কিম্বা—এও লেখা ছিল আমার কপালে! কিন্তু এখন তার অন্তর তোলাপাড় করতে লাগল শুধু একটি চিন্তা—ঠিকই হয়েছে, এই জানতে পারাটাই প্রাপ্য ছিল আমার।

এতদিনে ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল কেন তার স্ত্রী মেয়েটির নাম নিউসন থেকে হেনচার্ড করতে চায় নি। শত বোকামি সত্ত্বেও তার যে কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল, সেটাই প্রমাণিত হ'ল আবার।

ঘণ্টাদুয়েক ধরে হেনচার্ড একেবারে উদ্দেশ্যহীন, স্পন্দনরহিত অবস্থায় বসে রইল। অবশেষে বলে উঠল—হায়! এ'ও কিনা সত্যি হয়!

লাফদিয়ে উঠে পড়ল সে। চটিদুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাতিটা নিয়ে এগিয়ে গেল এলিজাবেথের ঘরের দিকে। চাবির ফুটোয় কান পেতে শুনল—এলিজাবেথের শ্বাস পড়ছে বেশ জোরে। গভীর ঘুমে সে অচেতন। হেনচার্ড আ-স্তে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। বাতিটা আড়াল করে এগুল এলিজাবেথের দিকে। তার সারা শরীরে বাঁকা হয়ে পড়েছিল আলো—কিন্তু চোখের উপরে পড়ছিল না। হেনচার্ড ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

এলিজাবেথের গায়ের রং ফর্সা, তার নিজের একটু ময়লা। কিন্তু সেটা তেমন কিছু নয়। ঘুমিয়ে পড়লেই মানুষের বংশগত শারীরিক উত্তরাধিকারগুলো বেশী ফুটে উঠে। দিনের বেলায় ছুটোছুটি ও ব্যস্ততায় তত বোঝা যায় না। নিদ্রিত এ' মেয়েটির চেহারায় রিচার্ড নিউসনের উত্তরাধিকার নির্ভুলভাবে চেনা যাচ্ছিল। হেনচার্ড আর দাঁড়াতে পারল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

দুঃখ থেকে তার অন্তর্দাহ ও সহ্যশক্তি ছাড়া অন্য কোন উপলব্ধি জন্মায় নি। স্ত্রী তার ইহলোকে নেই আর। অতএব প্রতিশোধের বাসনা প্রথমেই তিরোহিত হ'ল। ভূত-দেখার মত ভয়ে সে তাকাল বাইরের অন্ধকারের দিকে। আর সকলের মতই, হেনচার্ডের মনেও কুসংস্কার কম ছিল না। আজ সন্ধ্যার পর থেকেই পরপর ঘটনাগুলো যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তির পরিকল্পনা, তাকেই শাস্তি দেওয়ার জন্যে। তবুও অস্বাভাবিক তো কিছু নয়। পুরনো ইতিহাস এলিজাবেথকে না বলতে বসলে, তার কাগজপত্র ঘাঁটারও দরকার হত না। যখন নাকি মেয়েটিকে সে পিতৃত্বের আশ্রয় দেওয়ার জন্যেই এত কাণ্ড করল—ঠিক তখনই জানতে পারল যে আসলে তাদের কোনও রক্তের সম্পর্কই নেই—এই ঠাট্টাটা অট্টহাস্য করে ফিরছিল তার মনে।

হেনচার্ডের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, সে ঠিক মূর্চ্ছাও যায় নি, আবার পুরোপুরি সজ্ঞানও নয়। স্ত্রীকে সে মুখে হয়ত অনেক গালমন্দ করতে পারত, কিন্তু অন্তরে পারছিল না। চিঠির উপরের নিষেধাজ্ঞাটা মেনে চললে হয়তো এ কষ্ট ভোগ করতে হ'ত না আপাততঃ। কিম্বা কোনদিনই নয়। কারণ এলিজাবেথকে বর্তমান সুরক্ষিত কুমারীজীবন ছেড়ে অনিশ্চিতিপূর্ণ বিবাহ সম্পর্কে একটুও আগ্রহী মনে হচ্ছিল না।

অস্থির ঘনঘোর রাত্রিও ভোর হল একসময়। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখা দিল। যা একবার করে ফেলেছে, তা থেকে পিছিয়ে আসার মত লোক ছিল না সে—বিশেষতঃ যেখানে আত্মসম্মানের প্রশ্ন জড়িত। এলিজাবেথকে যখন সে নিজের মেয়ে বলেই বুঝিয়েছে, তখন মিথ্যে হলেও সেটাই

বজায় রাখতে হবে।

কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে প্রথম মুখোমুখি হওয়ার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না হেনচার্ড। সকালের খাবার খেতে, খাওয়ার ঘরে ঢুকতেই, এলিজাবেথ খুব সহজভাবে এগিয়ে এল, বাহু জড়িয়ে ধরল তার, তারপর সরলভাবে বলল, কাল সারারাত আমি ভেবেছি। তুমি যা বলেছো, সবটাই মিলে যাচ্ছে। সত্যি বলছি বাবা! আমার মনে আর কোন সন্দেহ নেই, না'হলে শুধু সৎমেয়ে হলে কেউ এত ভালবাসে! তুমি কত জিনিস কিনে দিয়েছ আমাকে! মিঃ নিউসনও খুব ভালবাসতেন আমাকে —(চোখে জল এসে যাচ্ছিল তার) কিন্তু—ঠিক বাবার মতন নয়।

হেনচার্ড নীচু হয়ে তার কপালে চুমু খেল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সে এই মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু এখন আর গভীর ব্যঙ্গ ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই মাকে পুনরায় গ্রহণ করেছিল সে—কিন্তু তার সব ধারণাই যে একদিন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে সে কথা কে জানত!

॥ কুড়ি ॥

হেনচার্ডের পরবর্তী ব্যবহারগুলো এলিজাবেথের কাছে চরম ধাঁধাঁর মত ঠেকতে লাগল। তীব্র এক ঝোঁক আর উত্তেজনার বসে সে নিজেকে বাবা বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল—কিন্তু গভীর মমতাবোধ এ'র মধ্যে ছিল না। পরদিন সকাল থেকেই তার ব্যবহার কেমন যেন অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠল—যেটা এলিজাবেথ আগে কখনও দেখে নি।

দিনে দিনে তার নিরাসক্তি তিরস্কার রূপে দেখা দিল। হাতের লেখার এক পরীক্ষা দিতে হল এলিজাবেথকে। একদিন সে খাওয়ার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে, হঠাৎ কি কারণে যেন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। মেয়র যে এখানে বসে ব্যবসার আলোচনা করছিলেন আর একটি লোকের সঙ্গে, সেটা একেবারেই খেয়াল হয় নি।

শোনো, এলিজাবেথ! মেয়র তার দিকে তাকিয়ে বলল—যা বলছি লেখো তো। এঁনার সঙ্গে জমিজমার ব্যাপারে একটা দলিল করতে হবে আমার।

খাতা, কাগজ, কলম নিয়ে এসে বসল এলিজাবেথ।

লেখো—প্রথমে লেখো, কন্ত রায়ত স্বত্বের জমিজমা মায় আকর আত্তলতাদী,

হ'ক হকুকাদী বিক্রম কার্যকলাগে—বারকয়েক থেমে থেমে এলিজাবেথের কলম এগুতে লাগল। বেশ বড় আকারের গোটা গোটা অক্ষর। আধুনিকাদের অনেকেই সে হাতের লেখা দেখলে ঈর্ষ্যান্বিত হবেন। কিন্তু হেনচার্ডের প্রতিক্রিয়া হ'ল অন্যরকম। তার ধারণা ছিল—তীক্ষ্ণ কিন্তু জড়ানো হাতের লেখাই মেয়েদের সৌন্দর্য্যের আর একটা দিক। এলিজাবেথের লেখা দেখে রাগ হ'ল তার ; আদেশের ভঙ্গিতে—ছেড়ে দাও, আমিই লিখছি—বলে তখুনি তাকে বিদায় করে দিল।

এলিজাবেথের অপরিপক্ক ধরণ-ধারণ মাঝেমাঝেই ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিনা প্রয়োজনে টুকটাক কাজকর্ম করার দিকে খুব ঝোঁক তার। ঝি-চাকরকে ডাকাডাকি না করে হয়তো নিজেই চলে গেল রান্নাঘরে বা ঘরটা ঝাঁট দিতে শুরু করল—কিম্বা বিছানা পাট করতে লাগল। কারও সঙ্গে ঝাঁঝ করে কথাবলা'ও স্বভাব নয়। এইসব দেখেশুনে হেনচার্ড একদিন ডেকে বলল তাকে—ঝি চাকরের সঙ্গে অমন মিনমিন করে কথা বল কেন ? তোমার ফাই-ফরমাস খাটার জন্যেই তো ওদের মাইনে করে রাখা হয়েছে, নাকি ?

তাড়া খেয়ে এলিজাবেথ এমন জড়সড় হয়ে গেল, যে কিছুক্ষণ পরে হেনচার্ডই রেগে ওঠার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করল।

এইসব ছোটখাট ব্যাপারেই অন্তরের একটা গভীর অশান্তি ধরা পড়ে যাচ্ছিল বেশ। রাগ করলে তবু ভাল, হেনচার্ডকে চুপ করে থাকতে দেখলে, এলিজাবেথ ভয় পেত আরও বেশী। মাঝেমাঝেই চুপ করে থাকার ফলে হেনচার্ডের অপছন্দ সম্বন্ধে এলিজাবেথ স্থিরনিশ্চয় হয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত হেনচার্ড—এলিজাবেথ তার অর্থ বুঝতে পারত না। সবকিছু মনে হত এক নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ, বিশেষতঃ হেনচার্ডেরই নাম গ্রহণ করার পর থেকে তার এই অসন্তুষ্টি—এলিজাবেথের কাছে ছিল খুব দুর্বোধ্য।

কিন্তু চরম পরীক্ষা উপস্থিত হল একদিন বিকেলবেলা। আজকাল প্রায়ই এলিজাবেথ বিকেলের দিকে ন্যান্স মকারিজকে ডেকে চা-রুটি খেতে দিত। ন্যান্স মকারিজ ঠিকে-ঝি। কাজকর্ম সারতে সন্ধ্যে উৎরে যায় তার। খাবার দেওয়ার জন্যে ন্যান্স প্রথম প্রথম বেশ কৃতজ্ঞ বোধ করত—কিন্তু পরে এটা তার দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হেনচার্ড একদিন দূর থেকে দেখল—এলিজাবেথ ন্যান্স মকারিজ-এর খাবারদাবার নিয়ে উঠোনের দিকে যাচ্ছে। রাখার মত পরিষ্কার জায়গা না পেয়ে সে নিজেই দু'আঁটি বিচুলি বেশ করে বিছিয়ে তার উপর রুটিটা রাখল—আর ন্যান্স মকারিজ ততক্ষণ পাছায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ব্যাপারটা।

এলিজাবেথ! শুনে যাও—হেনচার্ড ডাক দিল।

এ কিরকম চালচলন তোমার? খুব চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বলতে লাগল হেনচার্ড—তোমাকে না প-ঞ্চা-শ বার বলেছি, এ্যাঁ! ঐ ধরণের একটা মেয়েলোকের ফরমাস খাটছ তুমি! আমার মানসম্মান আর কিছু রাখবে না দেখছি!

কথাগুলো চাপাস্বরে হলেও ন্যান্স মকারিজের কানে পৌঁছল। সে তার চরিত্র বা দারিদ্র্য সম্পর্কে কোনও মন্তব্য শুনতে প্রস্তুত ছিল না। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সে দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—শুনে রাখো, মিঃ মাইকেল হেনচার্ড, তোমার মেয়ে তো হোটেল-ফেরৎ চাকরাণী—আবার আমার সঙ্গে তুলনা মারছ?

হতেই পারে না—ভয়ানক ঘৃণার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল হেনচার্ড।

—জিগ-গেস করেই গ্যা-কো—ন্যান্স বলল। বগল পর্যন্ত খোলা হাতদুটো তার বুকের উপরে ভাঁজ করা—সহজেই যাতে দুই কনুই চুলকুনো যায়।

হেনচার্ড এলিজাবেথের দিকে তাকাল। ততক্ষণে এলিজাবেথ ভয়ে নির্জীব, শুকনো কাঠ হয়ে গেছে।—সত্যিকথা?—হেনচার্ড জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁ কি না?

সত্যি। এলিজাবেথ উত্তর দিল—আমি বাধ্য হয়ে—

করেছিলে, কি করো নি, তাই বলো—এবং কোথায়?

'থ্রী মেরিনার্স'-এ যে ক'দিন ছিলাম—একদিন মালিকানীর কথায় একজনকে খাবার পৌঁছে দিতে হয়েছিল।

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে ন্যান্স তাকাল হেনচার্ডের দিকে—তারপর পালতোলা নৌকোর মত ফিরে গেল উঠোনে। সে ভেবেছিল চাকরি তো চলে যাবেই, অতএব জিভটাকে আর দুর্বল করে রাখা কেন? হেনচার্ড কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে দিল না। বরং তারই নিজের জীবনের পুরনো স্মৃতি মনে পড়ায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল অপমানবোধে। অপরাধীর মত এলিজাবেথ হেনচার্ডের পেছন পেছন বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকল—কিন্তু ঘরে কোথাও হেনচার্ডের দেখা পাওয়া গেল না। সারাদিনই দেখা গেল না তাকে।

হেনচার্ড এ' ঘটনা ইতিপূর্বে শোনে নি। কিন্তু এখন শোনার পর থেকে মনে হতে লাগল লোকের চোখে তার মানসম্মান আর বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। অথচ এই অপবাদ এমন একজনের জন্যে, যে কিনা তার নিজের মেয়ে নয়। এলিজাবেথকে আর আদপেই সহ্য করতে পারছিল না সে। এখন বেশীরভাগদিনই সে খাওয়া দাওয়া সারত বাইরে। অন্যান্য ব্যবসাদার আর চাষীদের সাথে। একবারও মনে হ'ত না বাড়ীতে নিঃসঙ্গ মেয়েটি একা একা হাঁপিয়ে উঠছে। সময় কাটাতে এলিজাবেথ মন দিয়েছিল পড়াশুনার দিকে। বড় বড় বই খুলে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ত তার গাল বেয়ে। দুর্বোধ্য সে সব বইয়ের মর্ম উদ্ধার করতে আরও উঠে পড়ে লাগল সে।

ভাষাহীন তার ডাগর দুটি চোখে কী গভীর মমতা আর কৌতূহল! আশপাশের

একটি লোকও তা বুঝত না। ফারফ্রীর প্রতি তার গভীর ভালবাসা অনেক ধৈর্য্য ধরে সে গোপন রেখেছিল। কারণ ফারফ্রীর যদি তার প্রতি একটুও টান না থেকে থাকে তাহলে ব্যাপারটা তার কুমারী জীবনে খুব সুখের হবে না। ফারফ্রী এবাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেই, এলিজাবেথও কি এক অজ্ঞাত কারণে ঘর পাল্টে ফেলেছিল। ভেতরে উঠোনের দিকের ঘর ছেড়ে সে রাস্তার ধারের একটা ঘরে এসে থাকত—কিন্তু রাস্তা চলতে কোনদিনই ফারফ্রী মুখ তুলে তাকায় নি সেদিকে।

শীত এসে পড়েছে। আবহাওয়ার অনিশ্চিতির কারণে এলিজাবেথের বাইরে বেরুনো প্রায় বন্ধ। শীতের গোড়ায় আকাশ ঘেমে দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমে বাতাস বয়। ক্যাস্টারব্রিজের বায়ুস্তর যেন মখমলের মত নরম হয়ে যায়। এইরকম দিনগুলোতে এলিজাবেথের খুব ইচ্ছা করে বেড়াতে যেতে—বিশেষ করে তার মায়ের অন্তিমশয্যা থেকে একবার ঘুরে আসতে। ক্যাস্টারব্রিজের গোরস্থান সুপ্রাচীন সেই রোমকযুগের আর একটি স্মৃতিচিহ্ন। ইতিহাসবিস্মৃত কত নারীপুরুষের দেহাবশেষ এখানে ধূলোয় পরিণত হয়েছে। তাদেরই মত একই পরিণতি হয়েছে এলিজাবেথের মায়েরও।

বিকেলের দিকে, বেলা পড়ে এলে, এলিজাবেথ একদিন আনমনে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হল এই গোরস্থানে। গীর্জা পেরিয়ে এসে সে মায়ের স্মৃতিস্তম্ভের দিকে এগুল—কেউ একজন সেখানে দাঁড়িয়ে মিসেস হেনচার্ডেরই স্মৃতিফলকের লেখাগুলো পড়ছিল। সে অনেকটা এলিজাবেথেরই বয়সী, তার মত শোকাহত। তবে তার পোশাক পরিচ্ছদ এলিজাবেথের তুলনায় অনেক দামী এবং সুন্দর। এলিজাবেথ থমকে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলাকে দেখতে লাগল। মনে হচ্ছিল মহিলাটি তার সব সৌন্দর্য্য চুরি করে নিয়েছে। সে নিজে যতই সুশ্রী হোক না কেন—মহিলাটিকে মনে হচ্ছিল রূপসী।

এলিজাবেথের মনে পরশ্রীকাতরতা ছিল না একটুও। এই অপরিচিতাকে দেখে তার হিংসা হল না বরং ভাল লাগছিল—কোত্থেকে এলেন ইনি? জামাকাপড় আর চালচলনে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, ইনি ক্যাস্টারব্রিজের কেউ নন।

অপরিচিতা মিসেস হেনচার্ডের কবরের পাশ থেকে সরে গেল চট করে। এলিজাবেথ সেখানে পৌঁছে দেখল স্পষ্ট দুটো পায়ের ছাপ। মহিলাটি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল এখানে। বাড়ী ফিরতে ফিরতে সে নানাকথা ভাবছিল—সুন্দর প্রজাপতি বা রামধনু দেখে মনটা যেমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

সময়টা বাইরে যতই ভাল কাটুক, বাড়ীতে তার জন্যে দুঃখ অপেক্ষা করছিল। হেনচার্ড মেয়র হওয়ার পর দু'বছর পূর্ণ হয়ে এসেছিল প্রায়। এরপরে যে অল্ডারম্যান-দের তালিকায় তার নাম ছিল না—একথা তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বরং তার

জায়গায় কাউন্সিলের নতুন মেম্বর ঠিক হয়েছিল মিঃ ফারফ্রী। তার উপর আবার এলিজাবেথের ঘটনা মনে মনে কুরে কুরে খাচ্ছিল তাকে। হেনচার্ড খবর নিয়ে জেনেছিল যে, এলিজাবেথ যার কাছে নিজেকে এত হেয় করেছিল সে ফারফ্রী ছাড়া আর কেউ নয়। 'থ্রী মেরিনার্স'-এর মালিকানী যদিও ব্যাপারটাকে মোটেই গুরুত্ব দেয় নি—কিন্তু অন্যান্যদের চোখে যে হেনচার্ডের চূড়ান্ত অবমাননা হয়েছিল—তাতে তার নিজের কোনও সন্দেহ ছিল না।

মিসেস হেনচার্ড যে সন্ধ্যায় তার মেয়েকে নিয়ে ক্যাস্টারব্রিজে এসেছিল, তার পর থেকেই যেন হেনচার্ডের দুঃসময় শুরু হয়েছে। সেই সন্ধ্যায় হোটেলের সেই ভোজ-সভাতেই হেনচার্ডের জীবনে মোড় ঘুরে গেল। তারপরও জীবনে তার সার্থকতা এসেছে—কিন্তু শান্তি নেই। নতুন অল্ডারম্যান-তালিকায় যে তার নাম নেই, এ'র থেকে দুঃখের আর কিছু থাকতে পারে? এলিজাবেথকে দেখে ছোট্ট করে সে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় গিয়েছিলে?

গীর্জার ঐদিকটায় হাঁটছিলাম একটু। বেড়াতে বেড়াতে খুব জাড় লেগে গেল। বলে একটু সময় নিয়ে দুই হাতে নিজের গাল চেপে ধরল।

এই এক কথাতেই হেনচার্ডের এতদিনের রাগ ফুটে বেরুল।—তোমাকে কতদিন বলেছি এভাবে কথাবার্তা বলবে না—হেনচার্ড গর্জন করে উঠল—'জাড়' লেগেছে—ও কেমন কথা? লোকে শুনলে ভাববে তুমি ঝি-চাকরের কাজ করো। অসহ্য। এভাবে চললে আমাদের দু'জনের পক্ষে একজায়গায় থাকা সম্ভব হবে না।

এতসব কাণ্ডের পর, সেদিন শুতে যাওয়ার আগে এলিজাবেথের সান্ত্বনা পাওয়ার মত আর কিছু ছিল না। শুধু সেই অপরিচিতার মুখটা ভেসে উঠছিল মনে—আবার তার সঙ্গে দেখা হবে—এই আশায় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

হেনচার্ড মনে মনে ভাবছিল, ঈর্ষ্যার বসে বোকামি করে সে ফারফ্রীকে সেদিন চিঠি না লিখলে, আজ এই অপরের মেয়ের দায়িত্ব তার ঘাড় থেকে নেমে যেত সহজেই। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে সে উঠে পড়ল। চিঠি লিখতে বসল আবার। ভাবল—যাক্—ব্যাপারটাকে ও বোধহয় বিয়ের প্রস্তাব বলেই ভাববে—আমার বাড়ী থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা মনে না আসারই কথা। হেনচার্ড লিখল—

মিঃ ফারফ্রী—ভেবে দেখলাম, এলিজাবেথের সাথে তোমার মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। অতএব আমি আমার আপত্তি তুলে নিচ্ছি। তবে একটা কথা—এসব ব্যাপার-স্যাপার আমার বাড়ীতে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইতি—এম. হেনচার্ড।

পরদিন সকালবেলা, গীর্জার আঙ্গিনায়, সেই অপরিচিতার খোঁজে এদিক ওদিক

তাকাতে তাকাতে, এলিজাবেথ দরজার কাছে মিঃ ফারক্রীকে দেখতে পেল। পকেট থেকে নোটবুক বের করে সে কি হিসেব করছিল। এলিজাবেথকে যেন সে দেখেও দেখল না—তারপর নিজের কাজে চলে গেল।

নিজের তরফে আগ্রহের আতিশয্যে এলিজাবেথ মনে মনে ভাবছিল—ফারক্রী সম্ভবতঃ তাকে নীচ মনে করে। হতাশ হয়ে সে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। বেদনায় তার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে একবার জোরে জোরেই বলে ফেলল—ওঃ! মায়ের সঙ্গেই যদি মরে যেতে পারতাম।

বেঞ্চিটার পেছনেই দেয়াল ঘেঁষে কিছুটা জায়গা শান-বাঁধানো। সেখান দিয়ে লোকজন চলাফেরা করে কখনও কখনও। কেউ একজন মনে হল—বেঞ্চিটার পেছনে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। পেছন ফিরে তাকিয়ে এলিজাবেথ দেখল—গতকাল-কের সেই মহিলা।

কিছুক্ষণের জন্যে এলিজাবেথের মুখে ভাষা যোগাল না। সে বুঝতে পারছিল—মহিলাটি তার কথা শুনে ফেলেছে। একটু পরেই মহিলাটি তার সাবলীল স্বরে প্রশ্ন করল—কি হয়েছে তোমার?

জানি না—তোমায় তা বলতে পারব না—বলে এলিজাবেথ দুই হাতে মুখ ঢেকে অশ্রুবেগ সম্বরণ করল।

মুহূর্তের নীরবতার পর মহিলাটি এলিজাবেথের পাশে বসে পড়ে বলল—বুঝতে পেরেছি। কবরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—ঐ বুঝি তোমার মা? মেয়ে-লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ এমন এক আগ্রহ এবং উদ্বেগ দেখতে পেল যে একে বিশ্বাস করা যায়। উত্তর দিল—হুঁ, আমার একমাত্র আপন জন।

কেন তোমার বাবা, মিঃ হেনচার্ড, তিনি তো বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। এলিজাবেথ উত্তর দিল।

তোমাকে তিনি ভালবাসেন না?

তাঁর সম্পর্কে কোন অভিযোগ করতে চাই না আমি।

ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

এমনি একটু।

তোমার নিশ্চয়ই কোনও দোষ ছিল—অপরিচিতা বলল।

হুঁ . দোষ আমার অনেক—দুর্বল শ্বাস ফেলে উত্তর দিল এলিজাবেথ—ঝি-চাকরের কাজ, আমি অনেক করে নিই। আমি বলেছিলাম—'জাড়' লাগছে—সেইজন্যে রেগে গেছেন আমার ওপর।

উত্তর শুনে মহিলাটির ঔৎসুক্য যেন বেড়ে গেল, বলল—তোমার কথা শুনে কি

মনে হচ্ছে জান? তোমার বাবা নিশ্চয়ই বদমেজাজী—হয়তো খানিকটা উচ্চাভিলাষী—কিন্তু খারাপ লোক নন। এলিজাবেথকে সমর্থন করেও হেনচার্ডকে তিরস্কার করল না সে—ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করল।

না, না, খা-রা-প হবেন কেন? সরল এলিজাবেথ উত্তর দিল—তাছাড়া মা মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত কক্ষণো আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন নি। খুব সম্প্রতিই আমার ওপর যেন খেপে গেছেন। সবই আমার দোষ আমি জানি, ছোটবেলা থেকে খুব ভাল শিক্ষা তো পাই নি—

কি? শুনি, তোমার গল্প।

মহিলাটির মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল এলিজাবেথ। তারপর মুখ নামিয়ে বলল—সে খুব সুখের কাহিনী নয়—তবু শুনতে চাও তো বলি। বলে সে তার জীবনের ইতিহাস যতখানি জানত আদ্যোপান্ত বলল। মোটামুটি সব কিছু বলা হলেও মেলায় সেই কেনাবেচার অংশটুকু বাদ গেল। বাড়ী ফেরার কথা চিন্তা করে তার মুখ শুকিয়ে গেল, বিড়বিড় করে বলল—বাড়ী গেলে আজ আবার কি কপালে আছে জানি না। আমার ইচ্ছে করে পালাই, কিন্তু কোথায় যাব?

হুঁ, যত তাড়াতাড়ি তফাৎ হয়ে যেতে পার ততই মঙ্গল। আস্তে আস্তে বলল এলিজাবেথের বন্ধু। আচ্ছা, এক কাজ করবে—তুমি থাকবে আমার সঙ্গে? আমার একজন লোক চাই। ঘর-গেরস্থলির কাজকর্মের জন্যেও বটে—আবার আমার সঙ্গিনী হিসেবেও বটে—থাকবে?

হ্যাঁ। এলিজাবেথের চোখদুটো জলে টলটল করছিল। স্বাধীনভাবে থাকার জন্যে আমি যে কোন কাজ করতে রাজী—তাহলে বোধহয় আমার বাবা আর রাগ করবেন না। কিন্তু—

কি?

আমার তো অত বিদ্যেবুদ্ধি নেই। তোমার সঙ্গিনী হতে হলে—

না, না কোন দরকার নেই।

দরকার নেই? কিন্তু আমি হয়তো মাঝে মাঝে গেঁয়ো কথা বলে ফেলব।

কিচ্ছু ভেব না। আমার বরং শুনতে ভাল লাগবে।

আমার হাতের লেখাও মেয়েদের মত গোটা গোটা নয়—তোমার লেখালিখির কাজও তো করতে হবে আমাকে।

গোটা গোটা লেখা না হলেও চলবে!

চলবে? খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এলিজাবেথের মুখ—কিন্তু, তুমি কোথায় থাকো?

এই ক্যাস্টারব্রিজেই, মানে এখানেই থাকবো আজ থেকে

শুনে অভিভূত হয়ে গেল এলিজাবেথ।

এই ক'দিন আমি বাডমাউথে ছিলাম—আমার বাড়ীটা সারাইয়ের কাজ চলছিল তো, তাই ঠিক বাজারের সামনেই যে বড় বাড়ীটা—হাইপ্রেস হল—ওটাই আমি কিনেছি। দুটো-তিনটে ঘর এখন ব্যবহার করার মত হয়েছে—আজ রাত থেকেই থাকব ভাবছি। ভেবে দেখো তুমি আমার কথাটা, কেমন?—এখানে আবার দেখা হবে—মন ঠিক করে বলো।

আসন্ন পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে, খুশীমনে এলিজাবেথ সম্মতি দিয়ে দিল। তারপর গীর্জার দরজায় এসে দু'জনে আলাদা হয়ে গেল।

॥ একুশ ॥

শৈশবকাল থেকে বহুশ্রুত কোন প্রবাদবাক্য যেমন হঠাৎ একদিন জীবনের মধ্য-গগনে তার কঠোর সত্যরূপ নিয়ে উপস্থিত হয়, তেমনি এই হাইপ্রেস হলের কথা এলিজাবেথ বহুবার শুনেছে আগে কিন্তু এখনই তার প্রকৃত অস্তিত্ব অনুভব করতে পারল।

সারাটা দিন কেটে গেল—এই অপরিচিতা, তাঁর নতুন আবাস এবং নিজেরও সেখানে থাকবার সম্ভাবনা চিন্তা করতে করতে। বিকেলের দিকে টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কিনতে একবার বাজারে যেতে হয়েছিল, তখনই সে জানতে পারল বিষয়টি তার কাছে নতুন আবিষ্কার হলেও দোকানবাজারে লোকের মুখে মুখে ফিরছে। সকলেই জানে হাই প্রেস হল সারাই হচ্ছে। এক মহিলা ওটা কিনেছেন এবং প্রত্যেকেরই ধারণা ঐ মহিলা তাদের দোকানে কেনাকাটা করবেন না। এলিজাবেথ অবশ্যি এত খবরের মধ্যে একটা নতুন কথা জুড়ে দিতে পারল যে সেই মহিলা আজই তাঁর নতুন বাড়ীতে এসে উঠেছেন।

ইতস্ততঃ সন্ধ্যাবাতি জ্বলে উঠেছে। কিন্তু অন্ধকার এখনও ঘোর হয়ে নামে নি। হাইপ্রেস হল—বাড়িটা বাইরে থেকে একবার দেখে যাওয়ার জন্যে এলিজাবেথ প্রেমের টান অনুভব করছিল। আস্তে আস্তে সেইদিকে এগিয়ে গেল সে।

শহরের মধ্যিখানে বাড়ীটা এমনই এক হ্রদের গাম্ভীর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে যে আশপাশে তার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। গাঁয়ের বাড়ীর মত প্রশস্ত তার অঙ্গন, চিমনীতে

পাখীরা বাসা করেছে, এখানে ওখানে টাটকা সবুজ শ্যাওলা। প্রকৃতির নিয়মে কোথাও কোথাও ইঁট-সুরকি বেরিয়ে পড়েছে।

বাড়ীতে নতুন ভাড়াটে এসে উঠলে সামনেটা যেমন অগোছালো থাকে, হাইপ্লেস হল আজ তেমনই দেখাচ্ছে। বাড়ীটা বিশাল না হলেও এ'র একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। ঠিক অভিজাত না হলেও তার থেকে কমতি বলা যায় না। প্রাচীনপন্থী পথিকেরা বলতে বলতে যায়—কাদের রক্ত জল করে তৈরী—আর কার ভোগে লাগছে।

নবাগতা এই মহিলা এখানে এসে ওঠার আগে বাড়ীটা খালিই পড়েছিল দু'তিন বছর। তারও আগে কেউ নিয়মিতভাবে বাস করে নি এখানে। কতকগুলো কারণও অবশ্যি ছিল—প্রধান কারণ হ'ল বাড়ীটা ঠিক বাজারের সামনে। কয়েকটা ঘর একেবারে ঠিক যেখানটায় হাট বসে তার লাগোয়া। এ'বাড়ীর অধিবাসীদের সেটা হয়তো কখনই ঠিক মনঃপুত হয় নি।

এলিজাবেথ ওপরের ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে সেখানে আলো দেখতে পেল। অর্থাৎ ভদ্রমহিলা নিশ্চয় এসে গেছেন। সুন্দরী এবং বিত্তবতী এই মহিলা সরলা অনভিজ্ঞা এলিজাবেথের মনোরাজ্যে এত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, যে বাইরে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল গৃহাভ্যন্তরের কথা।

লোকলস্কর, আসবাবপত্রে ছড়াছড়ি। বাড়ীর উঠোনটা যেন রাস্তারই অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধো-অন্ধকারে এলিজাবেথ একটু একটু করে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। কিন্তু তারপরে নিজেরই দ্বিধা ও সঙ্কোচে ভয় পেয়ে উল্টো দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।...... ... অন্ধকারে ভাল ঠাহর হওয়ার কথা নয়, কিন্তু এলিজাবেথ স্পষ্ট দেখতে পেল সেই পথে হেনচার্ডও বেরিয়ে যাচ্ছে। নবাগতা এই মহিলার সঙ্গে হয়তো কিছু দরকার ছিল কিনা কে জানে। তবে এলিজাবেথ যে তার চোখে পড়ে নি এতেই সে নিজে আশ্বস্ত হল। চোখে পড়ে গেলে আর রক্ষে ছিল না, অন্ততঃ কি দরকারে সে এখানে এসেছিল সে প্রশ্নের তো জবাব দিতে হ'ত।

বেরিয়েই এলিজাবেথ সোজা বাড়ী চলে এলো। তার একটু পরেই এসে পৌঁছল হেনচার্ড। আজ রাত্রেই এ'বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল এলিজাবেথের। কিন্তু হেনচার্ডের কাছ থেকে কিভাবে বিদায় নেওয়া যায় সেট তাঁর মনমেজাজ না দেখে বলা যাচ্ছিল না। এলিজাবেথ দেখল—হেনচার্ডের ব্যবহার অনেক পাল্টে গেছে। রাগ আর মোটেই নেই। বিরক্তির স্থান গ্রহণ করেছে এক চরম অবহেলা। তাই এতই ঠাণ্ডা, নিষ্প্রাণ, রাগের থেকেও নিষ্ঠুর সে আচরণ যে

এলিজাবেথ আর এক মুহূর্তও যেন দাঁড়াতে পারছিল না এখানে।

বাবা! আমি এখান থেকে চলে গেলে, তুমি আপত্তি করবে?—জিজ্ঞাসা করল এলিজাবেথ।

চলে যাবে! না,—আপত্তি কিসের। কিন্তু কোথায় যাচ্ছ?

এলিজাবেথ ভাবল, যে লোকটি তার ভালমন্দ সম্পর্কে এতই নিস্পৃহ তাকে বর্তমান গন্তব্যস্থল সম্পর্কে খুলে বলা অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর। খবর সব তো উনি জানতেই পারবেন। এলিজাবেথ বলল—আমি আরও শিক্ষিত মার্জিত হওয়ার এবং কাজ করার একটা সুযোগ পেয়েছি এমন একটি বাড়ীতে থাকতে পাব যেখানে পড়াশুনা এবং আচার-আচরণ সবই শিখতে পারব।

তা'লে যাও—এখানে যদি তেমন সুযোগ না থাকে।

তোমার আপত্তি নেই তো?

আপত্তি? আমি? হোঃ—না না না। একটু থেমে বলল হেনচার্ড—কিন্তু পয়সাকড়ি বিশেষ পাবে বলে তো মনে হয় না। ভদ্দরলোকেরা উপোস করে বেঁচে থাকার মত বেতনও দেয় না। চাও তো, তোমাকে আমি প্রতিমাসে কিছু সাহায্য করতে পারি—তোমার শিক্ষা-দীক্ষার পরিকল্পনা তাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

এলিজাবেথ এজন্যে ধন্যবাদ দিল।

বরং এক কাজ করলে হয়—একটু থেমে বলল হেনচার্ড—আমি তোমার নামে একটা এ্যান্যুইটি করে দিচ্ছি—তার থেকে প্রতিমাসে কিছু বৃত্তি পাবে তুমি। আমার মুখ চেয়ে তোমাকে নির্ভর করতে হবে না, আমিও তোমার উপরে নির্ভর করব না। কেমন—রাজী?

নিশ্চয়ই।

তা'লে দেখি, আজই করে ফেলা যায় যদি। হেনচার্ডের মনে হচ্ছিল, এই ব্যবস্থায় অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে—এলিজাবেথের ভার ঘাড় থেকে নামিয়ে। দু'জনের তরফেই বিষয়টার সমাধান হয়ে গেল। এলিজাবেথের এখন সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা।

অবশেষে পরের দিন নির্ধারিত ক্ষণ এল। পিটপিট করে বৃষ্টি হচ্ছিল, তা সত্ত্বেও এলিজাবেথ গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল গীর্জার উঠোনে। ভয় হচ্ছিল, হয়তো তার নতুন বন্ধু এই ছিঁচকাঁদুনে আবহাওয়ায় এসে পৌঁছবে না। নির্ভার স্বাধীন জীবন থেকে তাকে এখন দায়িত্বশীল স্বনির্ভরতার পথে পা দিতে হচ্ছে—পদে পদে ভয় আর সন্দেহ। দূর থেকে বন্ধুকে আসতে দেখে এলিজাবেথের সমস্ত সন্দেহ মুছে গেল—বৃষ্টির মধ্যে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল ভদ্রমহিলাকে! কালো ওড়নার মধ্যে থেকে সুন্দর

দাঁতগুলো কী সাদা ঝকঝকে! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি? মন স্থির করেছ?

হ্যাঁ—এলিজাবেথ আগ্রহভরে বলল।

তোমার বাবা রাজী তো?

হ্যাঁ।

তাহলে চলে এস।

কখন?

এখুনি—যত তাড়াতাড়ি পারো। আমি তো ভাবছিলাম তোমাকে ডাকতে পাঠাব। এ'রকম আবহাওয়ায় আমার বাইরে বেরুতে বেশ ভাল লাগে, তাই চলে এলাম।

আমিও ভাবছিলাম—চলে যাই।

তার মানে, আমাদের মনের মিল হয়েছে। তা'লে তুমি আজকেই আসতে পারবে? আমার বাড়ীটা এত ফাঁকা আর অগোছালো, কেউ একজন না থাকলে ভাল লাগছে না।

হুঁ, তা পারব—এলিজাবেথ একটু চিন্তা করে বলল।

কোথায় থাকবে সেকথা কি তোমার বাবাকে জানিয়েছ?

না।

সেকি?

আমি ভাবছিলাম আগে বেরিয়ে আসি তারপর—নৈলে ওঁর মেজাজ অনিশ্চিত—

হুঁ, ঠিকই। তাছাড়া আমি তো তোমাকে আমার নামও বলি নি। আমার নাম মিস্ টেম্পলম্যান।—ঠিক আছে, তা'চলে, আজ সন্ধ্যের সময় তুমি চলে আসছ—এই ছ'টা নাগাদ?

এলিজাবেথ মাথা নাড়ল, বলল—অবশ্যি শেষ পর্য্যন্ত সবকিছু ঠিক থাকলে—বাবার কথা তো বলতে পারি না।

ঠিক আছে, ছটার সময়, কেমন? বলে দু'জনেই পাকা রাস্তায় নামল, তারপর আলাদা হয়ে গেল।

হেনচার্ড ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি যে, এলিজাবেথ এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলবে। সন্ধ্যের একটু আগে সে বাড়ী ফিরে দেখে দরজায় একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে। এলিজাবেথ ছোটখাট বাক্স প্যাঁটরা, ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে হেনচার্ড আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

গাড়ীর জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে এলিজাবেথ বলল—তুমি তো আমাকে যেতে বলেছিলে বাবা!

বলেছিলুম। কিন্তু আমার ধারণা ছিল আগামী মাস বা সামনের বছরে। যাক্

গে, যা ভাল বুঝেছ। এটাই তাহলে আমার যাবতীয় কষ্টের উপযুক্ত প্রতিদান।

বাবা! একথা বলা তোমার সাজে না—এলিজাবেথ একটু জোর গলায় বলল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে—উত্তর দিল হেনচার্ড। বলে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। এলিজাবেথের গাড়ী তখনও ছাড়ে নি। হেনচার্ড উপরে উঠে এলিজাবেথের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। এ'র আগে সে কোনদিন আসেনি এদিকে। ঘরের মধ্যে এলিজাবেথের গুছিয়ে রাখার বহু নিদর্শন, ম্যাপ, স্কেচ, বহু বইপত্র—হেনচার্ড একটুও জানত না এসব—এলিজাবেথ গোপনে নিজেকে কত পরিণত করে তুলেছে। হঠাৎ সে ফিরে এল দরজা পর্য্যন্ত। এগিয়ে এসে সম্পূর্ণ অন্যরকম গলায় বলল—শোনো-ও—আজকাল হেনচার্ড আর এলিজাবেথকে নাম ধরে ডাকে না—কেন চলে যাচ্ছ তুমি? আমি হয়তো একটু রূঢ় কথাবার্তা বলেছি, কিন্তু তোমার জন্যে যে কি দারুণ ব্যথা পেয়েছি তা তুমি জান না—সে এমনই একটা ঘটনা।

আমি? খুব উদ্বিগ্নভাবে বলল এলিজাবেথ—আমি কি করেছি?

সেকথা এখন তোমাকে বলতে পারব না। তুমি যদি থাকো এখানে আমার মেয়ের মত তাহলে একদিন জানতে পারবে।

কিন্তু প্রস্তাবটা আসতে মিনিট দশেক দেরী হয়ে গেছে। এলিজাবেথ ততক্ষণে কল্পনায় তার নতুন বন্ধুর বাড়ীতে উঠে গেছে। কী মধুর আলাপব্যবহার সেই মহিলার! অনেক মোলায়েম করে সে বলল—

বাবা! আমার মনে হয়, আর দেরী না করে আমার এখনই চলে যাওয়া ভাল। বেশী দূরে তো যাচ্ছি না, তোমার খুব দরকার হলে আমি চলে আসব আবার।

হেনচার্ড খুব হাল্কাভাবে মাথা নাড়ল, যেন এলিজাবেথের এই সিদ্ধান্তটিকে সে গ্রহণ করল মাত্র। বেশী দূরে যাচ্ছ না তাহলে! কোথায় থাকবে? ধরো যদি চিঠিপত্র লিখতে হয়—নাকি তা'ও জানাবে না?

হ্যাঁ জানাবো না কেন? এই তো এখানেই—হাই প্লেস হল।

কোথায়? হেনচার্ডের মুখ থমথমে হয়ে গেল।

এলিজাবেথ বলল আবার। হেনচার্ড কথাটি বলল না, কোনও প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না তার মধ্যে। অসীম স্নেহ ও মমতায় হাত নাড়তে নাড়তে এলিজাবেথ কোচোয়ানকে বলল গাড়ী চালাতে।

॥ বাইশ ॥

আগের দিন যখন এলিজাবেথ নতুন বন্ধুর রূপ ও রুচির কথা ভেবে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, হেনচার্ড একটা চিঠি পেল লুসেটার কাছ থেকে। তাতে সে একটুও আশ্চর্য্য হয়নি। লুসেটার আগের চিঠিতে যে আত্ম-গ্লানি এবং নিজের প্রতি ধিক্কার ছিল এখন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রথম পরিচয়ের সেই খুশী-খুশী ভুলকি-চালে সে লিখেছে—

হাই প্লেস হল

প্রিয়তমেষু,

আশ্চর্য্য হয়ো না। তোমার এবং আমার, উভয়ের ভালর জন্যেই আমি ক্যাস্টারব্রিজে এসে থাকার মনস্থ করেছি। কতদিন থাকব—তা অবশ্যি জানি না সেটি আরেকজনের উপর নির্ভর করছে—তিনি একটি পুরুষমানুষ, বিত্তবান এবং একজন মেয়র—আমার ভালবাসার প্রথম দাবীদার।

সত্যি সত্যি, যত হাল্কা ভাবছ—আমি মোটেই তেমনভাবে বলছি না। তোমার স্ত্রী মারা গেছেন জেনেই আমি এসেছি এখানে। তুমি অবশ্যি ভাবতে তিনি অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। বেচারী! জীবনে কোনও সুখ পেল না। ওঁ'র গত হওয়ার সংবাদ শোনার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছিল আমার সম্পর্কে যদি তোমার কোনও ভুল ধারণা থেকে থাকে তবে তা ভেঙে দেওয়া দরকার এবং তোমার পুরনো প্রতিশ্রুতিও আমার মনে করিয়ে দেওয়া উচিৎ। তোমারও এখন আর আপত্তি থাকার কথা নয়। তোমার সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন তুমি এখন কেমন আছো তা'ও জানি না। তাই তোমাকে খবর দেওয়ার আগেই আমি এখানে থিতু হয়ে বসতে চাই।

তুমিও নিশ্চয়ই আমাকে সমর্থন করবে। দু'একদিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করব। আপাততঃ বিদায়।

ইতি—

লুসেটা।

পুঃ—আগের বার ক্যাস্টারব্রিজ হয়ে যাওয়ার পথে তোমার সঙ্গে একটুখানিক দেখা হবে ভেবেছিলাম। হ'ল না, বিধির নির্বন্ধ। সে তুমি শুনলে আরও আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

হেনচার্ড আগেই শুনেছিল হাই প্লেস হলে নতুন একজন বাসিন্দা আসছে। বিস্ময়ের সুরে হাই প্লেস হলে সে প্রথম যে লোকটিকে দেখল তাকেই জিজ্ঞাসা করল—কে আসছে হে?

শুনলাম, টেম্পলম্যান নামে কে এক ভদ্রমহিলা।

হেনচার্ড চিন্তা করতে লাগল, মনে মনে বলল—লুসেটা তবে তাঁর আত্মীয় হবে হয়তো। হুম, তার তো নিশ্চয়ই একটা দাবী আছে আমার ওপর।

এখন তার এই নৈতিক দায়িত্ববোধকে রুখে দিতে আর কোনও পেছুটান ছিল না। বরং ততটা সপ্রাণ না হলেও একটা আগ্রহ উঁকি দিচ্ছিল তার মধ্যে। এলিজাবেথ যে তার কেউ নয়, এটা প্রকাশ হয়ে পড়ার পর থেকে সন্তানহীন আপন-জনহীন তার জীবনে, আবেগের জগতে এক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। নিতান্তই অচেতনভাবে হেনচার্ড চাইত সেটা পূরণ করতে। এইসব ভাবতে ভাবতে একদিন খুব ইচ্ছে না থাকলেও সে ঘুরতে ঘুরতে হাইপ্লেস হলের দিকে গেল। খিড়কি পথে ঢুকে পড়লো ভিতরে। সেখানেই এলিজাবেথ দেখে ফেলেছিল তাকে। ভেতরে ঢুকে হেনচার্ড উঠানের দিকে এগিয়ে গেল। বাসনপত্র গুছোচ্ছিল একটা লোক—তাকে জিজ্ঞাসা করল লুসেটা নামে কোনও মহিলা সেখানে আছেন কিনা।

লোকটি উত্তর দিল—না, কেবলমাত্র মিস্ টেম্পলম্যান এসেছেন। হেনচার্ড তাই শুনে চলে গেল। ভাবল, লুসেটা এখনও এসে পৌঁছয় নি এই রকম একটা মানসিক আচ্ছন্নতার মধ্যে পরের দিন এলিজাবেথ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা হ'ল হেনচার্ডের। তার মুখে নতুন ঠিকানা শুনে হেনচার্ডের মনে হঠাৎ খেলে গেল—লুসেটা আর মিস্ টেম্পলম্যান হয়তো একই মহিলা। মনে পড়ে গেল লুসেটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দিনগুলো। সে এক দূরসম্পর্কের ধনী আত্মীয়ের কথা বলত যার নাম ছিল টেম্পলম্যান। সম্পত্তির প্রতি কোনও লোভ ছিল না হেনচার্ডের—তবুও লুসেটা হয়তো তার সেই আত্মীয়ের ধনসম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু পেয়ে থাকবে—এই ভেবে মনটা তার ভাল লাগল বেশ। মধ্যবয়সের শেষের কোঠায় পৌঁছলে বিষয়-আশয়ের চিন্তাই মানুষের মনকে অধিকার করে রাখে।

এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে হেনচার্ডকে খুব বেশী সময় কাটাতে হ'ল না। চিঠি-লেখা ছিল লুসেটার এক নেশা। তাই এলিজাবেথ চলে যেতে না যেতেই হাই প্লেস হল থেকে মেয়রের বাড়ীতে আরেকটা চিঠি এসে হাজির হল।

আমি এসে পৌঁছেছি। সে লিখছে—ভালই আছি, যদিও অনেক কষ্ট স্বীকার করেই আসতে হয়েছে আমাকে। আশা করি, আমি কি বলতে চাই তা তুমি বুঝতে পারছ, না কি পারছ না? আমার সেই টেম্পলম্যান মাসি, ব্যাঙ্কারের বিধবা

স্ত্রী, তিনি খুব সম্প্রতি মারা গেছেন মারা যাওয়ার আগে তার ধনসম্পদ কিছু দিয়ে গেছেন আমাকে। আমিও তাঁর নামটিই গ্রহণ করেছি—পুরনো নাম এবং বদনামের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে।

এখন আমিই আমার অভিভাবক। ক্যাস্টারব্রিজে হাইপ্লেস হল-এ থাকব বলে স্থির করেছি, যাতে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ করতে কোনও অসুবিধা না হয়। এত কথা তোমায় লিখব না ভেবেছিলাম, পরে দেখা হলে বলব—কিন্তু না লিখে আর পারছি না।

তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে তোমার মেয়ের থাকবার কথা জানতে পেরেছ—আর মনে মনে খুব হেসেছ—ফন্দিটার কথা চিন্তা করে। ও'র সঙ্গে আমার প্রথম দেখা কিন্তু হঠাৎই হয়ে গিয়েছিল। মাইকেল! কেন আমি এটা করেছি জান? যাতে তুমি ওকে দেখার জন্যে মাঝে মাঝে এখানে আসতে পারো এবং আমার সঙ্গে পরিচয় গড়ে ওঠে। মেয়েটি খু-উব ভালো। ও'র অভিযোগ তুমি নাকি ও'র সঙ্গে রূঢ় কথাবার্তা বল। আমি জানি তুমি ইচ্ছে করে বলো না, খেয়ালের বশে হয়ে যায়। যাই হোক, ও যেহেতু এখন আমার কাছে এসে পড়েছে তোমাকে আর শাসন করতে চাই না। তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে হচ্ছে—পরে আবার—ইতি তোমারই—

লুসেটা।

এতগুলো ঘটনার কথা জানতে পেরে হেনচার্ডের বিষাদ কেটে গিয়ে কিছুটা প্রফুল্লতা ফিরে এল। খাওয়ার টেবিলে সে অনেকক্ষণ স্বপ্নের ঘোরে বসে থাকল। এলিজাবেথ এবং ডোনাল্ড ফারফ্রী তার স্নেহভালবাসা থেকে সরে গেলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল লুসেটা সেটি পূরণ করে দিল। বিয়ের জন্যেই যে সে আগ্রহী হয়ে এসেছে—তা পরিষ্কার। বেচারী অন্য কিই বা করতে পারত! অপরিণত বয়সে বিচার বিবেচনা না করে নিজের নামে কলঙ্ক লেপন করেও যে নিজেকে দান করেছে —এ শুধু তার ভালবাসার টান নয়, বেশ করে ভেবেচিন্তেই সে এসেছে নিশ্চয়। হেনচার্ড তাকে দোষারোপ করার মত কিছু পেল না।

বলিহারি লুসেটার বুদ্ধি!—বলতে বলতে হেসে ফেলল সে। এলিজাবেথকে রেখে লুসেটা যে ফন্দি এঁটেছিল সে-কথাই ভাবছিল হেনচার্ড।

লুসেটার সঙ্গে দেখা করা দরকার ভেবে হেনচার্ড আর সবুর করতে পারল না। তখুনি জামাকাপড় পরে বেরিয়ে গড়ল। একটু পরেই যখন সে হাই প্লেস হলের দরজায় এসে দাঁড়াল তখন আটটা থেকে সাড়ে আটটা বাজে। কিন্তু একজন চাকর এসে খবর দিল মিস-টেম্পলম্যান আজ সন্ধ্যাবেলা একটু ব্যস্ত আছেন, অতএব পরের দিন দেখা করলে তিনি খুব খুশী হবেন।

ও! তার মানে দাম বাড়ানোর চেষ্টা। ভাবল হেনচার্ড। অবশ্য তার তো আসার কথা ছিল না, কাজেই ব্যাপারটা সে শান্তমনেই গ্রহণ করল। তবে পরের দিন যে দেখা করতে যাবে না, সেটিও ঠিক করে ফেলল। মনেমনে বলল—মেয়েলোক জাতটাই এই! এদের মনের বিন্দুবিসর্গও ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সন্ধ্যেবেলা সেদিন এমন কিছু কাজ ছিল না লুসেটার—শুধু এলিজাবেথকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে, বুঝতে এবং তার সঙ্গে তাস খেলে কেটে গেল সময়টা।

পরদিন সকাল থেকেই সুন্দর জামাকাপড় পরে লুসেটা বসেছিল হেনচার্ডের প্রতীক্ষায়। সে ভাবছিল, সকালবেলাই হেনচার্ড আসবে। অপেক্ষা করতে করতে বিকেল হয়ে গেল, কিন্তু সে এলিজাবেথকে একবারও বলে নি কার আশায় সে মুহূর্ত গুনছে। দু'জনে মুখোমুখি বসে জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল বাইরে। সেদিন হাটবার। বাইরে খুব হৈচৈ। এত লোকের মধ্যেও এলিজাবেথ তার বাবার টুপি দেখতে পাচ্ছিল—কিন্তু বুঝতে পারে নি যে, লুসেটা'ও একই দিকে তাকিয়ে আছে আরও বেশী আগ্রহে। হেনচার্ডের চলাফেরায় এক গম্ভীর মর্য্যাদাবোধ। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এলিজাবেথের দৃষ্টি হঠাৎ একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

দূরে ফারফ্রীকে দেখা যাচ্ছিল—একজন চাষীর সঙ্গে দরদস্তুর করছে। পায়ে পায়ে হেনচার্ডও এগুচ্ছিল সেইদিকে। হঠাৎ সে ফারফ্রীর সামনে পড়ে গেল। ফারফ্রীর চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি—আমরা কি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলব? কিন্তু এলিজাবেথ তার বাবার মুখে এমন এক কাঠিন্য দেখতে পেল, যেন সে চীৎকার করে বলছে—না। দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ।

কাউকে খুব মন দিয়ে দেখছ মনে হচ্ছে?—বলল লুসেটা।

না না। আরক্ত মুখে উত্তর দিল তার সঙ্গীনী। সৌভাগ্যবশতঃ ফারফ্রী তখন লোকের ভিড়ে মিশে গিয়েছে। লুসেটা কঠোর ভাবে তাকিয়ে বলল—সত্যি বলছ?

স-ত্যি! বলল এলিজাবেথ।

লুসেটা বাইরে তাকাল, জিজ্ঞাসা করল—এরা সবাই বোধহয় চাষী?

না, ঐ তো মিঃ বাল্‌জ্‌, ওঁর মদের দেকান, ঐ বেঞ্জামিন ব্রাউনলেট ঘোড়ার দালাল, কিটসনের শূয়োরের ব্যবসা—এ'ছাড়া ঐ আটাওয়ালা, ওদিকে আরও আছে! এখন ফারফ্রীকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু এলিজাবেথ তার কথা কিছু বলল না।

শনিবারের বিকেলটা এইরকম মনমরা ভাবে কেটে গেল। বাজার ফাঁকা হয়ে এল আস্তে আস্তে। একে একে বাড়ীর পথ ধরল সবাই। হেনচার্ড কিন্তু এত কাছে এসেও লুসেটার সঙ্গে দেখা করল না। লুসেটা ভাবল—বোধহয় খুব ব্যস্ত আছে, রোববার কি সোমবারে আসবে।

দিন কেটে যায়, কিন্তু যে আসবার সে আসে না। প্রত্যেকদিনই লুসেটা খুব যত্নকরে সাজগোজ করে। আস্তে আস্তে তার মন ভেঙে এল। হেনচার্ডের জন্য তার প্রথম প্রেমের সেই মোহ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। এখন শুধু বিয়ের জন্য আবেগের তাড়না। যেহেতু সব বাধাই এখন অপসারিত হয়েছে তাদের বিয়েটা হয়ে গেলে সব কিছু মঙ্গল। এখন আর দেরী করা উচিত নয়, কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও পয়সাকড়ি উভয়ই পেয়েছে সে।

মঙ্গলবারদিন ক্যাণ্ডলমাসের মেলা। সকালবেলা খেতে খেতে লুসেটা খুব ঠাণ্ডাভাবে এলিজাবেথকে বলল—আজবোধহয় তোমার বাবা তোমাকে দেখতে আসতে পারেন। ওঁকে তো প্রায়ই দেখি আড়ৎদারদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এলিজাবেথ মাথা নাড়ল—উঁহুঁ, আসবেন না।

কেন?

আমার উপর রেগে আছেন। এলিজাবেথ ধরাগলায় বলল।

এতই ঝগড়া করেছ তুমি?

এলিজাবেথ যে লোকটিকে তার বাবা বলে জানে তাঁর মানসম্মানের খাতিরেই বলল—হুঁ।

তাহলে তো তোমার ধারে কাছেই উনি ঘেঁসবেন না।

এলিজাবেথ খুব দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

লুসেটার দৃষ্টি শূন্য হয়ে এল। সুন্দর চোখের পাতা আর ঠোঁটের প্রান্ত বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা ফোঁপাতে লাগল সে, সযত্নে গড়া তার তাসের ঘরকে ভেঙে পড়তে দেখে।

কি হ'ল, মিস্ টেম্পলম্যান! কি হ'ল তোমার? এলিজাবেথ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

লুসেটা কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারল না। একটু পরে বলল—তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

আমারও, আমারও তোমাকে খু-উ-ব ভাল লাগে। এলিজাবেথ সান্ত্বনার সুরে বলল।

কিন্তু-কিন্তু—লুসেটা কথাটা শেষ করতে পারছিল না, যার অর্থ হল, হেনচার্ড যদি তার মেয়েকে এত ভয়ানকভাবে অপছন্দ করে, তাহলে এলিজাবেথকে সে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

আপাততঃ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। লুসেটা বলল—মিস হেনচার্ড! একটা কাজ করে দেবে! খাওয়াটা হয়ে গেলে তুমি কয়েকটা জিনিস এনে দাওনা আমায়! —বলে সে অনেকগুলো প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় বস্তুর এক লম্বা ফর্দ দিয়ে দিল—

যেগুলো কিনে নিয়ে আসতে এলিজাবেথের অন্তত: তিন থেকে চারঘণ্টা সময় লেগে যাবে।

এলিজাবেথ তাড়াতাড়ি কাপড়জামা পরে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে সে ভাবছিল—কি জানি কি ব্যাপার। আমাকে আজ একটু তফাৎ করে দিতে চাইছে। কাজ করে দেওয়া নয়, অনুপস্থিতিই যে আসলে প্রার্থিত একথা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় নি তার। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে কি সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

এলিজাবেথ বেরোনর মিনিট দশেকের মধ্যেই লুসেটার এক চাকর হেনচার্ডের কাছে ছুটল তার চিঠি নিয়ে। চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রিয় মাইকেল,

আমার বাড়ীর সামনেই তো তুমি দাঁড়িয়ে থাক ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজের প্রয়োজনে। দয়া করে একবার দেখা করো আমার সঙ্গে। তুমি যে এতদিন আসো নি তাতে ভয়ানক দুঃখ পেয়েছি আমি। তোমার এবং আমার সম্পর্ক যে কোথায় দাঁড়িয়ে তা কিছুই বুঝতে পারছি না, বিশেষত: সমাজের দৃষ্টিতে আমি এখন বেশী মানসম্মানের যোগ্য। তোমার মেয়ে এখানে থাকার জন্যেই হয়তো এই অবহেলা—তাই আমি ওকে আজকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। দরকার আছে বলে চলে এসো—আমি একাই থাকব।—

লুসেটা।

পত্রবাহক ফিরে এলে লুসেটা তাকে বলল, কোনও ভদ্রলোক এলে পরে তক্ষুণি যেন ভেতরে নিয়ে আসে। তারপর ফলাফলের অপেক্ষা করতে লাগল।

হেনচার্ডকে দেখার জন্যে অত বেশী উতলা হয় নি লুসেটা—কিন্তু ভয় হচ্ছিল হেনচার্ড-এর দেরী দেখে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে একটা চেয়ারে বসল। বহুরকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখছিল—আলোটা নিজের মুখের উপর পড়ে এমন ভাবে হেনচার্ডকে আহ্বান জানানোর জন্যে তার মনের সে কি ব্যাকুলতা। অবশেষে, কাৎ হয়ে বসে সে ঠিক করল—হেনচার্ড ঘরে ঢোকার সময়ে, ঐভাবে বসে থাকবে। এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনেই কাৎ-হওয়া, সোজা হওয়া সব ভুলে গেল লুসেটা। লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল, তারপর একদৌড়ে পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। 'জার্সি'তে হেনচার্ড সেই শেষ বিদায় নেওয়ার পর থেকে তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তখনকার সেই আবেগ এখন কিছুমাত্র ছিল না ঠিকই, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটা একটুও কম উত্তেজক নয়।

লুসেটা শুনতে পাচ্ছিল, চাকরটা আগন্তুক ভদ্রলোককে ঘরে এনে বসালো। তারপর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে লুসেটাকে ডেকে দেওয়ার জন্যে বেরিয়ে গেল। খুবই

দুর্বলচিত্ত একটা আহ্বানের ইঙ্গিতে পর্দা সরালো লুসেটা—কিন্তু যাকে বসে থাকতে দেখল সে হেনচার্ড নয়।

॥ তেইশ ॥

সেই মুহূর্তে হেনচার্ড ছাড়া অন্য কেউ যে তার কাছে আসতে পারে একথা লুসেটার একবারও মনে হয় নি। যখন খেয়াল হল ব্যাপারটা সে প্রায় চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা'ও করল না কারণ তত্ক্ষণে একটু দেরী হয়ে গেছে।

ক্যাস্টারব্রিজের মেয়রের থেকে ভদ্রলোকের বয়েস অনেক কম। সুশ্রী, পরিপাটি, পাতলা দোহারা গড়ন। পোষাক-আষাকে মনে হয় বেশ রুচিশীল এবং বিত্তবান। জামার বোতামগুলো সাদা, সদ্যপালিশ করা জুতো চকচক করছে, পরনে ব্রীচেস এবং একটা কালো ভেলভেটের কোট গায়ে। লুসেটার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। কিছুটা বিস্ময় ও হাসির এক আশ্চর্য্য মিশ্রণ করে সে বলল—ও! আমার ভুল হয়ে গেছে।

আগন্তুকের মুখে কিন্তু হাসির চিহ্ন দেখা গেল না, একটিও ভাঁজ পড়ল না। অত্যন্ত বিনীতভাবে সে বলল—আমি খুব দুঃখিত। মিস হেনচার্ডের খোঁজ করছিলাম আমি, তো ওরা আমাকে এখানে এনে বসালো। একেবারে এই ঘরের মধ্যে!

তাতে কি হয়েছে, সেটা তো আপনার ভুল নয়। বলল লুসেটা।

কিন্তু ম্যাডাম, ভুল করে আমি অন্য বাড়ীতে ঢুকে পড়ি নি তো? জিজ্ঞাসা করল মিঃ ফারফ্রী। বিস্মিত হয়ে সে মুচকি মুচকি হাসছিল, আর কি করবে বুঝতে না পেরে জামার বোতাম ঠিক করছিল।

না, না—বসুন। এসেছেন যখন বসুন একটু। লুসেটা তার জড়তা কাটানোর জন্যে খুব আন্তরিকভাবে বলল—বসুন, মিস্ হেনচার্ড এখনই এসে পড়বে।

কথাটা হয়তো পুরোপুরি সত্যি ছিল না। কিন্তু এই যুবকের মধ্যে লুসেটা এমন কিছু দেখতে পেল—যেন একটা সুব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মসৃণতা, ঔজ্জ্বল্য এবং ধার—যা দেখে হেনচার্ড আকৃষ্ট হয়েছিল, আর হয়েছিল এলিজাবেথ এবং থ্রী মেরিনার্স হোটেলের লোকেরা। হঠাৎ সেধে-আসা আনন্দে লুসেটা মুগ্ধ হয়ে গেল। ফারফ্রী কিন্তু ইতস্ততঃ করছিল। চেয়ারের দিকে তাকাল একবার ভাবল কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই (কিন্তু সত্যিই বিপদ ছিল)। তারপর বসে পড়ল।

ফারফ্রী যে হঠাৎ এলিজাবেথের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল তার একটা কারণ ছিল। হেনচার্ড তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে এখন আর এলিজাবেথের সঙ্গে মেলামেশায় তার আপত্তি নেই। এতদিন সে হেনচার্ডের চিঠিটা বিশেষ মন দিয়ে খেয়াল করে নি, কিন্তু ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ভাবল এখন সে ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পারে। আর বিয়ে করতে হলে এলিজাবেথ ছাড়া কারও কথা ভাবা যায় না। অত নরম স্বভাবের, অত হিসেবী, অত সুন্দর মেয়ে আর কে আছে। তাছাড়া এলিজাবেথের নিজের গুণ তো আছেই, আরও একটা সম্ভাবনা হচ্ছে এর ফলে হেনচার্ডের সঙ্গে মিটমাটের একটা রাস্তা খুলে যাবে। তাই মেয়েরের চাঁচাছোলা কথাবার্তা সে হজম করেই নিয়েছিল। আজ সকালে বাজারে বেরোন'র পথে একবার গিয়েছিল তাঁর বাড়ী। সেখানে গিয়ে শুনল এলিজাবেথ মিস্ টেম্পলম্যানের বাড়ীতে থাকছে। হাতের কাছেই এলিজাবেথকে না পেয়ে ফারফ্রী একটু চঞ্চল হয়ে পড়ল। পুরুষদের স্বভাবই এই। তখুনি সে ছুটল হাই প্লেস হলে। কিন্তু সেখানে এলিজাবেথের বদলে দেখা হল তার গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে।

আজকের বাজারটা বোধহয় বেশ জমজমাট হবে। বলল লুসেটা। দুজনেই কথাবার্তার ফাঁকে বাইরের দিকে তাকিয়ে হট্টমেলা দেখছিল।—আপনাদের এখানে এত অসংখ্য মেলা, বাজার আর হাট বসে আমার সময়টা বেশ কেটে যায়। দেখতে দেখতে কত ভাবি!

ফারফ্রী কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। বাইরের কোলাহল ভেসে আসছিল, ঠিক সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। সাধারণ একটা চেঁচামেচি ছাড়াও একেকবার যেন বিশেষ একটা ঢেউ সাধারণ কোলাহলকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল।—আপনি বুঝি প্রায়ই বাইরে তাকিয়ে বসে থাকেন? সে জিজ্ঞাসা করল।

হুঁ—প্রায় রোজই।

বিশেষ কোনও পরিচিত কারও জন্যে তাকিয়ে থাকেন কি?

লুসেটা কেন অমন উত্তর দিল কে জানে! বলল—আমি এমনি ছবি দেখার মত দেখি। তবে—ফারফ্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে মিষ্টি করে বলল—এখন থেকে হয়তো তাকিয়ে থাকব—আপনাকে দেখার জন্যে। আপনি তো রোজই আসেন, তাই না? মানে—আর কি অন্য কিছু না তবে ভিড়ের মধ্যে কোনও জানাশোনা লোককে তাকিয়ে দেখতে বেশ লাগে—তা সে বন্ধু হোক বা না হোক। ঠিক যেন মনে হয়—এত বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যেও অন্ততঃ একটি লোক আছে যার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বা একটা সম্বন্ধ আছে।

আপনার বুঝি একা-একা লাগে ম্যাডাম !

ওঃ কি যে একা লাগে, কি আর বলব !

কিন্তু সকলেই বলে যে আপনার অনেক পয়সাকড়ি আছে।

থাকলেও তা ভোগ করতে জানি না আমি। ক্যাস্টারব্রিজে এলাম এখানে থাকব ভেবে। কিন্তু কতদিন থাকতে পারব সন্দেহ।

আগে কোথায় ছিলেন ?

ঐ 'বাথ' শহরের পাশেই।

আর আমি আসছি সেই এডিনবোরো থেকে—সে বিড়বিড় করে বলল—বাড়ীর ভাত খাওয়ার মত সুখ কি আর কিছুতে আছে। তবে টাকা রোজগার করতে হলে বাইরে বেরুতেই হবে। অতএব কষ্ট হলেও উপায় নেই। এবছর অবশ্যি রোজগার মন্দ হয় নি। উৎসাহে কলকল করে বলে যাচ্ছিল সে—ঐ যে ছাই-ছাই রংয়ের কোট গায়ে দিয়ে লোকটা—এবারের শীতে ও'র থেকেই বেশীরভাগ গম কিনে নিয়েছিলাম আমি। তারপর দর একটু চড়লেই ছেড়ে দিলাম। লাভ অবশ্যি যৎসামান্য হল। কিন্তু অন্যেরা দর আরও বাড়বে বলে রেখে দিল—ওদিকে ইঁদুরে খেয়ে ফর্সা করে দিতে লাগল। এদিকে আমি ছেড়ে যাওয়ার পরেই বাজারও গেল নেমে। আমি তখন আবার আগের বারের থেকেও কম দামে কিনতে লাগলাম। তারপর ফারফ্রী মুখটা একটু উঁচু করল, গলার জোরও বেড়ে গেল একটু—হপ্তাকয়েক পরেই দর চড়লে দিলাম ছেড়ে। তা' অল্প অল্প করে লাভটা আমার মন্দ হয় নি। পাঁচশো পাউণ্ড তো হবেই (বলে দুম্ করে হাতটা নামিয়ে রাখল সে টেবিলের উপর—স্থানকালে পাত্র প্রায় ভুলে গিয়েছিল ফারফ্রী)—আর অন্যেরা ধরে রেখে লাভ করল ঘণ্টা।

লুসেটা বেশ একটা যাচাই করে দেখার মত আগ্রহ বোধ করছিল। লোকটা তার কাছে মনে হচ্ছিল একেবারে নতুন ধরণের। একসময় দু'জনেই দু'জনের চোখে চোখে তাকাল।

ফারফ্রী বলল—আমি বোধহয় আপনাকে বিরক্ত করে তুলছি।

না মোটেই না—লুসেটার মুখটা যেন রাঙা হয়ে উঠল।

তাহলে ?

ঠিক উল্টোটি। আপনাকে ভারী মজাদার লাগছে।

এবারে মুখ লাল হয়ে উঠল ফারফ্রীর।

মানে, আপনারা, স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা—লুসেটা তাড়াতাড়ি শুধরিয়ে নিয়ে বলল—খুব মজাদার। এখানকার লোকদের মত চরমপন্থী নন। এরা হল খুব ঠাণ্ডা, নয়

খুব গরম। কিন্তু আপনাদের মধ্যে কোনটার বাড়াবাড়ি নেই।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না—কি বলতে চাইছেন।

অর্থাৎ আপনারা যখন খুব উৎসাহের মুখে থাকেন বেশ কাজকর্ম করে যান, আবার পর মুহূর্তেই কেমন যেন ভাবুক হয়ে যান। দেশের কথা, বন্ধুদের কথা চিন্তা করেন।

হুঁ, বাড়ীর কথা মাঝেমাঝে মনে পড়ে আমার। ফারফ্রী বলল খুব সাধারণ ভাবে।

আমারও মনে পড়ে কখনও কখনও। তবে আমাদের বাড়ীটা ছিল খুব পুরনো—তাই ভেঙেচুরে আবার নতুন করে গড়া হচ্ছিল—সেই অর্থে ঠিক বাড়ী বলতে এখন আর কিছু নেই আমাদের।

কিন্তু গাছপালা, পাহাড়, ও'গুলোও ঠিক বাড়ীর মত মনে হয়না?

লুসেটা মাথা নাড়ল।

আমার তো খুবই মনে হয়। ক্ষীণস্বরে বলল ফারফ্রী। দেখে মনে হচ্ছিল, তার মন বুঝি উত্তরের দিকে পাখা মেলে দিয়েছে। ব্যাপারটা ফারফ্রীর ব্যক্তিগত স্বভাবই হোক বা লুসেটা যেমন বলেছিল, ভৌগোলিক চরিত্রই হোক—ফারফ্রীর মধ্যে ব্যবসায়িক এবং রোমান্টিক—দুটি সূত্র স্পষ্ট ধরা যেত। একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে যেন রঙীন বুনুনি—দুটি পাশাপাশি থাকলেও একটি অপরটির মধ্যে হারিয়ে যায় নি।

আপনি বুঝি দেশে ফিরে যেতে চান? বলল লুসেটা।

না-না-না। ফারফ্রী যেন হঠাৎ নিজেকে ফিরে পেল।

বাইরে বাজার তখন বেশ জমে উঠেছে। অন্যান্য হাটের দিনের থেকেও আজ গমগম করছে অনেক বেশী। এই ক্যাণ্ডেলমাসের বাজারের দিনে সারা বছরের মত কাজের লোক বেছে নিতে হয়। ভেড়া চরানো বা মাঠে মজুরের কাজ করা এমনকি বাড়ীর ঝিয়ের কাজের খোঁজে মেয়েরাও আসে এই মেলায়। ছেলে, মেয়ে, জোয়ান, বুড়ো—ভয়ানক ভিড়। অন্যান্যদের মধ্যে একধারে এক বুড়ো মেষপালক বসেছিল। তার নিশ্চল চেহারার দিকে তাকিয়েছিল লুসেটা আর ফারফ্রী। জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে বহু লড়াই শেষে সে যেন এক পবিত্র রূপ। ছোটখাটো চেহারার লোকটা অক্লান্ত পরিশ্রমে এত নুয়ে পড়েছে যে পেছন থেকে দেখলে তার মাথাটিও নজরে আসে না। লোকটা মাটির দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কোথায় এসেছে, কেন এসেছে কিছুই খেয়াল নেই। হয়তো বসে বসে ভাবছে। অতীতে কতবার এইরকম এসে বসেছে এবং কত কত অসংখ্য লোকের কাজ করে এসেছে।

বুড়োর ছেলে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দূরদেশাগত এক খামার মালিকের সঙ্গে

দরাদরি করছে। খামারমালিক খুবই সেয়ানা, সে বুড়োকে নিতে রাজী যদি বুড়োর ছেলে'ও যেতে রাজী থাকে। ছেলেটির আবার মুস্কিল হচ্ছে, বর্তমানে যেখানে সে কাজ করে সেখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে তার ভালবাসা। অদূরেই তার প্রেয়সী বিবর্ণ ঠোঁট নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সবকিছু।

নেলী, তোমাকে ছেড়ে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না ছেলেটি খুব আবেগের সঙ্গে বলল। কিন্তু কি করব বলো, বাবার যে আর কাজ থাকবে না এই লেডী-ডের পরে। তখন তো ওঁকে উপোস করতে হবে বেশীদূর তো না. এখান থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল মাত্র।

মেয়েটির ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল—পঁয়ত্রিশ মাইল! তা'লে তো আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না! কান্না লুকোন'র জন্যে মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে লুসেটার দেয়ালের দিকে তাকাল। আধঘণ্টার মধ্যে তাদের মনস্থির করতে হবে। যুবকটিকে এই দ্বন্দ্ব এবং বিলাপের মধ্যে চুবিয়ে দিয়ে খামার মালিক চলে গেল।

জলভরা চোখে লুসেটা ফারফ্রীর দিকে তাকাল। ফারফ্রীর চোখও যেন ভেজা ভেজা, দেখে আশ্চর্য্য লাগল লুসেটার।

একটু সামলে নিয়ে লুসেটা বলল—ভালবাসা ব্যাপারটাই দুঃখের। এ রকম ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে সে যে কি কষ্ট!

দেখি! এদের যাতে ছাড়াছাড়ি না হয় তেমন ব্যবস্থা হয়তো হতে পারে ফারফ্রী বলল। আমার একটা জোয়ান গাড়োয়ান দরকার। আর বুড়োকেও রেখে দিতে পারি, বিশেষ একটা খরচা পড়বে না বোধহয়।

লুসেটা খুশী হয়ে বলল—আপনি এত মহৎ! তাহলে ওদেরকে গিয়ে বলুন, আপনার কাছে রেখে দিন।

ফারফ্রী বেরিয়ে গেল। লুসেটা দেখল ওদের সঙ্গে আলোচনা চলছে, সকলেরই চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল, ফারফ্রী ফিরে এল তারপর।

বাইরে দুজন কৃষকের আলাপ শোনা যাচ্ছিল। একজন অপরকে বলছে—সকালবেলা মিঃ ফারফ্রীকে দেখেছ কোথাও? আমার সঙ্গে এখানে দেখা করার কথা ঠিক দশটায়। সারা বাজার চুড়ে এলাম আমি—অথচ তার টিকিটি দেখলাম না। এমনিতে তো কথার খেলাপ করে না।

ফারফ্রী আস্তে আস্তে বলল—ওঃ আমি ভুলেই গেছিলাম—

এখন তাহলে আপনার যাওয়া উচিত, তাই না? লুসেটা বলল।

হঁ্যা, উত্তর দিল সে কিন্তু বলেও দাঁড়িয়ে থাকল।

লুসেটা বলল—আপনি বরং যান নাহলে আপনার একজন খদ্দের চলে যাবে।

মিস্ টেম্পলম্যান, এবার কিন্তু আমার রাগ হওয়া উচিত। একটু জোরে বলল ফারফ্রী।

তাহলে যাবেন না। আরও কিছুক্ষণ থাকুন।

ফারফ্রী বাইরে তাকিয়ে দেখল, তাকে যে খোঁজ করছে সেই লোকটা মিঃ হেনচার্ডের দিকে এগিয়ে গেল কথা বলতে। ফারফ্রী বলল—থাকতে পারলে ভাল হত কিন্তু আমাকে যেতে হবে। কাজকর্মে অবহেলা করা ঠিক না।

কক্ষনো না।

তাহলে যাই, সুযোগ পেলে আবার আসব।

নিশ্চয়ই,—লুসেটা বলল। আজকের ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য লাগল।

হুঁ, একা একা থাকলে চিন্তা করতে ভাল লাগবে।

না, তা বলতে পারি না। এমন আর কি!

না, না কিছু একটা মনে হবেই।

যাক গে যা হয়ে গেছে। এখন আপনার কাজের ডাক এসেছে।

হুঁ, খালি কাজ আর কাজ। দুনিয়ায় যদি কাজ না করতে হোত!

লুসেটা প্রায় হেসে ফেলেছিল। কোনরকমে সামলে নিয়ে বলল—এত তাড়াতাড়ি আপনার মত বদলে যায়।

এরকম ইচ্ছা আমার আগে কখনো হয়নি। লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল ফারফ্রী—আপনার এখানে মানে আপনাকে দেখার পরে থেকে এইরকম মনে হচ্ছে।

তাহলে, আমার দিকে আর তাকাবেন না, আপনার ক্ষতি করছি আমি।

তাকাই বা না তাকাই, মনে মনে তো দেখতে পাব। আচ্ছা—চলি। আজকের সৌজন্যের জন্যে ধন্যবাদ।

আপনাকেও—অপেক্ষা করার জন্যে।

হয়তো বাজারের মধ্যে গিয়ে পড়লে আবার কাজ-পাগাল হয়ে যাবে। ফারফ্রী বিড়বিড় করে বলল—কিজানি কি হবে।

সে চলে যাবার সময় লুসেটা তাড়াতাড়ি বলল—হয়তো ক্যাস্টারব্রিজে আমার নামে অনেক কথা শুনতে পাবেন। আমার জীবনের ইতিহাসটাই ঐ রকম। লোকে ভাবে আমি অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করি—বিশ্বাস করবেন না যেন।

নিশ্চয়ই না। ফারফ্রী দৃঢ় আস্থার সঙ্গে বলল।

দুজনে দুজনের থেকে বিদায় নিল এইভাবে। লুসেটা যুবকটির উৎসাহ এতদূর জাগিয়ে তুলেছিল যে এক অদৃশ্যটানে ফারফ্রী তখন প্রায় বলগাহীন। অন্যদিকে

লুসেটাকে শুধু নিছক আলস্য থেকে এক গভীর নির্জনতায় পৌঁছে দিয়ে গেল ফারফ্রী। কেন এমন হ'ল—তা বলা সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে।

লুসেটা যে কোনদিন কোনও ব্যবসাদার সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করবে—এটা খুবই অস্বাভাবিক মনে হ'ত, কিন্তু জীবনের নানা উত্থান-পতন বিশেষতঃ হেনচার্ডের সঙ্গে বর্তমান সম্পর্কের জন্যে সে এসব বিশেষ মাথা ঘামায় না। চরম দারিদ্রের সময়ে সে সমাজের থেকে পেয়েছে শুধু ব্যঙ্গ আর আঘাত। তার অন্তরটা খাঁ খাঁ করত তখন শুধু একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে। তাই শুধু একটু উষ্ণতার জন্যে সে সুখ বা দুঃখকে সমজ্ঞান করতে শুরু করেছিল।

ফারফ্রীকে বাইরের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিল সে। ফারফ্রী তৎক্ষণে একেবারে ভুলে গিয়েছিল যে তার আসল উদ্দেশ্য ছিল এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করা। জানলা দিয়ে দেখতে লাগল লুসেটা—ফারফ্রী কিভাবে কার্মারদের সঙ্গে কাজকর্ম মেটাচ্ছে। চলাফেরা দেখে বোঝা যাচ্ছিল লুসেটা যে তাকে লক্ষ করছে এসম্পর্কে সে সচেতন। আর লুসেটার অন্তরটা তৎক্ষণে ফারফ্রীর সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ফায়ফ্রীকে আর দেখা গেল না।

লুসেটা জানালা থেকে সরে যাওয়ার মিনিট তিনেক পরে দরজায় টক্‌টক্ আওয়াজ শোনা গেল। বেশ জোরে। চাকরানীদের একজন গিয়ে দরজা খুলে দিল। ফিরে এসে বলল—মেয়র এসেছেন।

লুসেটা ঘাড় ফিরিয়ে বসেছিল। তক্ষুণি কোন উত্তর দিল না। একটু পরে ঝি'টা তার সংবাদ পরিবেশন করল আবার—সঙ্গে জুড়ে দিল—উনি বলছেন, ওঁর হাতে বেশী সময় নেই।

ও! তাহলে বলে দাও, আমারও খুব মাথা ধরেছে ওঁকে আর দেরী করাব না।

উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া হল এবং দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

ক্যাস্টারব্রিজে এসেছিল লুসেটা হেনচার্ডের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে। সফলও হয়েছিল, কিন্তু সেই সাফল্যের প্রতি এখন উদাসীন হয়ে গেল সে।

সকালবেলা যে এলিজাবেথকে এক উটকো আপদ বলে মনে হয়েছিল বিশেষতঃ হেনচার্ডের কারণে এখন আঁর তাকে ছাড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করছিল না। মেয়েটি ফিরলে পরে (এত কাণ্ড সে জানত না কিছুই) লুসেটা তার কাছে গেল। খুব আন্তরিকভাবে বলল—তুমি থাকাতে যে কি স্বস্তিই পেয়েছি। অনেক—অ-নেক দিন থাকবে তো তুমি আমার কাছে?

এলিজাবেথকে দিয়েই ওর বাবাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। আঃ বাঁচা গেল।

তবে হেনচার্ড এলেও মন্দ হ'ত না। আজকাল হেনচার্ড তাকে অবহেলা করলেও, অতীতে তার বহু বায়নাক্কা সহ্য করেছে। এখন যখন আর অসুবিধা নেই, লুসেটাও কিছু পয়সাকড়ি পেয়েছে, এখন তার লুসেটার আহ্বানে আগ্রহসহকারে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল।

লুসেটার আবেগের জগতে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কত কি যে ঘটে গেল সারাদিনে ভেবে শিহরিত হচ্ছিল সে।

।। চব্বিশ ।।

এলিজাবেথ লুসেটার কথা শুনে খুশী হল খুব। এখানে থাকার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। বেচারী ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না কোন কুগ্রহের প্রভাবে তার জন্যে ডোনাল্ড ফারফ্রীর না-ফোটা প্রেমের কলি নিঃশব্দে ঝরে গেল।

লুসেটার বাড়ী শুধু তার নিজের বাড়ীর মত বলে নয়, আরও একটা আকর্ষণ ছিল সামনের বাজার। তার নিজের এবং লুসেটারও ভাল লাগত বেশ। জায়গাটা সমাজের সকলেরই মিলনস্থল। চাষী, দোকানদার, গোয়ালা, হাতুরে ডাক্তার, ফেরিওয়ালা সবাইকেই হপ্তায় হপ্তায় আসতে হয়। আবার বিকেল হলে পড়ে থাকে ফাঁকা মাঠ।

এক শনিবার থেকে পরের শনিবার এই দুটি মহিলার কাছে এখন আজ আর কাল বলে মনে হ'ত। মাঝখানের দিনগুলি যেন তাদের কাছে দিনই নয়। অন্য যেখানেই তারা বেড়াতে যাক বা কাছে থাক হাটবারটি এলে তারা বাড়ী চলে আসবেই। দু'জনেই জানালা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত ফারফ্রীকে। তার কাঁধ হাতের লাঠি দেখা যেত, মুখ দেখা যেত কিঞ্চিত। লজ্জাতেই হোক বা বেচাকেনার ব্যস্ত থাকার জন্যেই হোক ফারফ্রী এদিকে তাকাত না।

এইভাবেই দিন কাটছিল। এমন সময় একদিন সকালবেলা খাওয়ার সময়ে ঘটনা ঘটে গেল একটা। লুসেটার নামে লণ্ডন থেকে একটা পার্সেল এসেছে—তার মধ্যে একজোড়া নতুন গাউন। একটা খুব গাঢ় চেরী ফুলের রঙেরে, আর একটার রং হাল্কা লুসেটা পছন্দ করে উঠতে পারছিল না কোনটা নেবে এলিজাবেথকে ডেকে দেখাচ্ছিল তাই।

দুটো গাউনের প্রতিই লুসেটার প্রায় সমান দুর্বলতা দেখে এলিজাবেথ বলল—কোনটাই বা বলি!

লুসেটা বলল—স-ত্যি! জামাকাপড় পছন্দ করা এমন ঝকমারি!

অবশেষে, মিস টেম্পলম্যান ঠিক করল যে যাই বলুক সে চেরী ফুলের রঙের গাউনটাই নেবে। গাউনটা মাপেও হ'ল ঠিক, প'রে সে বাইরের ঘরের দিকে গেল, পেছনে এল এলিজাবেথ।

আজকের সকালটা অন্য দিনের থেকে অনেক উজ্জ্বল। লুসেটার বাড়ীর উ'ল্টাদিকে রাস্তায় এবং অন্য বাড়ীগুলোর উপরে সূর্য্যকিরণ এত ঝলমল করছিল যে সেই আলো ঠিকরে পড়ে লুসেটার ঘরের মধ্যেটা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ মনে হ'ল রাস্তায় চাকার ঘরঘর আওয়াজ। আলোছায়ার ফাঁপা-ফাঁপা প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল ঘরের সীলিংয়ে। লুসেটা আর এলিজাবেথ দু'জনেই জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে পড়েছে এক অদ্ভুৎ ধরণের চক্রযান, যেন সেটাকে প্রদর্শনীর জন্য আনা হয়েছে।

যন্ত্রটি এ' অঞ্চলে এই প্রথম এসেছে—এক নতুন ধরণের কলের লাঙল। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল খুব। চাষীরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, মেয়েরাও কেউ কেউ এসেছে দেখতে। বাচ্চারা হামাগুড়ি দিয়ে তলায় ঢুকে যাচ্ছে। মৌমাছি, গঙ্গাফড়িং আর শামুকের মিলিত আকার—বা সামনের দিকটা ভাঙা এক বাদ্যযন্ত্রও মনে হতে পারে। লুসেটার তেমনই মনে হ'ল, তাই সে বলল—ঐটা তো চাষের কাজের পিয়ানো মনে হচ্ছে।

চাষ-বাসেরই কিছু একটা হবে। বলল এলিজাবেথ।

কিন্তু এখানে এনে হাজির করল কে?

তাদের দুজনেরই মনে হচ্ছিল সম্ভবতঃ ডোনাল্ড ফারফ্রী এ'র আবিষ্কর্তা, কারণ সে নিজে চাষের কাজ না করলেও চাষবাস বোঝে খুব ভাল। তারা ভাবছিল বলেই কিনা কে জানে, দেখা গেল ফারফ্রী এসে দাঁড়িয়েছে সেই মুহূর্তে। খুব মনোযোগ দিয়ে যন্ত্রটা দেখল ঘুরে ঘুরে। এমন ভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল যেন সে ভালই জানে সব। দর্শক দু'জনেই মনে মনে আশ্চর্য্য হচ্ছিল বেশ। এলিজাবেথ জানালা থেকে সরে গিয়ে দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। আর লুসেটা তার নতুন পোশাক পরে এতই পুলকিত হয়ে উঠেছিল—ভাবছিল ফারফ্রীকে একবার দেখিয়ে আসে। বলল—চল না যন্ত্রটা দেখে আসি, কি জিনিস।

এলিজাবেথকে দ্বিতীয়বার বলতে হ'ল না। দুজনেই বেরিয়ে গেল। কুতুহলী জনসমুদ্রের মধ্যে লুসেটাকেই মনে হচ্ছিল সম্ভাব্য মালিক, রঙের বাহারে যন্ত্রটির সঙ্গে তারই মিল ছিল বেশ, দু'জনে অত্যন্ত মন দিয়ে দেখছিল সব—ঘুরে ফিরে। এমন সময়ে 'গুড মর্নিং এলিজাবেথ' শুনে ফিরে তাকিয়ে এলিজাবেথ দেখল—তার বাবা।

হেনচার্ডের কথাগুলো খুব শুকনো যেন বাজ পড়ার মত। এলিজাবেথ মনের ভারসাম্য হারিয়ে তোৎলাতে লাগল—বাবা! ইনি মিস্ টেম্পলম্যান,—আমি এঁর কাছে থাকি।

হেনচার্ড তার টুপিতে হাত দিল। লম্বা এক ঢেউ তুলে মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে সে হাঁটুর কাছে আনতেই লুসেটা নত হয়ে অভিবাদন করল।

আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুশী হ'লাম মিঃ হেনচার্ড। সে বলল—যন্ত্রটা কি অদ্ভুৎ, তাই না?

হুঁ। উত্তর দিল হেনচার্ড। সঙ্গে সঙ্গে বোঝাতে শুরু করে দিল এবং যন্ত্রটির অসারতা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল খুব।

এখানে কে আনল? বলল লুসেটা।

সে অনেক কথা ম্যাডাম!—বলল হেনচার্ড। এখানে ওসব কলের লাঙল চলে কখনো? ঐ এক উঠতি মাতব্বরের কাজ। হেনচার্ড এলিজাবেথের মুখের দিকে তাকিয়ে নেমে গেল। ভাবল হয়তো ফারফ্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক এগিয়ে গেছে অনেক।

চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল হেনচার্ড। হঠাৎ এলিজাবেথের মনে হ'ল যেন ভূত দেখছে। খুব ফিসফিস করে হেনচার্ড বলছে—তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও নি।—কথাগুলো যেন লুসেটার উদ্দেশ্যে তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলা। এলিজাবেথের বিশ্বাস হতো না এটা তার বাবার উক্তি যদি না হেনচার্ড কথাগুলো অন্য একজন চাষীর দিকে তাকিয়ে বলত। লুসেটা কোনও উত্তর দিল না। হঠাৎ সব চাপা পড়ে গেল—এক গানের সুরে। যন্ত্রটির মধ্য থেকে ভেসে আসছে সুর। হেনচার্ড লোকের ভিড়ে সরে গেল। মেয়েরা দুজনে সংগীতচর্চার উৎসবের দিকে নজর দিল। গুনগুণানি সুর ভেসে আসছিল—

বসন্তের এক বিকেল বেলায়—
সূর্য্যি তখন যায় নি পাটে,
কিটি নতুন গাউন পরে
গোরীর জন্যে নামল মাঠে

এলিজাবেথ তখুনি বুঝতে পারল গায়কটি কে। হঠাৎ নিজেকে কেন যে অপরাধী-অপরাধী মনে হচ্ছে সে নিজেও বুঝতে পারছিল না। লুসেটা চিনতে পারল একটু পরে। বিস্মিত হয়ে বলল—কী আশ্চর্য্য! কলের লাঙ্গলের মধ্যে থেকে 'গোরীর প্রেমে'র গান।

যুবকটি ততক্ষণে তার পর্য্যবেক্ষণে সন্তুষ্ট হয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মহিলাদুটির চোখে চোখে দৃষ্টি পড়ল তার তখুনি।

আমরা যন্ত্রটা দেখছি ঘুরে ঘুরে। মিস টেম্পলম্যান বলল—কিন্তু এ'টা কোন কম্মের নয়, তাই না? হেনচার্ডের মতামত থেকে জোর পেয়ে সে এটুকু জুড়ে দিল।

কম্মের নয়? সে কি? ফারফ্রী গম্ভীর ভাবে বলল—চাষের কাজে এখন আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। আদ্যিকালের প্রথাপদ্ধতি সব বদলে যাবে।

যন্ত্রটা কি আপনার? লুসেটা প্রশ্ন করল।

ন্ না, ম্যাডাম। ফারফ্রী উত্তর দিল। এলিজাবেথের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তার গলার স্বর স্বাভাবিক থাকলেও এখন কেমন যেন বিচলিত মনে হচ্ছিল।

না, না, আমার নয়—আমি আনার জন্যে সুপারিশ করেছিলাম মাত্র।

এতক্ষণে ফারফ্রীকে তাদের সম্পর্কে সচেতন বলে মনে হ'ল। লুসেটার মনে হচ্ছিল ফারফ্রী এখন ব্যবসায়িক এবং রোমান্টিক এই দুই প্রান্তের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। হাসতে হাসতে সে ফারফ্রীকে বলল—যন্ত্রটা পেয়ে যেন আমাদের ভুলে যাবেন না। বলেই সে তার সঙ্গিনীর সাথে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

এলিজাবেথের কি জানি কেন মনে হচ্ছিল সে লুসেটার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু পরে বসার ঘরে ঢুকলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল তার কাছে। লুসেটা বলল—আগে আর একদিন মিঃ ফারফ্রীর সাথে আলাপ হয়েছিল আমার।

সেদিন লুসেটা এলিজাবেথের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল। দু'জনে একসঙ্গে বসে বসে দেখল, বাজার জমে উঠল, আবার সূর্য্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। জুড়িগাড়ী আর ভ্যানগাড়ীগুলো এক এক করে চলে গেল। রাস্তায় আর একটাও গাড়ী নেই। এখন শুধু পদচারীর ভিড। দূরের দূরের গ্রাম থেকে কিষাণরা এসেছে সপ্তাহের বাজার করতে। গাড়ীর ঘর্ঘর থেমে গিয়ে এখন কেবল তাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বড় জোতদার চাষীরা, পয়সাওলা লোকেরা সব চলে গেছে। এখন যত গরীব লোকের লেনদেন—এক একটা পয়সা বিকোচ্ছে টাকার দামে।

লুসেটা আর এলিজাবেথ এখনও বসে বসে দেখছিল। রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। রাত হয়ে গেছে। আধো-অন্ধকারে তারা আরও নির্ভয়ে কথাবার্তা বলছিল। লুসেটা বলল—তোমার বাবা তো তোমার সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তা বললেন না।

হুঁ—এলিজাবেথ তখনকার মত ভুলে গিয়েছিল হেনচার্ড লুসেটাকে কি বলতে চাইছিল।—বাবা আমাকে বিশেষ একটা মান সম্ভ্রম দিতে চান না। মার সঙ্গে বিচ্ছেদটাই আমার জীবনে কাল হয়েছে। তুমি বুঝবে না সে কী নিদারুণ কলঙ্ক।

লুসেটা যেন উঁকি দিয়ে তাকাল। বলল—বুঝব না, তা নয়। বুঝি কিছুটা।

একটা অপমান লজ্জা তাই না ?

তোমার কোনও তেমন অনুভূতি হয়েছে ? সরলভাবে প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

না—আ—লুসেটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে বলল—আমি ভাবছিলাম মেয়েমানুষের দুর্ভাগ্যের কথা কখনও সম্পূর্ণ বিনাদোষে লোকের চোখে বদনামের ভাগী হতে হয়—অন্য মেয়েরাও তো ঘেন্না করে।

ঠিক ঘেন্না না করলেও সম্মানের চোখে দেখে না।

লুসেটা আর একবার উঁকি দেওয়ার মত তাকাল। এখন ক্যাস্টারব্রিজে চলে এলেও তার অতীত কাহিনী একেবারে ধরছোঁয়ার বাইরে নয়। বিশেষতঃ হেনচার্ডের কাছে রয়ে গেছে তার পুরনো চিঠিপত্রের গুচ্ছ। হয়তো হেনচার্ড সেগুলো এতদিনে নষ্ট করে ফেলেছে—তবুও তার মনে হচ্ছিল ওগুলো কোনদিন না লেখা হলেই ভাল হ'ত।

ফারফ্রীর সঙ্গে লুসেটার সেদিনকার আলাপ চিন্তাশীল এলিজাবেথের মনে দাগ কেটে গিয়েছিল। কয়েকদিন পরে লুসেটা বাইরে বেরুতে যাচ্ছে। এলিজাবেথ দেখে বুঝতে পারল মিস্ টেম্পলম্যান মনে মনে সেই স্কচ যুবকের ধ্যান করছে। লুসেটার চোখে-মুখে অধরে ওষ্ঠে সেই চিন্তা এত পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল যে এলিজাবেথ কেন যে কারও পক্ষে এই ধারণা করা অস্বাভাবিক ছিল না। লুসেটা বেরিয়ে গেল, যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে গেল।

এলিজাবেথ মনে মনে এমনই ছক কেটে রেখেছিল। সে যেন দিব্যচক্ষু দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লুসেটার গতিবিধি। দেখতে পাচ্ছিল কোন এক জায়গায় হঠাৎ লুসেটার দেখা হয়ে গেল ফারফ্রীর সাথে দেখতে পাচ্ছিল ফারফ্রীর সেই কৌতুকমেশানো দৃষ্টি। বিশেষতঃ লুসেটার জন্যে তার দৃষ্টি যেন মধুমাখা। তাদের কথাবার্তা চালচলন খুঁটিনাটি সবকিছু। এমনকি বিদায় নেওয়াও এলিজাবেথের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। কিছুক্ষণ পরে লুসেটা ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করল—

মিঃ ফারফ্রীর সঙ্গে দেখা হল !

হ্যাঁ—লুসেটা উত্তর দিল—তুমি কি করে জানলে ?

লুসেটা হাঁটু গেড়ে তার বন্ধুর হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আদর জানাল। কিন্তু কোথায় কি করে দেখা হল বা কি কথাবার্তা হল সে কথা কিছু বলল না।

সেইরাত্রিটা খুব অস্বস্তিতে কাটল লুসেটার। পরদিন সকালবেলা জরজর মনে হচ্ছিল। সকালবেলা খাওয়ার টেবিলে বসে সে এলিজাবেথকে বলতে লাগল—একটা বিষয়ে সে খুব বিব্রত। ব্যাপারটা এমনই এক মহিলার যার সঙ্গে লুসেটা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এলিজাবেথ শুনতে লাগল।

এক ভদ্রলোককে একটি মেয়ে খুব ভালবাসত—খু উ ব—

অ! বলল এলিজাবেথ।

ভদ্রলোক অবশ্যি মেয়েটি সম্পর্কে অত বেশী ভাবতেন না। তবুও একদিন আবেগের মুহূর্তে তিনি বলে ফেললেন যে ওকে বিয়ে করবেন। সে'ও রাজী হ'ল। ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে তাদের বিয়ে আর হ'ল না। মেয়েটিও মনে মনে ভেবে নিল যে তার পক্ষে আর সেই লোককে বরণ করা সম্ভব নয়। তারপরে তাদের মধ্যে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মেয়েটি ধরেই নিয়েছিল ভদ্রলোক তাকে ভুলে গেছে।

আহা. বেচারী!

মেয়েটি খুব কষ্ট পাচ্ছিল। অবশ্যি এ'রকম ঘটে যাওয়ার জন্যে ভদ্রলোক পুরোপুরি দায়ী ছিলেন না। অবশেষে দৈবক্রমে সে বাধা সরে গেল তিনি আবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন—

কি আশ্চর্য্য!

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সেই বন্ধুটি আর একটি ছেলেকে বেশী ভালবেসে ফেলেছে। এখন প্রশ্ন হ'ল তার কি প্রথম জনকে ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে?

আরেকজনকে বেশী ভালবেসে ফেলল—এ'টা খারাপ।

হুঁ, খারাপ—লুসেটাকে দুঃখিত মনে হচ্ছিল—কিন্তু তারই বা কি দোষ। দ্বিতীয় ছেলেটি শিক্ষাদীক্ষায় অনেক বেশী রুচিবান, আর প্রথম জনের মধ্যে ভাল স্বামী হওয়ার অনুপযুক্ত কিছু কিছু দোষ সে দেখতে পাচ্ছিল।

ব্যাপারটা খুবই জটিল। আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

আসলে, তুমি কিছু বলতে চাইছ না। লুসেটার কথায় মনে হচ্ছিল সে এলিজাবেথের বিচারবুদ্ধিতে খুব আস্থা রাখে।

হ্যাঁ, মিস টেম্পলম্যান! এলিজাবেথ মেনে নিল—আমি কিছু বলতে চাই না।

যাই হোক, ব্যাপারটা খোলসা করে বলতে পেরে লুসেটা অনেকটা হাল্কা হোল। তার মাথা ধরাটা ছেড়ে যাচ্ছিল অনেকটা। আয়নাটা আনো তো দেখি কেমন দেখাচ্ছে আমাকে—বলল লুসেটা।

তোমাকে একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে। এলিজাবেথ চিত্রসমালোচকের ভঙ্গিতে বলল। আয়নাটা এনে দিল তাকে নিজের প্রতিমূর্তি দেখার জন্যে।

একটু পরে লুসেটা বলল—আচ্ছা! বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে?

না, না, বেশ দেখাচ্ছে।

কোন জায়গাটা বিশ্রী লাগছে বলো তো!

চোখের কোণ দুটো যেন বসে গেছে—বাদামী রং হয়ে গেছে।

হুঁ, ঐ জায়গাটাই সব থেকে খারাপ দেখাচ্ছে। আর কতদিন আমার এই রূপ থাকবে বলো তো?

এলিজাবেথ বয়সে ছোট হলেও বিশেষ অভিজ্ঞ ঋষির মত আলোচনায় অংশগ্রহণ করছিল।—ধরো আর পাঁচ বছর—সে হিসেব করে বলল। আর যদি নিরুদ্বেগ জীবন কাটাতে পারো তো আর দশ বছর। কাউকে যদি ভাল-টাল না বাসো ধরে রাখো দশ।

লুসেটা এটাকে একেবারে অলঙ্ঘনীয় অপক্ষপাতদুষ্ট বিচারের হিসাবে মেনে নিল। এলিজাবেথকে সে পুরনো গল্প আর কিছু বলল না। এতক্ষণ তৃতীয় ব্যক্তির ছদ্মরূপে সে কোন অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করল তা'ও বলল না। এলিজাবেথ তার হাজার পড়াশুনা সত্ত্বেও অন্তরে ছিল খুব কোমল। বিছানায় শুয়ে সে রাত্রে সে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল যে লুসেটা তাকে ঘটনার চরিত্র, সময় বা স্থান বিশ্বাস করে বলতে পারল না—সবকিছু গোপন করে গেল।

।। পঁচিশ ।।

লুসেটার হৃদয় থেকে হেনচার্ডকে মুছে ফেলতে বেশী কিছু দরকার ছিল না। ফারফ্রীর সঙ্গে আর কয়েকবার দ্বিধাজড়িত বেড়াতে আসাই ছিল যথেষ্ট। প্রত্যেকবারই অবশ্য সে মিস টেম্পলম্যান এবং তার বন্ধু দুজনের সঙ্গেই আলাপ করত। কিন্তু এলিজাবেথের উপস্থিতি তেমন অনুভূত হত না। ডোনাল্ড যেন তাকে দেখতেই পেত না। তার ছোট ছোট সুন্দর কথাগুলোর হয়তো এককথায় ভদ্র ছোট্ট উত্তর দিত। যদিও লুসেটার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আতিশয্যের কোনও অভাব ছিল না। মাঝে মাঝে সে এলিজাবেথকেও খুশীর জোয়ারে টেনে আনার চেষ্টা করত। কিন্তু বারবারই এলিজাবেথ বৃত্তের বাইরে তৃতীয় বিন্দুর মত বাইরেই থেকে যেত।

সুসান হেনচার্ডের মেয়েকে ইতিপূর্বে অনেক দুঃখের দিন পেরিয়ে আসতে হয়েছে, কাজেই এ দুঃখ মুখ বুজে সহ্য করছিল সে। ফারফ্রীকে আর সেই ফারফ্রী মনে হচ্ছিল না। যে একদিন তার সঙ্গে নেচেছিল, প্রেম ও বন্ধুত্বের মাঝামাঝি অনুভূতি নিয়ে একদিন হেঁটেছিল পাশে পাশে, ভালবাসাবাসির যে সব দিনগুলোতে কোনও

বেদনার মলিনতা থাকে না।

নির্বিকার দৃষ্টিতে এলিজাবেথ তার শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে দূরে গীর্জার চূড়োর দিকে তাকিয়ে থাকত, যেন তার কপালের লিখন সেখানে পড়ে দেখা যাচ্ছে। অবশেষে একদিন বলল মনে মনে—হুঁ,এতদিনে বুঝলাম ও'র গল্পের দ্বিতীয় পুরুষটি কে?

পরিস্থিতির বৈগুণ্যে হেনচার্ডের আহত অনুভূতি দিনে দিনে আগুনে বাতাস পাওয়ার মত আরও জ্বলে উঠছিল। দিনের পর দিন লুসেটা চুপচাপ থাকায় হেনচার্ড ভেবে দেখল এইভাবে উদাসীন থেকে তাকে নোয়ানো যাবে না। তাই নিজেই একদিন উপস্থিত হল লুসেটার বাড়ী—এলিজাবেথ তখন সেখানে ছিল না।

দৃঢ় গম্ভীর পদক্ষেপে সামনের ঘরগুলো পার হয়ে সে লুসেটার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টি কঠোর এবং তপ্ত। ফারফ্রীর কোমল দৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় চন্দ্রের সঙ্গে সূর্য্যের তফাৎ। লুসেটার বাহারী পোশাক-পত্তর দেখেও হেনচার্ড কিছু আন্দাজ করতে পারছিল না। এতদিন সে তাকে নিজেরই সম্পত্তি ভেবে এসেছে। মনে করে আসার জন্যে লুসেটা তাকে ধন্যবাদ জানাল। এসেই হেনচার্ড নিজেকে সামলে নিল, তারপর বিশ্রীভাবে লুসেটার দিকে তাকিয়ে বলল— কেন এসেছি জান? লুসেটা! আচ্ছা এসবের কি মানে হয়? আমি তো তোমাকে বলেইছি যে, তোমাকে গ্রহণ করতে আমি রাজী। তোমার ভালবাসার বদলে তুমি আমার নাম ব্যবহার করবে এই তো! কিন্তু সেজন্যে সামাজিক আচার আচরণ না মানলে চলে কি করে? এখন সেইসবগুলো ভেবেচিন্তে তুমি যাহোক একটা দিনক্ষণ ঠিক করে ফেল—আর কি?

এখনও সময় হয় নি। লুসেটা এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল।

আচ্ছা, আমারও সেইরকম মনে হয়। কিন্তু তুমি তো জানো লুসেটা! বেচারী সুসান যাওয়ার পর অনেকদিন আমার আর বিয়ে থা করার ইচ্ছে হয় নি। তারপরে আমাদের মধ্যে যতটুকু যা ঘটেছে—আমি একটুও দেরী করি নি। তাছাড়া আমি হয়তো আরও আগে আসতে পারতাম কিন্তু তোমার এত অর্থবিত্ত হয়ে গেছে যে— বলে হেনচার্ড হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে ফেলল। ঘরের চারদিকে দেয়াল এবং আসবাব পত্র দেখতে লাগল—তারপর বলল—আমি তো কখনই ভাবি নি ক্যাস্টর-ব্রিজে কারও বাড়ীতে এত সুন্দর ফার্ণিচার থাকতে পারে!

ঠিকই তো, থাকতে পারে না। উত্তর দিল লুসেটা—আর আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও আসবে না। চার চারটে ঘোড়ার গাড়ী করে আনতে হয়েছে এ'গুলো—

হুম্ মনে হচ্ছে তুমি রাজধানী থেকে আসছ।

তা কেন আসব ?

যাক্, তবুও ভাল। তবে তোমার এতসব আয়োজনের জন্যে আমার একটু অস্বস্তি লাগছে।

কেন ?

এপ্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার ছিল না। হেনচার্ড বলে চলল—দুনিয়ায় তুমি ছাড়া আর কেউ এত সম্পত্তির মালিক হোক তা আমি চাই নি, লুসেটা! আর অন্য কাউকে এত বৈভব মানাবেও না। লুসেটার দিকে তাকাল সে অভিনন্দনের দৃষ্টিতে—তাতে লুসেটা একটু সঙ্কুচিত হ'ল।

দেখেশুনে ভাল লাগার জন্যে কৃতার্থ হলাম। লুসেটার গলায় আনুষ্ঠানিক স্বর। তাই দেখে হেনচার্ডের বিরক্তি লাগল। অন্য কারও তুলনায় এসব ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া খুব তাড়াতাড়িই হয়।

সে তুমি কৃতার্থ হও না হও, আমি যা বলেছি তা সত্যি। অবশ্যি আমার কথাগুলো সোজাসোজি, আর তুমি দেখছি ইদানীং খুব মধুমাখা কথা বলতে শিখেছ।

ও' রকম খোঁচা দিয়ে কথা না বললেই ভাল হয়—লুসেটার চোখে ঝড়ের পূর্বাভাস।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। হেনচার্ডও উঁচু গলায় বলল—তবে আমি তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি। এসেছি এমনই একটা প্রস্তাব নিয়ে যাতে তোমার জার্সির শত্রুদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

ও'সব পুরনো কথা তোলার কি মানে আছে? লুসেটা রেগে গেল। ছোট বয়সে আবেগের তাড়নায় যা করেছি তাকে অন্যলোকে অপরাধ মনে করলেও আমি নিজে মনে মনে নির্দোষ। সেজন্য অনেক কষ্ট ভোগ করেছি একসময়—এখন তাই ভেবে আর নিজের শান্তি নষ্ট করতে চাই না।

ঠিক, ঠিক, সেইজন্যেই আমি বলতে চাইছি, তোমার মান রক্ষার খাতিরে আমাকে বিয়ে করা উচিত—নৈলে জার্সির লোকেরা যা জানে তা এখানেও প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে, তাইনা?

তাদের দু'জনের সম্পর্কে এই প্রথম লুসেটার মতামত গুরুত্ব পেল। কিন্তু এখন সে পিছিয়ে গেছে। কিছুটা বিব্রত হয়ে বলল—আপাততঃ যেমন চলছে চলুক. দু'জনে দু'জনেরই পরিচিত এই পর্য্যন্ত, তারপর দেখা যাক কি হয়! বলে লুসেটা চুপ করল। হেনচার্ডও এত কম পরিচিত নয় যে শূন্যতা পূরণ করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলবে। একটুপরে হেনচার্ড বলল—ও! হাওয়া এখন এইরকম বইছে?

মনে মনে যা ভেবেছিল তাতে যেন সায় অনুভব করছিল।

ঘরের ভেতরটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়ছিল। কেমন যেন হলুদ হলুদ রং। বাইরে তখন গাড়ী বোঝাই হয়ে চলেছে খড়বিচালি—গাড়ীর গায়ে ফারফ্রী নাম লেখা। পাশে পাশে ফারফ্রী চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। লুসেটার মুখখানা যেন আলোয় উছলে উঠল কোনো নারী যেমন তার প্রেমিক পুরুষকে দেখে ভাব গোপন করতে পারে না।

চোখ ফিরিয়ে হেনচার্ডও তাকাল জানালার বাইরে। লুসেটার এই মন-পরিবর্তনের কারণ হয়তো সে সহজেই ধরতে পারত—কিন্তু তা' সে পারল না

আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল, বুঝতে ভুল হয়েছিল আমার। হেনচার্ড অস্থিরভবে পায়চারী করতে লাগল। লুসেটা কিন্তু চাইছিল না যে হেনচার্ড ব্যস্ত হয়ে একটা অস্বাভাবিক কিছু করে ফেলুক তাই একটা আপেল এনে কাটতে দিল সে তাকে।

কিন্তু হেনচার্ড উঠে পড়ল। দরজার দিকে এগিয়ে শুকনো গলায় বলল—না, না, ও'সব আমার জন্যে নয়। লুসেটার চোখে চোখ রেখে বলল—ক্যাস্টারব্রিজে এসেছিলে তুমি আমার ভরসায় আর এখন আমার প্রস্তাবে মত দিতে পারছ না তুমি!

হেনচার্ড সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতে লুসেটা সোফায় এলিয়ে দিল নিজেকে। পরমুহূর্তেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। যাকে খুশী ভালবাসব আমি—আবেগকম্পিত স্বরে বলতে লাগল সে—ওঁকে—ওই বদরাগী গোঁয়ার লোককে বিয়ে করে মরব। আগে যা করেছি করেছি—আর নয়।

কিন্তু হেনচার্ডের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সে আরও বড় কারো কথা চিন্তা করতে পারল না ফারফ্রীকেই দৈবনির্দিষ্ট বলে মেনে নিল। নিজের আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ ছিল না তার, আর পুরনো সমালোচনার ভয়ও ছিল। লুসেটা ভাবল—কপালে যা আছে হবে।

এলিজাবেথ তার স্বচ্ছদৃষ্টিতে ঠিক ধরতে পেরেছিল দুই প্রেমিকের টানাপোড়েনে লুসেটার অবস্থা। এলিজাবেথের বাবা এবং ডোনাল্ড ফারফ্রী দু'জনেরই অনুরাগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল দিনের পর দিন। ফারফ্রীর ক্ষেত্রে যেটা ছিল যৌবনের টান, হেনচার্ডের ক্ষেত্রে ছিল মাঝবয়সী পুরুষের লোভজনিত কৃত্রিম আবেগ।

এই দুটি পুরুষলোকই যে এলিজাবেথ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন—একথা ভেবে মাঝে মাঝে হাসি পেত তার। নিজের তাতে অবহেলার বেদনা লাঘব হয়ে যেত অনেক। লুসেটার আঙ্গুল কেটে গেছে শুনলে দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে পড়ত ভীষণ, অথচ এলিজাবেথ বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেও মামুলী সহানুভূতি জানিয়ে কর্তব্য শেষ হয়ে যেত তাদের। অন্ততঃ হেনচার্ড সম্পর্কে এলিজাবেথের

অভিমান হওয়ার কারণ ছিল। পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মত এমন কি অপরাধ করেছিল সে! আর ফারফ্রী সম্পর্কে চিন্তা করলে সে ভাবত এটাই স্বাভাবিক। যতই হোক, লুসেটার সঙ্গে তার তুলনা চলে না—আকাশে চাঁদ উঠে গেলে অন্য তারাদের মত।

ত্যাগের শিক্ষা এলিজাবেথ পেয়েছিল মনে মনে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির মতই সহজভাবে প্রতিটি দিনকে সে মুছে ফেলছিল জীবন থেকে। দর্শনের বইতে যা লেখা আছে বাস্তব জীবনে তারই প্রতিফলন দেখত সে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল হতাশ না হয়ে বিকল্প কিছু দিয়ে চালিয়ে নেওয়া অনেক ভাল। বারম্বার তার জীবনে এটাই ঘুরে ফিরে ঘটছিল সে যা চাইত তা পেত না, আর যা পেত তা চাইত না। অতএব নির্বিকার সমদৃষ্টি দিয়ে সে পুরনো দিনগুলোর কথা স্মরণ করত—যখন ডোনাল্ড ছিল তার গোপন প্রেমিক, আর ভাবত হয়তো ঈশ্বর অবাঞ্ছিত কিছু রেখেছেন ডোনাল্ডের বদলে এলিজাবেথের জন্যে।

॥ ছাব্বিশ ॥

এক বসন্তের সকালে একদিন হঠাৎ হেনচার্ড আর ফারফ্রীর দেখা হয়ে গেল মুখোমুখি। শহরের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছিল দুজনে। দু'জনেই সবে প্রাতঃরাশ সেরে বেরিয়েছে। রাস্তায় আর জনপ্রাণী নেই। হেনচার্ড লুসেটার কাছ থেকে পাওয়া একটা চিঠি পড়ছিল। তার চিঠিরই উত্তর দিয়েছে লুসেটা। কতক-গুলো ওজর আপত্তি তুলে জানিয়েছে, হেনচার্ড যে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিল সেটা এখুনি সম্ভব হচ্ছে না।

বর্তমান মনকষাকষির পরিপ্রেক্ষিতে ডোনাল্ডের ইচ্ছা ছিল না পুরনো এই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে অথচ মুখ গোমড়া করে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে যায় এটাও ইচ্ছে করছিল না। হেনচার্ডকে দেখে সে মাথা নাড়ল, হেনচার্ডও অনুরূপ উত্তর দিল। দু'জনেই পরস্পরের থেকে বেশ কয়েক পা দূরে সরে গেলে হঠাৎ একটা ডাক শোনা গেল, 'ফারফ্রী!' হেনচার্ড তার দিকে ফিরে ডাকছে।

তোমায় মনে পড়ে—বলল হেনচার্ড যেন মানুষটার উপস্থিতি নয় চিন্তার উপস্থিতিটাই কথা বলছে—মনে পড়ে তোমার, সেই যে তোমায় দ্বিতীয় মহিলার কাহিনী বলেছিলাম—যে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দরুণ পরে

কষ্ট পেয়েছিল।

হুঁ, মনে আছে। বলল ফারফ্রী।

মনে পড়ে, তোমাকে সব বলেছিলাম। কি ভাবে শুরু আর কি ভাবে শেষ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা শোনো, এখন আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি, কিন্তু সে আমাকে বিয়ে করতে রাজী নয়। তাহলে বল তো তার সম্পর্কে কি করা যায়? তোমাকেই ভার দিলাম।

ভাল কথা! এ'রপরে আপনার আর কিছু করবার থাকল না। ফারফ্রী উৎসাহভরে বলল।

হুঁ, ঠিকই বলেছ। বলে হেনচার্ড হাঁটতে শুরু করল।

হেনচার্ড যেহেতু একটা চিঠি পড়তে পড়তে মুখ তুলে ফারফ্রীকে এই প্রশ্নগুলো করল তাই সেই নারী যে লুসেটা হতে পারে এমন কোনও সন্দেহ ফারফ্রীর মনে জাগল না। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানের লুসেটা আর হেনচার্ডের কাহিনীর সেই নারীর মধ্যে এত তফাৎ যে লুসেটার পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে ফারফ্রীর কোন আগ্রহ না থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। আর হেনচার্ড এই ভেবে আশ্বস্ত হল যে ফারফ্রীর কথাগুলো কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের মত নয়।

কিন্তু কেউ একজন প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্যে নেমেছে এ ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না তার মনে। লুসেটার চালচলন দেখলেই সেটা বোঝা যায়। এমন কি তার কলমের আঁচড়েই সেটা ফুটে বেরুচ্ছে। কোন একটা বিপরীত শক্তি নিশ্চয়ই কাজ করছে, যেজন্যে সে কাছে আসতে চাইলেও আসতে পারছে না। এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এটা লুসেটার খেয়াল মাত্র নয়। তার বাড়ীর জানালার দিকে তাকালে মনে হয় হেনচার্ড সেখানে অবাঞ্ছিত। দরজার পর্দার দিকে তাকালে মনে হয় স্বচতুর উপায়ে তারা কোনও একজনের উপস্থিতি গোপন করে রেখেছে। সেটি যে কে—সত্যি সত্যিই ফারফ্রী না অন্য কেউ—সেটা খুঁজে বার করার জন্যেই হেনচার্ড আরও উঠেপড়ে চেষ্টা করতে লাগল লুসেটার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সফলও হল অবশেষে।

চা খেতে খেতে আর আলাপ করতে করতে হেনচার্ড খুব সন্তর্পণে একটি প্রশ্ন জেনে নেওয়ার চেষ্টা করল, লুসেটা ফারফ্রীকে চেনে কিনা।

হ্যাঁ, খুব ভালমতই চেনে, জানাল লুসেটা। আসলে ক্যাস্টারব্রিজে এমন কোনও লোকই নেই যাকে সে চেনে না। চিনতে তাকে হবেই শহরের এমনই এলাকায়, তথা এলাকার কেন্দ্রে বাস করে সে।

বেশ ভাল ছোকরা। বলল হেনচার্ড।

হ্যাঁ। লুসেটা উত্তর দিল।

আমরা দু'জনেই জানি তাকে—এলিজাবেথ আবার জুড়ে দিল। কিছুটা তার সঙ্গিনীর আড়ষ্টতা কাটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

এমন সময়ে দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ হল। ঠিক তিনবার টোকা পড়ল, তারপর হাল্কা একবার ছোঁয়া।

এ' ধরনের টোকা দেওয়া মানে আধা-আধি। অর্থাৎ সাদাসিধে আর ভদ্রলোকের মাঝামাঝি—আড়ৎদার নিজের মনে মনে বলল—কাজেই এ যদি সে হয় তো আশ্চর্য্য হব না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সত্যিসত্যিই ডোনাল্ড এসে ঢুকল ভিতরে।

লুসেটার আহ্লাদীপনা ও আদুরে ভাব দেখে হেনচার্ডের সন্দেহ বেড়ে গেল। কিন্তু সুনিশ্চিত কোনও ধারণা সে করতে পারছিল না। এই নারীর সঙ্গে তার অদ্ভুত সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে সে মনে মনে ফুঁসে উঠছিল। এই মেয়েলোকটিই একদা পরিণত প্রেমের মুহূর্ত্তে ত্যাগ করে যাওয়ার জন্যে তাকে তিরস্কার করেছে। সেই পুরনো দিনের কথা মনে করে নিজের দাবী জানিয়ে এসেছে বারবার, তারই জন্যে অপেক্ষা করে থেকেছে এতদিন, প্রথম প্রথম তাকে সংশোধনের সুযোগও দিয়েছিল। এতদিন ধরে তারই জন্যে সে মিথ্যা অভিনয় করে এসেছে। এখন তার চায়ের টেবিলে বসে আছে, হেনচার্ড তারই মনোযোগে আকর্ষণ করার জন্যে। সেই রাগে অপর ভদ্রলোকটিকে মনে মনে ভাবছে বদমাস—ঠিক যেমনটি হত অন্য কোনও বোকা প্রেমিকের বেলায়!

অন্ধকার-হয়ে-আসা-টেবিলের সামনে তারা পাশাপাশি বসেছিল শক্ত অনড় হয়ে, যেন টাস্ক্যানির চিত্রে আঁকা এম্মাউসে নৈশ-আহাররত দুই শিষ্য। তাদের উল্টোদিকে তৃতীয় এবং আলোকিত চেহারাটি লুসেটার। এ খেলায় এলিজাবেথের কোনও অংশ নেই। তফাতে দাঁড়িয়ে সে এদের দেখছিল যেমন ভাবে খাতা-কলম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যীশুর বাণী প্রচারকরা। দেখছিল যে, দীর্ঘ সময় কেটে যাচ্ছে নির্বাকভাবে, চামচ চীনামাটির স্পর্শে বাহ্যিক সব কিছু চাপা পড়ে গেছে। জানালার বাইরে রাস্তায় কারও গোড়ালি মাটিতে পড়ল, একটা ঘোড়ার গাড়ী বা ঠেলাগাড়ী চলে গেল, গাড়োয়ান শিস দিচ্ছে, উল্টোদিকের রাস্তার কল থেকে জল উপচে পড়ছে কোনও গৃহস্থের বালতিতে। প্রতিবেশীরা পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করছে, ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ করে কারও মালবোঝাই গাড়ী এগিয়ে চলল।

মাখন-রুটি আর একটু দিই? হেনচার্ড এবং ফারফ্রী দুজনকেই বলল লুসেটা। দুজনের ঠিক মধ্যিখানে একপ্লেট-ভর্তি রুটির টুকরো এগিয়ে ধরল। এক টুকরো

রুটির একপ্রান্ত হাত দিয়ে ধরল হেনচার্ড—অপর প্রান্ত তখন ডোনাল্ডের হাতে। দু'জনেই ভাবছিল, রুটিটা তার উদ্দেশ্যেই এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'জনের কেউই অপরকে ছাড়তে রাজী নয়। অতএব দু'খণ্ড হয়ে ছিঁড়ে গেল রুটির টুকরোটি।

আহা,-হা, দুঃখিত!—ভয় পেয়ে জোরে জোরে বলল লুসেটা। ফারফ্রী একটু হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রেমে সে এতখানি নিমজ্জিত যে, ঘটনাটিকে দুঃখজনক ভাবেই নিতে বাধ্য হল সে।

এলিজাবেথ নিজের মনে বলল—তিনজনেরই কাণ্ড দেখলে হাসি পায়।

একরাশ অনুমান নিয়ে বেরিয়ে গেল হেনচার্ড। অথচ প্রমাণ বলতে কিছুই ছিল না হাতে যে ফারফ্রীই তার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই সে মনস্থিরও করতে পারছিল না। কিন্তু এলিজাবেথের কাছে এটা এখন জলের মত পরিষ্কার যে লুসেটা এবং ডোনাল্ড অবিচ্ছেদ্য প্রেমের টানে বন্দী। অনেকবার না তাকানোর চেষ্টা করেও, লুসেটা ফারফ্রীর চোখের দিকে না তাকিয়ে পারছিল না, যেমনভাবে পাখী তার বাসার দিকে তাকায়। কিন্তু সান্ধ্য আলোয় এত খুঁটিনাটি দেখার মত ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ ছিল না হেনচার্ডের। কীট পতঙ্গের আওয়াজ যেমন মানুষের কানে পৌছয় না।

হেনচার্ড মনে মনে বিচলিত হল। এতকাল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ব্যবসার জগতে সীমাবদ্ধ। এখন সেই সঙ্গে যুক্ত হল প্রেমিক হিসাবে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা। বাহ্যিক বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত হল অন্তরের আগুন।

তারই প্রতিক্রিয়ায় হেনচার্ড জোপকে ডেকে পাঠাল। ফারফ্রী এসে পড়তে ম্যানেজারের চাকরি থেকে লোকটাকে বঞ্চিত করেছিল সে আগে। রাস্তাঘাটে হেনচার্ড মাঝেমাঝেই দেখত তাকে, কাপড় জামা দেখে মনে হত লোকটা দুরবস্থায় আছে! হেনচার্ড শুনেছিল, শহরের পেছনদিককার বস্তি এলাকা—মিক্সেন লেনে সে থাকে এখন। ক্যাস্টারব্রিজে যার কোথাও কিছু জোটে না, সেই ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অতএব লোকটি এখন আর ছোটখাটো ব্যাপারে কিছু মনে করবে না।

সন্ধ্যের পরে এল জোপ। উঠোনের দিককার ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। তারপর খড় বিচুলির মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে কোন রকমে আন্দাজ করে অফিস ঘরে এসে ঢুকল। সেখানে তখন হেনচার্ড বসে আছে তারই অপেক্ষায়।

আমার একজন দেখাশুনা করার লোক দরকার—বলল আড়ৎদার—তুমি কি পারবে?

তাই বলে মাগনা খাটতে পারব না।

না, কত চাও তুমি?

জোপ পারিশ্রমিক যা দাবী করল তা খুবই সাধারণ।

কবে আসতে পারবে?

আজ থেকেই! এক্ষুনি আসতে পারি—বলল জোপ। রাস্তার মোড়ে পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত সে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত আর হেনচার্ডকে দেখত বাজারে ঘুরতে। অলস ব্যক্তি নিজেকে যত বুঝতে পারুক আর না পারুক, কর্মব্যস্ত লোকদের সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারে খুব সহজেই। জোপের ক্ষেত্রে আরও একটা সুবিধা ছিল—সমগ্র ক্যাস্টারব্রিজে হেনচার্ড এবং মৌনী এলিজাবেথ ছাড়া একমাত্র সেই জানত যে লুসেটার আদিনিবাস ছিল জার্সিতে। লুসেটা অবশ্যি প্রচার করত যে সে বাথ থেকে এসেছে।

জার্সি জায়গাটাও আমি চিনি—সে বলল—সেখানেও ছিলাম আমি, যখন আপনার ব্যবসার কাজটাজ চলত। তাছাড়া আপনাকেও কয়েক বার দেখেছি সেখানে।

তাই নাকি? বেশ বেশ। তাহলে মিটেই গেল। প্রথমবারে যখন এসেছিলে তখনকার কাগজপত্র যা দেখেছি—তাতেই হবে।

প্রয়োজনের সময় মানুষের চরিত্র যে নিম্নগামীও হতে পারে, একথা বোধহয় হেনচার্ডের খেয়াল ছিল না। জোপ বলল—ধন্যবাদ। সচেতনভাবে সে অনুভব করতে লাগল যে, এতদিনে এখানে তার বসবাস করার অধিকার জন্মেছে।

এখন শোনো—হেনচার্ড বলতে লাগল, জোপের মুখের উপরে তার কঠোর দৃষ্টি দৃঢ় হয়ে বসেছে—এই এলাকার সবচেয়ে বড় আড়ৎদার হিসেবে একটা জিনিসই আমার দরকার। তা হল—ঐ যে স্কচম্যানটি শহরের যাবতীয় কারবার কব্জা করে নিতে বসেছে—ওকে হঠাতে হবে। বুঝলে? আমরা দু'জনে কক্ষনো পাশাপাশি থাকতে পারি না—এটাই হ'ল চরম এবং শেষ কথা।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বলল জোপ।

আমি কিন্তু কোনো অসদুপায়ে কিছু করতে চাই না! হেনচার্ড বলতে লাগল—যথার্থ সৎভাবে পরিশ্রম করে—অথচ এমনই কঠিন হবে তা—যে সমস্ত চাষীদের মধ্যে ওর ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে মাটিতে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। উপোস করিয়ে মারতে হবে ওকে। আমার সে সামর্থ্য আছে, পুঁজি আছে বুঝলে ইচ্ছে করলে আমি তা পারি।

এই কথাগুলোই আমিও ভাবছিলাম—নতুন গোমস্তা বলল। ফারফ্রী যে একদা তার স্থান দখল করে নিয়েছিল এজন্য জোপের রাগ ছিল তার উপরে খুব। এই কারণেই তাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার হবার সম্ভাবনা যেমন ছিল, তেমনিই হেনচার্ডের পক্ষে তাকে নিয়োগ করার ঝুঁকিও ছিল অনেক।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, সে আরও বলতে লাগল, যে ও বোধহয় আগামী বছরটাকে আরশির মধ্যে দেখতে পায়। সেইজন্যে যা কিছুতে হাত দিক—লাভ ওর হবেই হবে।

ও আসলে সাধারণ ব্যবসাদারদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু আমরা ওকে ধরে ফেলবই। ওর থেকে কম দামে বিক্রি করব আর কিনব ওর থেকে বেশী দামে। দেখি কি করে টিঁকে থাকে ও।

তারপরে বিস্তারিত আলোচনা করে ঠিক করল তারা কিভাবে কি করা যাবে। অনেক রাত্রে ভাঙল সে আলোচনা।

এলিজাবেথ কোনো আকস্মিক উপায়ে জানতে পারল যে তার বাবা জোপকে কাজ দিয়েছে। কিন্তু লোকটি যে ঐ কাজে একেবারেই অচল এটাই ছিল তার নিশ্চিত ধারণা। হেনচার্ড অসন্তুষ্ট হবে জেনেও দেখা হওয়া মাত্রই এই কথা সে জানাল বাবাকে। কিন্তু তাতে কিছুই ফল হল না। হেনচার্ড এক তাড়া দিয়ে তার সমস্ত যুক্তি চাপা দিয়ে দিল।

এবারের আবহাওয়া তাদের পরিকল্পনার অনুকূল মনে হচ্ছিল। এখনও পর্যন্ত গমের কারবারে বাইরের প্রতিযোগিতা এসে হাজির হয় নি। সেই আদ্যিকালের মতই গমের বাজার ওঠানামা করত—স্থানীয় কারণগুলোর ভিত্তিতে। ফলন খারাপ হওয়ার লক্ষণ থাকলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো গমের বাজার দ্বিগুণ হয়ে যেত। আবার ভাল ফসলের সম্ভাবনা থাকলে খুব তাড়াতাড়ি দর পড়ে যেত। দরদাম যেন মহাকালের রাস্তাঘাট—হঠাৎ কখনও উঠে যায়—এবং সর্বদাই স্থানীয় পরিবেশকে প্রতিফলিত করে।

চাষীর রোজগার নির্ভর করে তার ফসল ফলানোর ওপর—আর গমের ফলন নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপর। কাজেই চাষী যেন রক্তমাংসের পরিমাপ—যন্ত্রের মত কাজ করে—আকাশে এবং বাতাসে তার মাপনী ছড়িয়ে আছে। স্থানীয় পরিবেশ এবং কার্যকারণগুলোই তার কাছে সব—এ'র বাইরের যা কিছু তা উপেক্ষার বস্তু। চাষী ছাড়াও, সাধারণ গ্রামবাসীদের চোখে তখনকারদিনে আবহাওয়া-গণকরা ছিল এখনকার তুলনায় দেবতাতুল্য। বাস্তবিক, গ্রাম্য জীবনে এ'র যে কি গুরুত্ব ছিল, তা এখন বসে অনুমান করা সম্ভব নয়। ঝড় বৃষ্টি দেখলে তারা হাহুতাশ করতে করতে হত্যে দিয়ে পড়ত—যেন গরীব হওয়াটা তাদের পাপ, আর সেই পাপের শাস্তি দিতে এসেছে কোন অ্যালাষ্টর।

গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময় থেকেই তারা আবহাওয়ার উপরে নজর রাখত। রোদ্দুর দেখলে আনন্দ হত, ছিপছিপে বৃষ্টিতে ভাল লাগত, আর সপ্তাহের পর সপ্তাহ

ধরে ঝড়বৃষ্টি দেখলে বোকা হয়ে যেত তারা। এখন যে আবহাওয়া দেখলে মনটা গুমরে ওঠে, তখনকার দিনে মনে হত দুভার্গ্যজনক।

জুনমাস এসে গেল, খুব খারাপ কাটছিল দিনগুলো। ক্যাস্টারব্রিজ এমনই একটা জায়গা যে আশপাশের লগোয়া গ্রামগুলির আশা-আকাঙ্খা এখানে প্রতিফলিত হয়। এবারে ক্যাস্টারব্রিজের খুব মনমরা অবস্থা। দোকানে দোকানে নতুন পণ্য সাজিয়ে রাখার কথা—তা না হয়ে গত বছরের বাতিল জিনিসগুলোই আবার এসে হাজির হতে লাগল। পুরনো সব যন্ত্রপাতি, ময়লা-ধরা পোষাক-আষাক, ঝেড়ে-মুছে নতুনের মত সাজিয়ে রাখা হচ্ছে আবার।

জোপের সমর্থনে হেনচার্ড এক ভয়ানক মৎলব আঁটল। এবং তার ভিত্তিতেই ফারফ্রী-সংক্রান্ত পরিকল্পনা ঠিক করল। কিন্তু কাজে নামার আগে একবার ইচ্ছা হচ্ছিল এখন যেটাকে মাত্র সম্ভাবনা বলে সে আঁচ করতে পারছে সে সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হয়ে নেয়। এইসব একগুঁয়ে লোকেরা যেমন হয়ে থাকে, হেনচার্ডও ছিল কুসংস্কারে বিশ্বাসী। মনে মনে সে এমন একটা যুক্তি করল যা এমনকি জোপের কাছেও খুলে বলল না।

শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে, এক অজ পাড়া গাঁয়ে বাস করত এক আবহাওয়া-গণক। এমনই সে গাঁ যার সঙ্গে তুলনা করলে অন্য গ্রামগুলোকে শহর বলে মনে হবে। গণকের যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ভালরকম। তার বাড়ীতে যাওয়ার রাস্তা যেমন বাঁকাচোরা, তেমনি জলকাদায় ভর্তি—এমন কি এই শুকনোর দিনেও যাওয়া কষ্টকর। একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে, আইভিলতা আর করেল গাছের পাতায় চটর-পটর শব্দ হচ্ছে। পথে যারা বেরিয়েছে তাদের নাক, কান, মুখ সব ঢাকা। এমনই একটা আপাদ-মস্তক মুড়ি দেওয়া লোককে সেই গণকের কুটিরের দিকে হাঁটতে দেখা গেল। বড় রাস্তা এখন সরু গলিতে পরিণত হয়েছে, গলির অবস্থা হয়েছে গাড়ীর চাকার দাগের মত, আর পায়ে-চলা পথ প্রায় উঠে যাওয়ার দাখিল। এই নিঃসঙ্গ পদচারীর মাঝেমাঝেই পা পিছলে যাচ্ছিল, এখানে ওখানে বাঁশের গোড়া ইত্যাদিতে হোঁচট খাচ্ছিল—অবশেষে কোনরকমে সেই বাড়ীতে এসে পৌছান গেল। বাড়ীটার চারদিকে উঁচু ঘন গাছের বেড়া। অন্য বাড়ীর তুলনায় আকারে বেশ বড়ই। গৃহকর্তার নিজের হাতে তৈরী মাটির দেওয়াল, নিজেরই ছাওয়া। এই গৃহেই সে চিরকাল বাস করে আসছে—এবং মৃত্যুও হয়তো এখানেই হবে।

লোকটা কিভাবে তার জীবিকা-নির্বাহ করত বলা মুস্কিল। প্রতিবেশীরা সকলেই বলত ওর গণনা ইত্যাদি সব বুজরুকি। কিন্তু সেটা ওপর ওপর। গোপনে বা অন্তরে অন্তরে কেউ অবিশ্বাস করত কিনা সন্দেহ। যখনই তারা তার মতামত

শুনতে যেত, বলত, 'শখ করে যাচ্ছি' আর যখন দক্ষিণা বা প্রাণামী কিছু দিত, বলত 'এই ক্রিসমাস বা ক্যাণ্ডলমাস উপলক্ষে যৎসামান্য কিছু উপহার'।

লোকটা চাইত তার যজমানরা ফালতু ঠাট্টা না করে সত্যিকথাটা আরেকটু স্বীকার করুক। তবে এইসব ওপর ওপর ব্যঙ্গে তার কিছু আসত যেত না, কারণ দৃঢ় বিশ্বাসটা তার জানা ছিল। কোনরকমে চলে যাচ্ছিল তার। অনিচ্ছায় হোক বা ইচ্ছা করেই হোক লোকে কিছু কিছু পয়সাকড়ি দিত তাকে। মাঝে মাঝে সে আশ্চর্য্য হয়ে যেত, লোকে তার এই বিদ্যায় গোপনে এত আস্থা রাখে অথচ মুখে তা স্বীকার করে না। আবার এরাই গীর্জায় গেলে মুখে যত বড় বড় কথা বলুক, অন্তরে তা বিশ্বাস করে না।

খ্যাতির জন্যে লোকে তাকে আড়ালে বলত 'ঐ ব্যাটা' আর সামনাসামনি বলত "মিঃ" ফল।

বাড়ীতে ঢুকবার পথ বেড়া দিয়ে মাথার উপরে খিলান করা। যেন দেওয়াল ফুঁড়ে দরজা বসান হয়েছে। দরজার বাইরে এই দীর্ঘদেহী আগন্তুক দাঁড়াল, রুমাল দিয়ে নিজের মুখ ব্যাণ্ডেজ করার মত বাঁধল, যেন সে দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগছে, তারপর পথ বেয়ে এগিয়ে চলল। জানালার খড়খড়িগুলো বন্ধ করা ছিল না। ঘরের ভেতরে গণকঠাকুরকে রাত্রির খাবার সাজাতে দেখা যাচ্ছিল।

দরজায় টোকা শুনে ফল এগিয়ে এল, হাতে তার বাতির আলো দেখে আগন্তুক একপা পিছিয়ে গেল এবং খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাবে বলল, 'একটু কথা ছিল।' অপর-পক্ষের আমন্ত্রণের উত্তরে গ্রাম্যপ্রথামত সে আবার বলল, 'না এখান থেকেই হবে'। অগত্যা গৃহকর্তার বাইরে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। বাতিটা সে কুলুঙ্গিতে রেখে দেয়ালের গায়ে পেরেক থেকে টুপিটা নিল। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল আগন্তুকের কাছে।

'অনেকদিন থেকে শুনেছি, তুমি নাকি—ইয়ে গুনতে পার?' নিজের পরিচয় যথাসম্ভব গোপন করার চেষ্টা করে বলল আগন্তুক।

'ঠিকই হয়তো শুনেছেন, মিঃ হেনচার্ড!' আবহাওয়া-গণক উত্তর দিল।

'কি বললে? আমাকে ও নামে ডাকলে কেন?' চমকে উঠে বলল আগন্তুক।

'কারণ ওটাই তো আপনার নাম। আপনি আসবেন বুঝতে পেরেই তো আমি অপেক্ষা করছি—আর আপনার কষ্ট হবে জেনে ঐ দেখুন দু'জনের মত খাওয়ার অয়োজন করেছি'। দরজা খুলে দিতেই সামনে দেখা গেল খাওয়ার টেবিলে একটি দ্বিতীয় চেয়ার, ছুরি-কাঁটা, থালা সাজানো রয়েছে।

হেনচার্ড নিজেকে ভাবছিল সলের মত, যেন স্যামুয়েলের অভ্যর্থনা গ্রহণ করছে।

কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল, তারপর নির্জীবতার ছদ্মবেশ ত্যাগ করে বলল, 'তাহলে আমি ঠিকই এসেছি।........আচ্ছা ! তুমি কি আঁচিল সারাতে পার ?'

'বিনা আয়াসে পারি।'

'অমঙ্গল দূর করতে পার ?'

'করেছি তো। উপযুক্ত দাম পেলে নিশ্চয়ই পারি। সারা দিন সারারাত কুনো ব্যাঙের থলি পরে থাকতে হবে।'

'আবহাওয়া গুণে বলতে পার ?'

'চেষ্টা করলে এবং সময় পেলে, নিশ্চয়ই পারি।'

'তাহলে ধরো' বলল হেনচার্ড, 'এই এক মোহর মুদ্রা দিলাম। এখন বলো তো ফসল-কাটার পক্ষটি কেমন যাবে ? কখন জানতে পারব আমি ?'

'সে তো আমি গুণেই রেখেছি, এখুনি আপনাকে বলে দিচ্ছি।' (প্রকৃতপক্ষে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাঁচজন চাষী এই একই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে এ'র আগেই ঘুরে গেছে।) সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মেঘ, বায়ু, বৃক্ষ, তৃণ, আলোর জ্যোতি, চড়ুই পাখী, পাতার গন্ধ, আরও বলতে গেলে, বিড়ালের চোখ, দাঁড়কাক, জোঁক, মাকড়সা এবং গুবরে-পোকা সবকিছু গণনা করে, আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় পক্ষে—ঝড় এবং বৃষ্টি হবে।'

'একেবারে নিশ্চিত করে বলছ তো ?,

'এই অনিশ্চিত জগতে যতখানি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। এবারের শরৎকালে যেন মনে হবে, ইংল্যাণ্ডে না বাস করে অন্য কোথাও বাস করছি। আপনার জন্যে সব ছক কেটে দেখিয়ে দিতে পারি।'

'না, না, দরকার নেই' বলল হেনচার্ড, 'এসব গোনা-গাঁথা আমি অত বিশ্বাস করি না। অনেক ভেবেচিন্তে এলাম একবার, তবে আমি—'

'না, না, আপনি বিশ্বাস করেন না বোঝাই যাচ্ছে, ব্যাটা বলল একটু যেন অবজ্ঞার সুরে 'আমাকে মোহরটা দিলেন, কারণ আপনার অনেক আছে তো তাই। তা যাকগে যাক এখন চলুন খাবারটা জুড়িয়ে গেল যে খেয়ে যাবেন তো এখানে ?'

হেনচার্ডের খুব ইচ্ছে করছিল খেয়ে যায়। মাংসের ঝোলের গন্ধ ঘর পেরিয়ে বাগানে ভেসে বেড়াচ্ছে। পেঁয়াজ, লঙ্কা, মাংস, আর তরকারী প্রত্যিটা ঘ্রাণই যেন আলাদা। কিন্তু লোকটার সঙ্গে একসাথে ঢলাঢলি করে খাওয়া মানে, প্রকারান্তরে এর উমেদারী করা। এটা হেনচার্ডের পছন্দ হল না, তাই চলে গেল সে।

পরের শনিবারেই হেনচার্ড এত বিরাট পরিমাণ গম কিনে ফেলল যে তার প্রতিবেশী—একজন ডাক্তার, একজন উকিল এবং একজন মদের দোকানদারের কাছে

ব্যাপারটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। পরের শনিবারেও, এবং সুযোগ পেলেই সে গম কিনে রাখতে আরম্ভ করল। তার গুদামগুলো সব যখন ভর্তি হয়ে গেল, ক্যাস্টারব্রিজের আবহাওয়া-নির্দেশক মোরগগুলোর মুণ্ডু গেল ঘুরে—যেন এতদিনকার দক্ষিণ-পশ্চিমা বাতাসে তারা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া বদলে গেল। রোদ্দুর ছিল এতদিন টিনের রংয়ের মত ম্যাড়মেড়ে এখন হয়ে উঠল স্ফটিকের মত। আকাশের চেহারা ঝলমলে হয়ে উঠল। ফসল ভাল হওয়ার লক্ষণ নিশ্চিত বলে মনে হল—অতএব দামও পড়ে যেতে লাগল।

এই পরিবর্তন অন্যদের কাছে যতই সুখকর হোক না কেন, গোঁয়ার আড়ৎদারের উপরে এর ফলাফল হল ভয়ানক। তার মনে পড়ে গেল পুরনো একটা কথা—তাস হাতে নিয়ে জুয়াখেলায় বাজি-ধরা যেমন, তেমনি মাঠের ফসল নিয়ে কিছু বলাও জুয়াখেলার মত।

খারাপ আবহাওয়ার হয়ে বাজি ধরেছিল হেনচার্ড। সে হেরে গেল। জোয়ার দেখে ভেবেছিল বন্যা আসছে। এত বেশী পরিমাণে সে গম কিনে ফেলেছিল যে, হিসেবপত্তর না মিটিয়ে দীর্ঘদিন চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব ছিল না। অতএব পয়সাকড়ি মেটাতে গিয়ে সেই গমই আবার বিক্রী করতে বাধ্য হল। সে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এবং কেনাদামের থেকে অনেক কম মূল্যে। সে যে মাল কিনেছিল তার অনেক সে চোখেই দেখে নি। অর্থাৎ চাষীর গাদা থেকে সে মাল তখনো তার গুদামে ওঠে নি। কয়েকমাইল দূরে চাষীর বাড়ী থেকেই আবার বিক্রী হয়ে গেল। বহু টাকা লোকসান খেল হেনচার্ড।

আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে একদিন তপ্ত রোদ্দুরের মধ্যে ফারফ্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার বাজার এলাকায়। ফারফ্রী হেনচার্ডের বেচাকেনার কথা জানত। (যদিও এসবের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে তার ব্যবসায় মার খাওয়ানো, সে সম্পর্কে কিছু জানত না)। সে সহানুভূতি প্রকাশ করল। শহরের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় সেই যে দেখা হয়েছিল তাদের, তারপর থেকে মাঝেমাঝে এক-আধটা কথাবার্তা হত দুজনের মধ্যে। প্রথমে মুহূর্তের জন্যে মনে হল যে হেনচার্ড বেশ দুঃখবোধ করছে, কিন্তু হঠাৎ যেন তার মধ্যে এক ঔদাসীন্য ফুটে উঠল—

ও! না না, এমন কিছু না।—বেশ চেঁচিয়ে তীব্র সৌজন্যের সঙ্গে বলল সে, অমন তো ঘটেই থাকে; তাই না? আমি জানি লোকে বলছে আমি নাকি খুব মার খেয়ে গিয়েছি—তাতে হয়েছেটা কি? তবে লোকে যত বলছে, ততকিছুই হয় নি। আরে—দূর! কারবার করতে গেলে তার লাভ-লোকসান থাকবে না?

কিন্তু সেদিন তাকে এমন একটি কারণে ক্যাস্টারব্রিজের ব্যাঙ্কে গিয়ে ঢুকতে হল,

যে কারণে ইতিপূর্বে কখনও সে ব্যাঙ্কে প্রবেশ করেনি। অনেকক্ষণ যাবৎ কষ্ট সহ্য করে বসে থাকতে হল ব্যাঙ্ক মালিকের ঘরে। তার কিছুদিন পরেই শহরে রটে গেল যে, এখানে এবং এর আশেপাশে হেনচার্ডের যত সম্পত্তি বা গমের আড়ৎ আছে, সে সবই নাকি ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধকী আছে।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়েই তার দেখা হল জোপের সাথে। সকালবেলা ফারফ্রীর সহানুভূতি যে বেদনার হুল ফোটাচ্ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হল এতক্ষণের করুণ লেনদেন। এসবই হেনচার্ডের কাছে তীব্র ব্যাঙ্গের ছদ্মরূপ বলে মনে হচ্ছিল—অতএব সেই মুহূর্তে জোপের কপালেও তেমনই একটি অভ্যর্থনা জুটল। জোপ মাথার থেকে টুপিটা খুলে কপাল মুছছিল আর পরিচিত কাউকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, 'আঃ, বেশ ভাল দিনটা তো।'

'খুব কপাল মুছছ আর বলছ 'ভাল 'দিন'—এঁ্যা। চাপা গলায় ফুঁসতে ফুঁসতে বলল হেনচার্ড। জোপকে সে প্রায় ঠেসে ধরল ব্যাঙ্কের দেয়ালের গায়ে। তোমার কথায় না ফেঁসে গেলে, আজ আমার পক্ষে ভাল দিনই হ'ত বটে! কি হে! তখন একটা সৎপরামর্শ দিতে পার নি এঁ্যা? তোমার অথবা কারও থেকে একবার একটু বাধা পেলেই আমি অন্যরকম ভেবে দেখতাম! আবহাওয়া কেমন যাবে—সে কি যতক্ষণ না কেটে যায়, বলা সম্ভব?

আমি তো আপনাকে যুক্তি দিয়েছিলাম, আপনি যেটা ভাল বুঝবেন করবেন।

বাঃ বাঃ, খুব উপকার করেছ, যত তাড়াতাড়ি অন্য কারও উপকারে লাগতে পার, ততই মঙ্গল। এইরকম আরও কিছু কথাবার্তা বলে, হেনচার্ড তখুনি ঐ স্থানেই তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দিল। তারপর হনহন করে হাঁটতে শুরু করল।

এজন্যে কিন্তু দুঃখ পেতে হবে আপনাকে, মনে রাখবেন! বিবর্ণ মুখে বলল জোপ হেনচার্ডকে উদ্দেশ্য করে। ততক্ষণে সে বাজারের বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে।

।। সাতাশ ।।

ফসল ওঠা সবে শুরু হয়েছে। দরটা এখন কম, তাই ফারফ্রী কিনে চলেছিল। সাধারণতঃ এমনটাই হয়ে থাকে; সব স্থানীয় চাষীরাই আবহাওয়া সম্পর্কে আঁচ করে নিয়ে দুমদাম সব বিক্রী করে দিচ্ছিল। তারা ধরে নিয়েছিল এবারের ফসল

বেশ ভালই হবে। তাই ফারফ্রী অত্যন্ত সস্তা দামে বিগত বছরের গম যত পড়ে ছিল সব কিনে নিল। পরিমাণে খুব বেশী না হলেও গতবছরের গমটা খুব ভাল শুকনো এবং পরিষ্কার।

হেনচার্ডযখন প্রায় পথে বসেছে, নির্বোধের মত যা কিনেছিল বিপুল ক্ষতি স্বীকার করেও তা বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়েছে, সেই সময়েই ফসল উঠতে শুরু করল। প্রথম তিনটি দিন মাত্র আকাশ খুব পরিষ্কার গেল, তারপর হেনচার্ড ভাবল—তবে কি সেই ব্যাটা গণকঠাকুরের কথাই ঠিক হবে নাকি।

আসলে হল কি, মাঝমাঠে যেই কাস্তেগুলো ঝলক দিয়ে উঠতে লাগল আবহাওয়া যেন পুষ্টির অভাবে হঠাৎ একটু মুষড়ে পড়ার মত হয়ে গেল। জোরে জোরে উষ্ণ বাতাস বইতে লাগল। দু'একটি বৃষ্টির ফোঁটাও এসে পড়তে লাগল জানালার কাচে। সূর্য্যের আলো যেন হঠাৎ পাখার বাতাসের মত কখনো হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, আবার কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ।

সেইদিন থেকেই মনে হল—আবহাওয়া ঠিক কেমন যাবে বলা মুস্কিল—হয়তো এত ভাল নাও যেতে পারে। হেনচার্ড যদি আরও খানিক সবুর করত, তবে লাভ না হোক, লোকসান অন্ততঃ সামাল দিতে পারত কিছুটা। কিন্তু তার চরিত্রের এমনই বেগ যে ধৈর্য্য বলে কিছু ছিল না। এখন এই পরিবর্তন দেখে সে চুপ করে থাকল। মনে মনে এমন এক চিন্তার উদয় হল যে কোনো শক্তি বুঝি তার বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে।

আশ্চর্য্য!—হেনচার্ড এক অজানা আতঙ্কের বশে নিজের মনে বলত,—আশ্চর্য্য লাগে আমার। কেউ কি মোম দিয়ে আমার মূর্তি তৈরী করে আগুনে পোড়াচ্ছে! নাকি আমার নামে কোনও অপবিত্র জল ছেটাচ্ছে! আমি অবশ্যি তেমন কিছুতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু তাহলেও—যদি কেউ কোথাও করে থাকে, বলা তো যায় না!—এমনকি এটা ভাবা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না যে সেই ব্যক্তিটি ফারফ্রী। হেনচার্ড যখন বিমর্ষ বিষাদে ডুবে থাকত—তখনই এইসব কুসংস্কারগুলো এসে ঘিরে ধরত তাকে। দৃষ্টিভঙ্গির যাবতীয় উদারতা নিমেষে কোথায় উবে যেত।

ইতিমধ্যে ডোনাল্ড ফারফ্রী উন্নতি করছিল বেশ। সে যখন মাল কিনেছিল তখন পড়তি বাজার। এখন মোটামুটি যে দরদাম দাঁড়িয়েছে তাতে বিক্রী করলেও তার ঘরে বেশ দু'পয়সা আসবে। যেখানে একটা-দুটো মোহর ছিল তার ঘরে, সেখানে ঘড়া ভর্তি মোহর জমে গেল তার।

আরেব্বাবা এ যে দেখছি মেয়র হয়ে বসবে।—হেনচার্ড নিজের মনে বলত।

সত্যিসত্যি তার পক্ষে অন্য সবার সঙ্গে ফারফ্রীর অনুগমন করে শহরের পৌরভবনে যাওয়াটা কিঞ্চিৎ কষ্টকর ছিল বৈ কি।

মনিবদের এই বিবাদ এখন কর্মচারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল।

সেপ্টেম্বর-রাত্রির অন্ধকার এসে পড়ল ক্যাস্টারব্রিজের ওপর। ঘড়িতে সবে সাড়ে আটটা বাজল। চাঁদ উঠেছে, সবে সন্ধ্যে হয়েছে অথচ শহরের পথঘাট জনশূন্য এবং নীরব। ঘোড়ার গলায় ঘন্টার কর্কশ শব্দ ও চাকার ঘর্ঘরধ্বনি শোনা গেল একবার। তারপরেই খুব উচ্চস্বরে কলহের আওয়াজ ভেসে এল লুসেটার বাড়ীর বাইরে। কি ব্যাপার দেখার জন্যে লুসেটা আর এলিজাবেথ জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। পর্দা তুলে দিল।

বাজার এবং টাউন হল একেবারে পাশেই, গীর্জার গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। নিচের তলাটা শুধু ফাঁকা একটা খিলানের মত। এই পথেই 'বুল ষ্টেক' নামক ঘেরা উঠোনে গিয়ে পড়তে হয়। উঠোনের মধ্যিখানে একটা পাথরের থাম—আগে এখানে ষাঁড়গুলোকে বেঁধে রাখা হত—তারপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হত। কুকুরের সঙ্গে দাপাদাপি দৌড়ঝাঁপ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, পাশেই কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে জবাই করা হত তাদের।

এই জায়গায় ঢুকবার পথটিতে এখন দুটি চার-ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি। দুটো গাড়ীরই সামনেটা অপরের দিকে খানিকটা এগিয়ে। খালি থাকলে হয়তো পরস্পরের বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা হয়ে যেত, কিন্তু একটা গাড়ীতে একেবারে দোতলা সমান উঁচু বিচুলি বোঝাই, অতএব যাওয়ার উপায় নেই।

ইচ্ছে করেই এটা করেছ তুমি—ফারফ্রীর গাড়োয়ান বলল—অন্ততঃ আধমাইল-দূর থেকে আমার ঘোড়ার গলার ঘন্টা শুনতে পাওয়া উচিত!

অমন অনাড়ির মত না চালিয়ে যদি তুমি নিজের কাজে মন দিতে তো আমাকে আগেই দেখতে পেতে—হেনচার্ডের কর্মচারী রেগে গিয়ে উত্তর দিল।

যাইহোক, রাস্তা চলাচলের নিয়মানুসারে দেখা গেল হেনচার্ডের লোকটারই দোষ বেশী। অতএব তাকে পিছু হটতে হল হাই ষ্ট্রিটের দিকে গাড়ীর পেছনের চাকা গীর্জার দেয়ালে গিয়ে ঠেকতেই পর্বতপ্রমাণ বোঝাই গাড়ী গেল উল্টে—দুটো চাকা এবং ঘোড়ার পা তখন শূন্যে ঝুলছে।

পরিস্থিতিকে কিভাবে সামাল দেওয়া যায় সে চিন্তা না করে দুই গাড়োয়ান দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হল। প্রথম রাউণ্ড চলতে চলতেই হেনচার্ড এসে হাজির হল হল সেখানে—ইতিমধ্যে কেউ হয়তো তাকে খবর দিয়ে থাকবে।

হেনচার্ড দুই হাতে তাদের দু'জনের কলার ধরে পরস্পরের থেকে পৃথক করে

দিল। তারপর এগিয়ে গেল ঘোড়াটার দিকে। বহুকষ্টে তাকে মুক্ত করতে সক্ষম হল। তারপর সে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল ঘটনাটা কি ঘটেছিল। তার গাড়ী এবং বোঝাই মালের অবস্থা নজর করে সে ফারফ্রীর গাড়োয়ানকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ শুরু করল।

লুসেটা আর এলিজাবেথ ততক্ষণে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বারবার তারা হেনচার্ড এবং গাড়োয়ান দুটোর পাশ দিয়ে ঘুরছিল। গাড়ীবোঝাই নতুন বিচুলি চাঁদের আলোয় চকচক করছে তাই দেখছিল। কেবল এ'রা দুজনেই দেখেছিল ঘটনার সূত্রপাত কিভাবে হয়—আর কেউ দেখেনি। লুসেটা বলল—

না, না, মিঃ হেনচার্ড! আমি সব দেখেছি! আপনার লোকটারই দোষ বেশী।

হঠাৎ থেমে গিয়ে হেনচার্ড ঘুরে তাকাল, তারপর বলল—ও! আপনাকে আমি দেখতে পাইনি মিস টেম্পলম্যান! আমার লোকটারই দোষ? ও! তা হবে, কিন্তু কথা হোল ও'ই গাড়ীটা খালি—অতএব একেবারে এভাবে ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ার জন্যে দোষটা ওরই বেশী।

না, না, আমিও দেখেছি। বলল এলিজাবেথ—আমি বলছি, ওর না এসে পড়ে উপায় ছিল না।

ওনাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না। হেনচার্ডের লোকটি আসতে বলল।

কেন? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল হেনচার্ড।

দেখুন, সব মেয়েরাই ফারফ্রীর দলে। অমন ফুল বাবুটি সেজে বেড়ায়।—ভেড়ার মাথায় যেমন পোকা আছে বলে সোজা জিনিসকে বাঁকা দেখে—ঠিক তেমনি ঐ ছোকরাও যত্তো মেয়েছেলের মগজে ঢুকে বসে আছে।

তুমি জানো কোন্ মহিলার সম্পর্কে কথা বলছ? জানো, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক আছে, এবং উনিও মাঝেমাঝে আগ্রহ বোধ করেন—সাবধানে কথা বলো।

না, মালিক, অত কিছু জানি না। হপ্তায় আট শিলিং পাই—এ ছাড়া আর খবর রাখি না।

জানো, ফারফ্রীও ব্যাপারটা জানে? ব্যাবসাপত্তর সে ভালই বোঝে, কিন্তু তুমি যা বলতে চাইছ অমন নিচু কাজ সে করবে না।

এই মৃদুস্বরে কথোপকথন লুসেটার কানে গিয়েছিল কিনা কে জানে—তবে তার শুভ্র চেহারাটিকে তার বাড়ীর দরজা থেকে ভেতরে সরে যেতে দেখা গেল। হেনচার্ড তার সঙ্গে আরও আলাপ করতে যাওয়ার আগেই তার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এই ঘটনায় হেনচার্ড খুব বিমুখ হল। লোকটা এতক্ষণ যা বলেছে তাতেই সে যথেষ্ট

লজ্জিত, তাই লুসেটার সঙ্গে একান্তে কথা বলার ইচ্ছা ছিল না। এমন সময়ে বৃদ্ধ একজন পাহারাদার এসে হাজির হল সেখানে।

এই বুড়ো, শোনো ভাল করে—লক্ষ রাখবে আজ রাত্রে যেন কেউ এই গাড়ী আর বিচুলির ঘাড়ে গিয়ে না পড়ে—আড়ৎদার বলল—সকাল পর্য্যন্ত এইভাবে থাক। এখন আর লোকজন পাওয়া যাবে না, মাঠ থেকে কেউ ফেরে নি। আর কোনো গাড়ী ঘোড়া যদি এসে পড়ে তো বলবে পেছনদিক দয়ে ঘুরে আসতে।........ নালিশ-টালিশ কিছু থাকে তো কালকে বলো সভা ঘরে গিয়ে।

হ্যাঁ একটা নালিশ আছে।

কি, কি হয়েছে ?

এক ঝগড়াটী বুড়ী রাস্তার ওপরে—ঠিক গীর্জার দেওয়ালের গায়ে পেচ্ছাপ করেছিল—আবার গালমন্দও করেছে সেইসাথে।

ও! তা মেয়র সাহেব বুঝি এখন নেই এখানে, তাই না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ, ঠিক আছে—তাহলে আমিই থাকব। কিন্তু ঐ বিচুলিগুলোর দিকে নজর দিতে ভুলো না। এখন তাহলে চলি, কেমন!

এই সময়টুকুর মধ্যে হেনচার্ড মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল লুসেটার সঙ্গে দেখা করবে। লুসেটার দরজায় গিয়ে ভেতরে খবর পাঠাল সে।

কিন্তু ভিতর থেকে উত্তর এল, মিস টেম্পলম্যাল এখুনি বিশেষ কাজে বাইরে বেরোচ্ছেন, অতএব আজ আর কারো সঙ্গে দেখা হবে না।

হেনচার্ড রাস্তা পার হয়ে ওপাশে চলে গেল, আর তার খড় বিচুলির পাশে দাঁড়িয়ে যেন দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে সেই পাহারাদার অন্যত্র সরে গেছে, ঘোড়াগুলোকেও খুলে নেওয়া হয়েছে, চাঁদের আলো এখনও বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে ফোটে নি, আবার বাড়ী বাড়ী বাতিও ধরানো হয় নি এখনও পর্য্যন্ত। ছায়া এবং অন্ধকারের মধ্যে সরে গিয়ে, 'বুল স্টেক-কে' ঢোকার পথে এক থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল হেনচার্ড। সেখান থেকে লুসেটার দরজার দিকে নজর রাখল।

লুসেটার শোবার ঘর থেকে বাতির আলো এসে পড়ছে বাইরে। সে নিশ্চয়ই এখন সাজগোজ করতে ব্যস্ত। তারপর বাতি নিভে গেল, ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজল। ঠিক সেই সময়ে ফারফ্রীও উল্টো দিক থেকে এসে দরজায় টোকা দিল। লুসেটা যে এতক্ষণ তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল সেটা বোঝা গেল যেই মাত্র লুসেটা নিজেই এসে দরজা খুলে দিল। তারপর বেরিয়ে গেল তারা। সামনের রাস্তা ত্যাগ করে পেছনের একটা সরুগলি ধরে পশ্চিমদিকে এগুতে লাগল। কোথাও

যাচ্ছে আন্দাজ করে হেনচার্ডও পিছু পিছু যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

এবারকার আবহাওয়ার খেয়ালে ফসল উঠতে এত দেরী হয়ে যাচ্ছিল যে একটা দিন ভাল পেলেই চাষীরা সর্বশক্তি দিয়ে ফসলগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। দিনের বেলা সময়ে কুলোয় না, তাই সন্ধ্যার পরে জোছনার আলোতেও কাজ করতে হয়। আজ রাত্রিতে ক্যাস্টারব্রিজ শহরের দুপাশের বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত্রে লোকজনের চলাফেরা এবং কথাবার্তা বন্ধ হয় নি। বাজারের কাছে হাটখোলাতে দাঁড়িয়েই হেনচার্ড তাদের চীৎকার চ্যাচামেচি শুনতে পাচ্ছিল। ফারফ্রী এবং লুসেটা যে এখন ঐ দিকেই চলেছে একথা বুঝতে তার আর অসুবিধা হল না।

শহরের প্রায় যাবতীয় লোক ফসল কাটার কাজে গিয়ে নেমেছে। ক্যাস্টারব্রিজের লোকেরা এখনও সেই আদিম স্বভাবটি বজায় রেখেছে—প্রয়োজনের সময় তারা একে অপরকে সাহায্য করে। তাই সঙ্কীর্ণ অর্থে বলতে গেলে এ ফসলের মালিক মাত্র কয়েকঘর চাষী—এ সবই ডার্ণওভার এলাকায় তাদের পল্লীতে গিয়ে উঠবে—কিন্তু তাই বলে শহরের অন্য লোকদেরও মাঠ থেকে এই ফসল কেটে তোলার উৎসাহ কিছু কম ছিল না।

সরু গলিটার প্রান্তে পৌঁছে হেনচার্ড দেওয়ালের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে নামল একটা সবুজ ক্ষেতের বেড়া দিয়ে সে মাঠে এসে পৌঁছুল। চারদিকে বিস্তীর্ণ হরিদ্রাভ আলা-আঁধারিতে ইতস্ততঃ গমের পালাগুলোকে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট তাঁবুর মত। আর যেগুলো অনেকদূরে, চাঁদের আলোয় ঝাপসা হয়ে সব একাকার হয়ে গেছে।

হেনচার্ড যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তার আশেপাশে কোন লোকজন কাজকর্ম করছিল না। কিন্তু তার মতই আরও দুটি ব্যক্তি এখানে এসে প্রবেশ করেছিল এবং তাদেরকে গমের পালার মধ্যে মধ্যে ধীরপদে হাঁটতে দেখা যাচ্ছিল। কোনদিকে যে তারা হাঁটছে তার কোনো স্থির দিকনির্দেশ ছিল না। একটুপরেই তারা এঁকেবেঁকে হাঁটতে, হেনচার্ড চট করে কাছেই একটা পালার মধ্যে ফাঁকা জায়গাটাতে ঢুকে বসে থাকল।

আমি তো তোমাকে সে অধিকার দিয়েছি—লুসেটা খুব খুশী খুশীভাবে বলতে লাগল—তোমার যা ইচ্ছে হয় বলো না।

তাহলে শোনো—ফারফ্রী উত্তর দিল। তার মুখে একনিষ্ঠ প্রেমিকের কণ্ঠ অভ্রান্তভাবে বেজে উঠল হেনচার্ড আগে কখনও তার ওষ্ঠাধর থেকে এত পরিচ্ছন্নভাবে শব্দ নির্গত হতে দেখে নি—তোমার অর্থবিত্ত, প্রতিভা এবং সৌন্দর্যের কারণে অনেকেই তোমার জন্যে পাগল। কিন্তু এত স্তাবক-পরিবৃত হয়ে থাকার

মত প্রলোভন কি তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? শুধু সাধারণ একজনের অনুরাগ লাভ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে?

সে ব্যক্তিটি কি বক্তা নিজে?—হাসতে হাসতে বলল লুসেটা—বেশ বলো তারপর, আর কি আছে?

তারপর—তারপর আর কিছু বলতে গেলে, হয়তো আমাকে সভ্যতা, শিষ্টতা সব বর্জন করতে হবে।

সেজন্যে যদি তোমাকে অসভ্য হতে হয়, তার মানে তুমি কখনও সভ্য ছিলে না। তারপর কিছু ভাঙা ভাঙা কথা হেনচার্ড শুনতে পেল না। লুসেটা আবার বলল—কিন্তু তুমি আমাকে কখনো সন্দেহ করবে না।

ফারফ্রী মনে হল তাকে সে আশ্বাস দিল এবং তার হাত ধরল।

ডোনাল্ড, তুমি ঠিক জান যে আমি আর কাউকে ভালবাসি না। তারপরেই বলল লুসেটা—কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারে আমার বিশেষ পছন্দ অপছন্দ আছে।

নিশ্চয়ই। সব ব্যাপারেই থাকতে পারে। কিন্তু সেই বিশেষ ব্যাপারটি কি?

যেমন ধরো, আমি যদি দেখি ক্যাস্টারব্রিজে থেকে আমি সুখী হব না, তবে আমি এখানে নাও থাকতে পারি।

এ কথার উত্তরটি হেনচার্ড শুনতে পেত এবং আরও অনেক কিছু জানতে পেত কিন্তু লুকিয়ে শোনার মত প্রবৃত্তি ছিল না তার। লুসেটা এবং ফারফ্রী যেদিকে লোকজন কাজ করছিল সেইদিকে এগিয়ে গেল। সেখানে যাবতীয় ফসল গাড়ী বোঝাই হচ্ছে—মিনিটে ডজন ডজন আঁটি উঠে যাচ্ছে শহরের অভিমুখে।

লোকজনের কাছাকছি এসে পড়লে লুসেটা আর এগুতে চাইছিল না। ফারফ্রীর কিছু কাজ ছিল ওদের সঙ্গে, তাই সে লুসেটাকে একটু দাঁড়ানোর জন্যে অনুরোধ করল। কিন্তু কিছুতেই রাজী হল না সে, একা একাই এগিয়ে চলল বাড়ীর দিকে।

হেনচার্ড তখন মাঠ ছেড়ে লুসেটার পেছু পেছু চলতে শুরু করল। মনের অবস্থা তার এমনই যে লুসেটার বাড়ীর দরজায় পৌঁছে সে আর অপেক্ষা করতে পারল না ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তারপর সোজা গিয়ে ঢুকল তার বসবার ঘরে, ভেবেছিল সেখানেই তার দেখা পাবে। কিন্তু সে ঘরে কেউ নেই। হেনচার্ডের খেয়াল হল যে, তাড়াতাড়িতে আসতে গিয়ে সে হয়তো অন্য পথে লুসেটার আগেই এখানে পৌঁছে গেছে। যাই হোক, বেশীক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই হলঘরের মধ্যে তার পোষাকের খসখস আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর আস্তে করে দরজা বন্ধ করার শব্দ। একটু পরেই লুসেটা

এসে ঢুকল।

আলোটা এত ক্ষীণ যে প্রথমে সে হেনচার্ডকে লক্ষ্য করে নি। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রায় আঁৎকে উঠল। ছোট্ট একটুখানি চীৎকার করে ফেলল।

তুমি আমাকে প্রায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। কিঞ্চিৎ হাসির রেশ টেনে বলল সে—কিন্তু এখন রাত দশটা বাজে—আমাকে এতরাতে এভাবে চমকে দেওয়ার কোনও অধিকার তো তোমার নেই।

ও! আমার জানা ছিল না যে, সে অধিকার আমার নেই। যাক—তবুও আমি মার্জনা পেতে পারি। সভ্যতা, ভদ্রতা সম্পর্কে অত বেশী চিন্তা করাটা কি আমার পক্ষে একান্তই দরকার?

এত রাতে এটা ভাল দেখায় না, আমার কলঙ্ক হতে পারে।

এক ঘণ্টা আগে যখন এসেছিলাম তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও নি। এখন এসে ভাবলাম তুমি বাড়ীতেই আছ। অন্যায়টা তোমারই, লুসেটা! এভাবে আমাকে দূরে সরিয়ে দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। একটা ছোট্ট কথা তোমায় মনে করিয়ে দিতে চাই, যেটা হয়তো ভুলে গেছ—

লুসেটা একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চোখেমুখে সাদা হয়ে গেল তার।

শুনতে চাই না, শুনতে চাই না আমি—দুই হাতে মুখ ঢেকে বলতে লাগল সে। হেনচার্ড তখন সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে, জার্সির সেই পুরনো দিনের কথা তোলার চেষ্টা করছে।

কিন্তু শোনা তোমার উচিত—বলল হেনচার্ড।

তাতে তো কোন ফল হয় নি এবং সেও তোমারই জন্যে। তবে এত দুঃখের পরেও কেন এ স্বাধীনতাটুকু আমাকে দেবে না তুমি? যদি দেখতাম যে শুধু ভালবাসার জন্যেই তুমি আমাকে এখন বিয়ে করতে চাও, তো আমার রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু যখন দেখলাম যে তুমি আমাকে নিছক অনুগ্রহ করতে চাও—যেন একটা অপ্রিয় কর্তব্য মাত্র—তোমার অসুখের সময় সেবা করেছিলাম বলে প্রতিদান দিতে চাও—তারপর থেকে আমি আর আগের মত টান অনুভব করি নি।

তাহলে আমার খোঁজে কেন এসেছিলে এই পর্যন্ত?

ভেবেছিলাম, তুমি একা, আমার বিবেকের নির্দেশে তোমাকেই বিয়ে করা উচিত। সে আমার ভাল লাগুক আর না লাগুক।

তাহলে এখন তেমন ভাবতে আপত্তি কোথায়?

লুসেটা চুপ করে রইল। এটা স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিবেকের শাসন

ততদিনই চলেছিল, যতদিন নতুন প্রেমের অনুপ্রবেশ ঘটে নি। কিন্তু নতুন প্রেম এসে সে রাজত্ব অধিকার করে নিয়েছে। এই কথা ভেবে, মুহূর্তের জন্য লুসেটার যাবতীয় যুক্তি সব তলিয়ে গেল। সে বলতে পারল না, হেনচার্ডের অস্থির মেজাজ টের পাওয়ার পর, এবং তার থেকে একবার রেহাই পাওয়ার পর, আবার তার ইচ্ছা ছিল না নিজের সুখশান্তি সে ঝুঁকি নিয়ে তার হাতে সঁপে দেয়। শুধু যে কথাটি সে বলতে পারল, তা হ'ল—তখন আমি অসহায় নাবালিকামাত্র ছিলাম। কিন্তু এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। কাজেই তখনকার আমার সঙ্গে এখনকার আমাতে অনেক তফাৎ।

তা ঠিক। আর সেইজন্যেই ব্যাপারটা আমার কাছেও দৃষ্টিকটু লাগে। কিন্তু তোমার অর্থে আমি হাত দিতে চাই না। তোমার সম্পত্তির প্রতিটি পাইপয়সা যেন তোমার ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে এটাই আমার ইচ্ছা। এছাড়া, তোমার যুক্তির আর কোনো সারবত্তা নেই। যে লোকটির কথা তুমি ভাবছ সে আমার থেকে কিছু ভাল নয়।

তুমি যদি তার মত ভাল হতে, তবে আমাকে অনেক সহজে ছেড়ে দিতে। আবেগভরে বলল লুসেটা।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এ কথায় চটে গেল হেনচার্ড। তুমি কিছুতেই আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারোনা—বলল সে—আজই, এই রাত্রে যদি তুমি একজন সাক্ষীর সামনে আমার স্ত্রী হওয়ার প্রতিশ্রুতি না দাও তো আমি সকলের কাছে ন্যায়ের খাতিরে সমস্ত ঘনিষ্ঠতার কথা ফাঁস করে দেব।

হতাশায় ডুবে গেল লুসেটা। হেনচার্ড তার কষ্টটা দেখতে পেল। এই মুহূর্তে হয়তো তার জন্যে সহানুভূতিও বোধ করত, যদি লুসেটার মনের মানুষটি ফারফ্রী ছাড়া অন্য কেউ হত। কিন্তু তার বদলী এই যে ভুঁইফোঁড়টি (এই নামেই ডাকত তাকে হেনচার্ড), যে কিনা তারই কাঁধে ভর করে আজ হোমরাচোমরা হয়েছে, তার জন্যে হেনচার্ডের অন্তরে একবিন্দুও ক্ষমা ছিল না।

আর একটিও কথা না বলে লুসেটা এলিজাবেথকে ঘর থেকে ডেকে পাঠাল। এলিজাবেথ পড়াশুনার জগৎ থেকে এখানে এসে থমকে গেল। হেনচার্ডকে দেখে কর্তব্যবোধে সে এগিয়ে গেল তার দিকে।

হেনচার্ড তার হাতখানা ধরে বলল—এলিজাবেথ! শোনো, তোমাকে আমি সাক্ষী রাখছি। তারপর লুসেটার দিকে ফিরে বলল—বলো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে, কি করবে না?

তুমি—চাইলে, আমাকে রাজী হতেই হবে।

বলো, হ্যাঁ

বলছি।

প্রতিশ্রুতি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়ার মত এলিয়ে পড়ল।

বাবা! কি হয়েছে? এই কথাটি বলতে ও এত কষ্ট প'চ্ছে কেন? বলে এলিজাবেথ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লুসেটার পাশে। ওকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য করো না। আমি ওর সঙ্গে বাস করে দেখেছি—ও কিছুই সইতে পারে না।

বোকামি করো না। হেনচার্ড শুকনো গলায় বলল—ও এই কথা দিলে তুমি তোমার মানুষটিকে ফিরে পাবে। তাকে তুমি চাও তো, নাকি?

লুসেটা যেন এই কথা শুনে মূর্চ্ছা থেকে চমকে উঠল।

ওর মানুষ? কার কথা বলছ তুমি? হতভম্বের মত বলল সে।

আমার তরফ থেকে বলতে পারি, যে আমার কেউ নয়। এলিজাবেথ বলল দৃঢ়ভাবে।

ও! তাহলে আমার বোঝার ভুল। হেনচার্ড বলল। যাই হোক, কথাটা হচ্ছে আমার সঙ্গে মিস টেম্পলম্যানের—এবং উনি আমাকে বিয়ে করতে রাজী।

কিন্তু এখন এই নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করো না। লুসেটার হাতখানা ধরে এলিজাবেথ অনুরোধের সুরে বলল।

উনি কথা দিলেই আমি আর বলব না। হেনচার্ড বলল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি কথা দিয়েছি। গোঙানির মত বলল লুসেটা। দুঃখে এবং হতাশায় তার অঙ্গ যেন সব অবশ হয়ে গেছে। মাইকেল! দয়া করে এ নিয়ে আর তিতো করো না।

না, করব না। বলে হেনচার্ড, টুপি তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এলিজাবেথ তখন লুসেটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে।—এ কেমন হল? বলল সে—তুমি আমার বাবাকে 'মাইকেল' নামে ডাকলে যেন অনেকদিনের পরিচয়। তোমার ওপরেই বা ওঁর এত জোর কিসের? ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তুমি তাঁকে বিয়ে করবে বলে কথা দিলে?—ও! তুমি দেখছি, অনেক কথাই আমার কাছে গোপন রেখেছ!

তোমারও বোধহয় কিছু কিছু আছে তেমন। লুসেটা নিমীলিত চোখে বিড়বিড় করে বলল। কিন্তু একবারও তার মনে সন্দেহ জাগল না যে এলিজাবেথের গোপনীয়তা সেই যুবকেরই সঙ্গে সম্পর্কিত যে তারও মন মজিয়েছে।

আমি এমন কিছু করব না যাতে তোমার একটুও অনিষ্ট হয়। আবেগের ভারে

ঈষৎ তোৎলাতে তোৎলাতে বলল এলিজাবেথ। অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে সে রাগতভাবে বলল—আমার বাবা কি করে যে এমন আদেশ করেন, বুঝি না। এ ব্যাপারে আমার একটুও সহানুভূতি নেই। আমি যাব ওঁর কাছে—বলব তোমাকে ছেড়ে দিতে।

না, না, দরকার নেই—লুসেটা বলল—যা হচ্ছে হোক।

॥ আঠাশ ॥

পরের দিন সকালবেলা হেনচার্ড নগর দায়রা আদালতে বিচার করতে গেল। বিচারালয়টি লুসেটার বাড়ীর উল্টোদিকে 'টাউন হলে'। অতীতে এই শহরের মেয়র থাকার সুবাদে হেনচার্ড এই বছরের মত বিচারকদের মধ্যে ছিল একজন। লুসেটার বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে হেনচার্ড একবার জানলার দিকে তাকাল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

আপাতঃদৃষ্টিতে হেনচার্ডকে একজন 'জাস্টিস অব পীস' বলে ভাবতে পারাটা বেশ বেমানান ঠেকত। কিন্তু অনেক সময়ে আইনের কচকচি ছাড়াই সোজা-সহজ বুদ্ধির সাহায্যে সে এই আদালতের মামলা-মোকর্দমার নিষ্পত্তি করত। এবছরের যিনি মেয়র ডঃ চকফিল্ড তিনি আজ অনুপস্থিত ছিলেন। তাই হেনচার্ড বড় চেয়ারটাতে আসন গ্রহণ করল। প্রায় সর্বক্ষণই তার উদাসদৃষ্টি গিয়ে পড়ছিল লুসেটর বাড়ীর জানালায়।

আজকের মামলা বলতে একটিই মাত্র নালিশ। অপরাধী তার সামনেই দাঁড়িয়ে। বিচিত্র পোশাক-পরা এক বৃদ্ধা মহিলা— গায়ে তার এমনই রঙের একটা চাদর—যে রংটি তৈরী করা যায় না আপনা থেকে হয়ে যায়। বাদামী খয়েরী আকাশী কোন রংই নয়। মাথার কালো ওড়নাটা তেল-চিটচিটে হয়ে গেছে আর এ্যাপ্রণটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে অন্য পোষাকের তুলনায় সেটা অল্প কিছুদিন আগে সাদা ছিল। মেয়েলোকটিকে না-গ্রাম না-শহর কোথারও বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছিল না।

সে হেনচার্ড এবং দ্বিতীয় বিচারকের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। হেনচার্ডও তার দিকে তাকিয়ে একবার থমকে গেল, যেন অস্পষ্টভাবে একটা কিছু বা একট ঘটনা তার মনে পড়ল আবার মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। অভিযোগ-পত্রের দিকে তাকিয়ে সে বলল—ও আচ্ছা, কি অন্যায় করেছে এই মহিলা?

হুজুর! এই মহিলা অশোভন অঙ্গভঙ্গী করেছে এবং সর্বসাধারণের সামনে মূত্রত্যাগ করেছে—আস্তে আস্তে বলল পাহারাদার।

কোথায়, কোন জায়গায়? অপর বিচারক প্রশ্ন করল।

হুজুর! সে কথা আর কি বলব একেবারে গীর্জার গায়ে। আমি ওকে হাতে-নাতে ধরেছি, ধর্মাবতার!

ওখানে পিছিয়ে দাঁড়াও—বলল হেনচার্ড—তারপর তোমার কি বলবার আছে বলো।

পাহারাদারকে শপথ পাঠ করানো হল তারপর বিচারকের কেরানী কালিতে কলম ডুবাল কারণ হেনচার্ড নিজে কোন লেখাপড়ার ধার ধারে না। শান্তিরক্ষকটি বলতে শুরু করল—

এই মাসের পাঁচ তারিখে—রাত তখন এগারোটা বেজে পঁচিশ—প্রচণ্ড একটা হৈচৈ শুনে আমি এগিয়ে যাই—তারপর দেখি—

অত তাড়াতাড়ি বলে যেও না—কেরানীটি বলল।

পাহারাদারটি তখন থেমে থেমে কেরানীর কলমের দিকে নজর রেখে বলতে লাগল। তার কলম থামলে সে শুরু করল—সেখানে পৌঁছে আমি দেখলাম যে আসামী তখন দাঁড়িয়ে আছে একটা নর্দমার ধারে—বলে সে তাকাল কলমের দিকে।

নর্দমার ধারে। হয়েছে—তারপর।

জায়গাটা আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে প্রায় বারো ফুট নয় ইঞ্চি তফাতে। কেরানীর লেখার তুলনায় যাতে তার বলে যাওয়া পিছিয়ে না পড়ে এবং তার মুখস্থ করে আসা বর্ণনা ভুল হয়ে না যায় তাই সে আবার বলতে যাচ্ছিল।

আমি আপত্তি জানাচ্ছি—বুড়ো মেয়েলোকটি বলল—'প্রায় বারো ফুট নয় ইঞ্চি' কোনো সঠিক বর্ণনা হল না।

বিচারকরা পরস্পর পরামর্শ করলেন। দ্বিতীয়জন জানালেন কেউ যদি শপথ নেওয়ার পরেও বারো ফুট নয় ইঞ্চি বলে দূরত্বের উল্লেখ করে তবে তা ঠিকই আছে।

চাপা খুশীর দৃষ্টিতে পাহারাদারটি একবার তাকাল পরাজিত মহিলার দিকে, তারপর বলতে লাগল—সেখানে সে আশপাশের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করছিল। আমি যখন আরও নিকটে এগিয়ে গেলাম সে মূত্রত্যাগ করতে লাগল এবং যাচ্ছেতাই ভাষায় আমাকে অপমান করতে লাগল।

অপমান করতে লাগল—আচ্ছা! কেমন অপমান?

আমাকে বলল—আলোটা নিভিয়ে দে না—

আচ্ছা।

আরও বলল, শুনতে পাচ্ছি না—ওরে বোকা পাঁঠা—আলো নিভিয়ে দে। তোর থেকে অনেক শক্ত জোয়ানকে শুইয়ে দিয়েছি বুঝলি আর তোকেও তাই করব আলোটা নিভিয়ে দেখ্।

এই কথায় আমার আপত্তি জানানো থাকল—বৃদ্ধা মাঝখান থেকে বলল—আমি কি বলেছিলাম তা আমি নিজে শুনতে পাইনি—আর আমি নিজে যা শুনতে পাই নি তা সাক্ষ্যের মধ্যে ধরা যায় না।

আবার একবার পরামর্শের জন্যে জেরা করা বন্ধ থাকল। একটা বই খোলা হল। শেষ পর্য্যন্ত পাহারাদারটিকে আবার বলতে দেওয়া হল। আসল কথা হল বিচারকদের থেকেও এই মহিলাটি এত বেশীবার এজলাসে উপস্থিত হয়েছে যে প্রতি পদে পদে বিচারকদের সতর্ক থাকতে হচ্ছিল বিচারের প্রথাপদ্ধতি বিষয়ে। পাহারাদারটি যখন থেমে থেমে আরও কিছুটা বলল, হঠাৎ অধৈর্য্য হয়ে হেনচার্ড বলে উঠল—রাখো তো, ওসব আর শুনতে চাই না। যা বলার আছে সোজাসুজি বলবে বুঝেছ, নইলে মোটেই কিছু বলবে না। তারপর মেয়েলোকটির দিকে ফিরে বলল—তোমার কিছু প্রশ্ন করবার আছে ওকে, বা কিছু বলার আছে?

হ্যাঁ। একবার চোখটিপে বলল সে। কেরানী তার কলম ডোবাল কালিতে।

প্রায় বিশ বছর আগে আমি ওয়েডেনের মেলায় একটা তাঁবু খাটিয়ে ফার্মিটি বিক্রী করছিলাম।

বিশ বছর আগে? সে তো তুমি দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছিল যেদিন, সেইদিকে এগিয়ে যাচ্ছো—ব্যঙ্গ না করেই বলল কেরানীটি।

একটা পুরুষলোক এবং একটা মেয়েলোক একটা বাচ্চা কোলে করে আমার দোকানে এসে ঢুকল।—বুড়ী বলে যেতে লাগল—তারা বসে খাবারের অর্ডার দিল। হায় ভগবান! তখন আমার অবস্থা এখনকার থেকে অনেক ভাল ছিল। কিছু কিছু চোরাই চালানের ব্যবসাও ছিল। তাছাড়া আমি আমার ফার্মিটির মধ্যে যারা চাইত তাদের জন্যে মদও মিশিয়ে দিতাম। সেই লোকটিকেও তাই দিলাম। বেশ কয়েকবার চেয়ে চেয়ে খেল সে। তারপর সে তার বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধাল। নীলামে বৌকে বেচে দেবে বলে ডাকতে লাগল সবার মধ্যে। এক নাবিক তখন পাঁচ গিনি দাম দিয়ে তার বৌকে নিয়ে চলে যায়। আর সেই যে লোকটি সেদিন এইভাবে তার বৌকে বেচে দিয়েছিল সে আজ ঐ বড় চেয়ারখানাতে বসে আছে। বলে বক্তা হেনচার্ডের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল, আর হাত দুটোকে ভাঁজ করে রাখল বুকের ওপর।

প্রত্যেকের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হেনচার্ডের দিকে। অদ্ভুৎ দেখাচ্ছে তার মুখখানা

যেন কেউ ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে।—আমরা তোমার জীবন-কাহিনী শুনতে চাই নি—দ্বিতীয় বিচারক এই ফাঁকে তাড়াতাড়ি বললেন—তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এই ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলার থাকে তো বলো।

এটাই তো অনেক কিছু বলা হল। এতেই প্রমাণ হল উনি আমার থেকে কিছু ভাল নন। ঐ চেয়ারে বসে আমাকে বিচার করার অধিকার ওঁনার নেই।

এসব বানানো গপ্পো—কেরানী বলল—অতএব চুপ করে থাকো।

না, ওর কথা সত্যি। এবারের কথাগুলো এল হেনচার্ডের মুখ থেকে। যা বলেছে তার সবটাই সত্যি—আস্তে আস্তে বলল সে—এবং এটাও সত্যি যে আমি ওর থেকে ভাল নই এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। ওর ওপর প্রতিশোধ নেয়ার কোনো ইচ্ছা যাতে না জাগে—তাই আমি সরে দাঁড়াছি এবং ও'র বিচার তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম।

আদালতের মধ্যে ভয়ানক একটা সাড়া পড়ে গেল। হেনচার্ড উঠে বাইরে চলে গেল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, দুপাশে তখন কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে। ঐ বৃদ্ধা মহিলা যে বস্তিতে বাস করত সেখানকার লোকদের সে মাঝে মাঝেই বলত—এখানকার মহান ব্যক্তি ঐ যে মিঃ হেনচার্ড—তাঁর সম্পর্কে সে দু'একটা গোপন খবর বলতে পারে—কিন্তু বলে না ইচ্ছা করে। ব্যাপারটা দেখার জন্যে বস্তিবাসীরা সবাই সেদিন আদালতে ভিড় করেছিল খুব উৎসুক হয়ে।

আজকে টাউন-হলের চারপাশে অত ভিড় হয়েছে কেন? মামলা মিটে যাওয়ার পরে লুসেটা তার চাকরকে জিজ্ঞাসা করল। আজ সে দেরী করে উঠেছে। এই মাত্রই জানালার বাইরে তাকাল প্রথম।

ওঃ হো, এ তো মিঃ হেনচার্ডের নামে কেচ্ছা রটেছে তাই। এক বুড়ী নাকি প্রমাণ করেছে যে উনি ভদ্দরলোক হওয়ার আগে এক মেলায় ওঁর বৌকে বেচে দিয়েছিলেন পাঁচ গিনি দামে।

এতদিন হেনচার্ড তার স্ত্রী সুসানকে হারানোর যত ব্যাখ্যা দিয়েছে, তার মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা বলেছে তার মধ্যে কখনই ঠিক কোন ঘটনার ফলে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায় একথা লুসেটাকে একবারও বলে নি। এখনই সে প্রথম জানতে পেল ঘটনাটা কি।

আগের রাত্রিতে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেই কথা চিন্তা করে লুসেটার মুখে এক গভীর দুঃখের প্রলেপ পড়ে গিয়েছিল। এই তাহলে হেনচার্ডের আসল পরিচয়। এমন পুরুষের হাতে যদি কোনো নারীর পক্ষে নিজের ভবিষ্যৎ জমা করে দিতে হয় তবে সে যে কী ভয়ানক ব্যাপার!

দিনের বেলা সে নানান জায়গায় ঘুরে-টুরে সন্ধ্যের আগে আর বাড়ী ফিরল না। বাড়ী ফিরেই যেইমাত্র এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা হল, লুসেটা তাকে বলল, সে ঠিক করেছে দিনকয়েকের জন্যে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবে—সম্ভবতঃ পোর্ট ব্রেডিতে—কারণ ক্যাস্টারব্রিজ আর ভাল লাগছে না।

এলিজাবেথ তাকে খুব ক্লান্ত অবসন্ন দেখে এই কথায় মত দিল। ভাবল যে একটু পরিবর্তন হলে হয়তো ভাল লাগবে তার। এমন সন্দেহও অবশ্যি হয়েছিল এক-আধবার, যে লুসেটার কাছে ক্যাস্টারব্রিজ এত অসহ্য হয়ে ওঠার কারণ সম্ভবতঃ ফারফ্রীর অনুপস্থিতি।

এলিজাবেথ বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে তার ফিরে আসা পর্য্যন্ত এই বাড়ীর সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করল। দু-তিনদিনের নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি এবং নির্জনবাসের পর হেনচার্ড এল একদিন দেখা করতে। কিন্তু লুসেটা বাড়ী নেই শুনে সে হতাশ হল। বাইরে থেকে যদিও বিশেষ বিব্রত মনে হচ্ছিল না তাকে। কিন্তু কোঁকড়ানো দাড়ির মধ্যে আঙুল দিয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে এল সে।

পরের দিন সে এল আবার, জিজ্ঞাসা করল—এখন কি এসেছে?

হ্যাঁ, আজ সকালেই ফিরেছে। উত্তর দিল তার সৎ-মেয়ে কিন্তু এখন তো বাড়ী নেই। পোর্ট-ব্রেডির দিকে ঐ রাস্তায় একটু বেড়াতে গেছে—সন্ধ্যে নাগাদ বোধহয় এসে যাবে।

দু-একটা কথা যা বলল হেনচার্ড, তাতে কেবল তার অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিল। তারপর সে চলে গেল আবার।

॥ উনত্রিশ ॥

ঠিক এই মুহূর্তে, এলিজাবেথ যেমন বলেছিল, লুসেটা পোর্ট-ব্রেডির রাস্তায় পদচারণা করে বেড়াচ্ছিল। যে রাস্তা দিয়ে মাত্র ঘণ্টাতিনেক আগে সে গাড়ী করে ফিরেছে—এখন সেখানেই আবার হেঁটে বেড়াচ্ছে—ব্যাপারটা কিছুটা আশ্চর্য্যজনক বটে। আজ শনিবার। বড় বাজার বসার দিন। আজই প্রথম দেখা গেল ফারফ্রী গমের বাজারে গদিতে বসে নি। তা সত্ত্বেও ফারফ্রী যে আজ রাত্রেই বাড়ী ফিরবে তাতে সন্দেহ নেই—কারণ আগামীকাল রবিবার। ক্যাস্টারব্রিজের লোকেদের কাছে রবিবার রবিবারের মতই।

লুসেটা হাঁটতে হাঁটতে সারিবাঁধা গাছগুলোর কাছে এসে পড়ল। এখান থেকে বড় রাজপথ শুরু—শহরের সীমানা। এই প্রান্তটাতে এক মাইল শেষ হল। লুসেটা দাঁড়াল এখানে এসে।

এই জায়গাটা একটা উপত্যকার মত সমতল—দুপাশে আস্তে আস্তে উঠে গেছে রাস্তার দু'ধারে, অনেক দূরের পাহাড়-চূড়োয় মিলিয়ে যাওয়ার মত—রোমান যুগের তৈরী এই রাস্তা দুদিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এখান থেকে কোনো ঝোপঝাড় বা গাছপালা দেখা যায় না। রাস্তার পরেই শুরু হয়েছে বিস্তীর্ণ জমি। কেটে নেওয়া গমগাছের গোড়াগুলো উঁচু হয়ে আছে ইতস্ততঃ। বিছানো একখানা বস্ত্রখণ্ডের মত দৃশ্য। তার সামনেই একটা মরাই। বাড়ি বলতে এই একটাই দেখা যাচ্ছে—সামনে দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত আর কিছু নেই।

অনেক মনোযোগ দিয়ে দূরের রাস্তার দিকে দেখার চেষ্টা করল লুসেটা। কিছুই দেখা গেল না। এমন কি আবছা একটা বিন্দুর মতও না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে একটা কথাই উচ্চারণ করল—ডোনাল্ড। তারপর ঘুরে দাঁড়াল ফিরে যাওয়ার জন্যে।

এদিক দিয়ে কিন্তু একজনকে আসতে দেখা গেল—সে এলিজাবেথ।

লুসেটা একেবারে একা একা থাকলেও একটু বিরক্তিবোধ করল। এলিজাবেথ দূর থেকে যেই বান্ধবীকে চিনতে পারল, তার মুখে স্নেহ এবং প্রীতির রেখা ফুটে উঠল। তখনও পর্য্যন্ত সে কথা-বলার মত কাছাকাছি আসে নি। আরেকটু এগিয়ে হেসে বলল—হঠাৎ মনে হল, তোমার সঙ্গে এসে যোগ দিই।

একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার লক্ষ্য করে লুসেটার মুখ থেকে আর উত্তর বেরুল না। লুসেটা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেইখানে একটা সরুগলি এসে মিশেছে এই বড় রাস্তাতে। সেই পথে একটা ষাড় এগিয়ে আসছিল এইদিকেই। এলিজাবেথ অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, তাই দেখতে পায় নি।

ক্যাস্টারব্রিজের লোকেদের কাছে গরুবাছুরই জীবিকার প্রধান সম্বল। প্রতি-বছরের শেষের দিকে এদের জন্যে ভয়ও ছিল বেশ। এখানে গো-প্রজননের হার আদিপিতা আব্রাহামের যুগে মানব-প্রজননের সঙ্গে তুলনীয়। তাই এই সময়ে যত বড়বড় ষাঁড় নীলামে বিক্রী হত বেশ চড়াদামে। শিংওয়ালা এই বিশাল জন্তুগুলো একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার পথে মহিলা এবং শিশুদের মনে যথেষ্ট ভীতির সঞ্চার করত। এমনি জন্তুগুলোর চলাফেরা খুব ঠাণ্ডা। কিন্তু ক্যাস্টারব্রিজের লোকদের স্বভাব হল ষাঁড় দেখলে পিছনে লাগা। বিকট চীৎকার, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী বিশাল সব লাঠিসোটা, রাস্তার কুকুর লেলিয়ে দেওয়া, এবং অন্য যত প্রকার উপায় আছে সর্বপ্রচেষ্টায় জন্তুটিকে ক্ষেপিয়ে তোলা। গৃহস্থকে এই সময়ে প্রায়ই বাইরে

বেরিয়ে দেখতে হয় বাচ্চা ছেলেমেয়ে এবং বৃদ্ধা মহিলাদের ভীড়। তাদের মুখ থেকে শুনতে হয়—নতুন একটা ষাঁড় এসে পৌঁছানর সংবাদ।

লুসেটা এবং এলিজাবেথ জন্তুটাকে দেখে ঘাবড়ে গেল। ততক্ষণে সে এইদিকেই এগিয়ে আসছে—তবে তার মতিগতি অনিশ্চিত। প্রকাণ্ড তার চেহারা—ঘন বাদামী রং—গায়ে নানা জায়গায় কাদামাটি লেগে আছে তাই খারাপ দেখাচ্ছে। মোটা দুটো শিং, পেতল দিয়ে মোড়া। নাকের ফুটো আগেকার যুগে বাচ্চাদের খেলনায় যেমন দেখা যেত, টেমস নদীর সুড়ঙ্গের মত। তার মাঝখানে ফুটো করে একটা তামার বালা পরানো মজবুতভাবে ঝালাই করা। সেখান থেকে প্রায় হাতদুয়েক লম্বা একটা লাঠি ঝুলছে। ষাঁড়টার নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটাও নড়ছে, মাস্তুলের মত।

এই লাঠিটাকে দেখেই যুবতী দুজন আরো ঘাবড়ে গেল। কারণ এর অর্থ হচ্ছে ষাঁড়টা বদরাগী, কোনো উপায়ে পালিয়ে এসেছে। ঐ লাঠিটা দিয়ে না ধরলে একে জব্দ করা যায় না।

মহিলা দুজন একটি আশ্রয় বা পলায়নের মত জায়গা খুঁজতে লাগল। কাছাকাছির মধ্যে ঐ মরাইটা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। যতক্ষণ তারা ষাঁড়টার দিকে তাকিয়েছিল ততক্ষণ তবু জন্তুটার একটু সমঝে চলার ভঙ্গিমা ছিল। কিন্তু যেই তারা পেছন ফিরে মরাইটার দিকে পা বাড়াল অমনি সেও মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে এগিয়ে এল ভয় দেখাতে। তাই দেখে অসহায় মেয়েদুটি উন্মত্তের মত দৌড়ুতে লাগল—ষাঁড়ও তাদের পিছু নিল শিং বাগিয়ে ধরে।

মরাইটার সামনে একটা ছোট্ট শ্যাওলা-ভর্তি জলা। তাতে আবার এই দিক দিয়ে ঢুকবার দরজাটাই মাত্র খোলা আছে। অন্য সব দিক বন্ধ। দরজার সামনে একটা বেড়া-ডিঙিয়ে যেতে হয়। সেই পথেই ঢুকল তারা। ভেতরের উঠোনটা একদম পরিষ্কার। কিছুদিন আগেও ঝাড়াই-মাড়াই হয়েছে। শুধু এককোণে শুকনো বিচুলিগুলো গাদা দেওয়া আছে। এলিজাবেথ উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বলল—আমরা ঐ গাদার মাথায় উঠে যাই।

কিন্তু সেদিকে এগুনোর আগেই শোনা গেল—বাইরে জলা ভেঙে ষাঁড়টা এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে সে বেড়া ঠেলে মরাইয়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। বিশাল দরজার পাল্লাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। তারা তিনজনেই বন্ধ হয়ে গেল মরাইয়ের মধ্যে। জন্তুটি তাকিয়ে দেখল ওদের দিকে। তারপর যে কোণের দিকে তারা সরে গিয়েছিল সেইদিকে অগ্রসর হল। এত ক্ষিপ্রভাবে দৌড়ুছিল তারা দুজনে যে ষাঁড়টা সেইদিককার দেওয়ালে গিয়ে কিছুটা পৌঁছুতে পৌঁছুতে, তারা উল্টোদিকে গিয়ে দাঁড়াল। যতক্ষণে জন্তুটা পেছন ফিরে আবার তাড়া করতে গেল

ততক্ষণে সেখান থেকে তারা আবার সরে গেছে। এইভাবেই চলছিল—জন্তুটা নাক দিয়ে গরম বাষ্পীয় নিঃশ্বাস ছাড়ছে—এদিকে এলিজাবেথ বা লুসেটা একটু ফাঁক পাচ্ছিল না যে দরজাটা খুলে ফেলে। এইরকম চলতে থাকলে কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু একটু পরেই দরজা খোলার ক্যাঁ-চ-র শব্দ শুনে তাদের বিপক্ষের নজর পড়ল সেইদিকে। একটি পুরুষ-লোক এসে ঢুকল ভেতরে। লোকটি দৌড়ে গিয়ে ষাঁড়ের নাকে বাঁধা লাঠিটা ধরে টান দিল। মুহূর্তের মধ্যে তার ভয়ঙ্কর মুণ্ডুটাকে এমন কাবু করে ফেলল যে এক চড়ে সেটা ঘুরিয়ে দিতে পারে। এমন হিড়হিড় করে তাকে টানতে লাগল যে মনে হচ্ছিল জন্তুটার বিশাল কাঁধ প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। নাক দিয়ে দরদর করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। মানুষের আবিষ্কৃত নাকে পরানো ঐ বালার কৌশলের কাছে পাশবিক বল পরাস্ত হল। জন্তুটা রণে ভঙ্গ দিল।

আবছা অন্ধকারে লোকটাকে বেশ শক্ত সবল এবং সাহসী বলে মনে হচ্ছিল। ষাঁড়টাকে সে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে গেল। আবছা আলোয় এখন দেখা গেল সে হেনচার্ড। ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে যখন সে ফিরে এল আবার লুসেটা তাকে দেখে জড়সড় হয়ে গেল। এলিজাবেথকে হেনচার্ড দেখতে পায় নি, সে তখন বিচুলি-গাদার ওপরে। এদিকে লুসেটা প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়ার মত অবস্থা—হেনচার্ড তাকে ধরে দরজার কাছে নিয়ে গেল।

কথা বলার মত অবস্থা হলে লুসেটা বেশ জোরেই বলল—তুমি—আমাকে বাঁচিয়েছ!

তুমি একদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলে, তার প্রতিদান দিলাম। হেনচার্ড খুব কোমলস্বরে উত্তর দিল।

এ্যাঁ—তুমি—তুমি কি করে এলে? উত্তরটা না শুনেই বলল লুসেটা।

তোমাকে খোঁজ করতে করতেই এসে পড়লাম। গত দু-তিন দিন ধরে একটা কথা বলব বলে ঘুরছি। কিন্তু তুমি ছিলে না তাই বলা হয় নি। কথা বলতে বোধহয় কষ্ট হচ্ছে তোমার?

না—না। কিন্তু এলিজাবেথ কই?

এই তো আমি! এলিজাবেথ খুশী খুশী ভাবে বলে উঠল। তারপর আর মইয়ের অপেক্ষা না করে বিচুলি-গাদার গা বেয়ে গড়গড় করে নেমে এল নিচে।

লুসেটার একদিকে হেনচার্ড এবং অপরদিকে এলিজাবেথ হাত ধরেছিল। এইভাবে তারা আস্তে আস্তে উঁচু রাস্তা বেয়ে উঠতে লাগল। চড়াই উৎরাই রাস্তায় নামতে নামতে হঠাৎ লুসেটার মনে পড়ল, সে হাত গরম রাখার পশমী থলিটা মরাইতে ফেলে এসেছে।

আমি দৌড়ে নিয়ে আসছি। এলিজাবেথ বলল। এক্ষুনি চলে আসব—আমার তো তোমার মত কষ্ট হয় নি। এলিজাবেথ দ্রুত পায়ে মরাইয়ের দিকে চলে গেল, আর এরা দুজন এগুতে লাগল সামনের দিকে।

জিনিসটা এমন কিছু ছোট নয় যে এলিজাবেথের খুঁজে পেতে দেরী হবে। বেরিয়ে এসে সে ষাঁড়টাকে দেখবার জন্যে দাঁড়াল একবার। জন্তুটার নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। দেখে তার কষ্ট হল খুব। হয়তো নিছক খেলা করার জন্যই সে অমন লাফালাফি করছিল, খুনখারাপি করা উদ্দেশ্য ছিল না। হেনচার্ড তাকে ধরে এনে বাইরে একটা খুঁটির সঙ্গে বেশ শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। অবশেষে ভাবতে ভাবতে এলিজাবেথ জোরে পা চালাল। এমন সময় উল্টোদিক থেকে একটা সবুজ-কালো এক্কাগাড়ী আসতে দেখা গেল—সামনে বসে আছে চালক ফারফ্রী।

তাকে আসতে দেখে বোঝা গেল লুসেটা কেন এতক্ষণ এই রাস্তায় বেড়াচ্ছিল একা একা। এলিজাবেথকে দেখতে পেয়ে ডোনাল্ড এগিয়ে এল। আনুপূর্বিক ঘটনা সব শুনল তার মুখে। এলিজাবেথ লক্ষ্য করল লুসেটার বিপদের কথা শুনে ফারফ্রী যেন ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েছে—এত উদ্বেগ সে তার মধ্যে আগে কখনও দেখে নি। এতই সে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে এলিজাবেথকে পাশে তুলে নিতে, সে কি করল না করল, এ সম্পর্কে আদৌ কোন চেতনা ছিল না।

মিঃ হেনচার্ডের সঙ্গে গেছে বলছ? জিজ্ঞেস করল ফারফ্রী।

হ্যাঁ—তিনিই ওকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গেছেন। এতক্ষণে হয়তো পৌঁছেও গেছেন।

বাড়ী পৌঁছতে পারবে তো ঠিক?

এলিজাবেথকে বেশ নিশ্চিত মনে হল।

তোমার বাবাই ওঁকে বাঁচিয়েছেন?

আবার কে?

ফারফ্রী ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। এলিজাবেথ বুঝতে পারল, কেন। ফারফ্রী ভাবছিল যে অগ্রবর্তী দু'জনের মধ্যে এখনই না উপস্থিত হওয়া ভাল। হেনচার্ড লুসেটাকে বাঁচিয়েছে, অতএব এখনই তাদের মধ্যে হাজির হলে তার জন্যে লুসেটার অধিক প্রীতি প্রকাশ পাওয়াটা যেমন অনুদার, তেমনই অনুচিতও বটে।

আপাততঃ তাদের মধ্যে আলাপ করার মত আর কিছু ছিল না। তাই প্রাক্তন প্রেমিকের পাশে এভাবে বসে থাকতে এলিজাবেথের লজ্জা লাগছিল। কিন্তু একটু পরেই শহরে ঢোকার মুখে সামনের দুজনের চেহারা চোখে পড়ল স্পষ্ট। মহিলাটি বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল, কিন্তু ফারফ্রী জোরে গাড়ী চালাল না। এরা

যখন শহরের প্রাচীরের কাছে পৌঁছুল, হেনচার্ড এবং তার সঙ্গিনী সামনে রাস্তার ভিড়ে হারিয়ে গেছে। এলিজাবেথ এখানেই নেমে পড়তে চাইল, তাই তাকে নামিয়ে দিল ফারফ্রী। তারপর পেছনদিক দিয়ে ঘুরে বাড়ীর পেছনে আস্তাবলের দিকে চলে গেল।

বাগান পার হয়ে যখন সে ঘরে গিয়ে ঢুকল, দেখল তার জিনিসপত্র সব যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। বাক্সপ্যাটরা সব টেনে নামানো হয়েছে নীচে। এইসব ঘটনায় অবশ্যি সে একটুও আশ্চর্য্য হল না। বাড়ীওয়ালী সব দেখাশুনা করছিলেন। ফারফ্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করল—এসব পাঠানো হবে কখন?

সন্ধ্যের আগে বোধহয় হবে না, বললেন তিনি। আমরা তো আজ সকালেই জানতে পেলাম যে আপনি চলে যাচ্ছেন, নইলে আগে থেকে গুছিয়ে রাখতাম।

ও, আচ্ছা! ঠিক আছে। ফারফ্রী তুষ্ট হয়ে বলল। সন্ধ্যের মধ্যে পাঠালেই হবে। কথা বলে আর সময় নষ্ট করবেন না, তাহলে রাত বারোটা বাজবে—এই কথা বলে সে সামনের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ হেনচার্ড আর লুসেটার অভিজ্ঞতা অন্য খাতে বইছিল। এলিজাবেথ মরাইয়ের দিকে চলে যাওয়ার পর হেনচার্ড নিজের বগলের তলায় লুসেটার হাত ঢুকিয়ে খুব স্বচ্ছন্দভাবে বলতে লাগল, (লুসেটা অবশ্যি চাইছিল হাত ছাড়িয়ে নিতে) —শোনো লুসেটা, গত দু'তিনদিন আমি ভীষণ ভাবে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেদিন রাতে তুমি যে কথা দিয়েছ, সে বিষয়েও চিন্তা করলাম। তুমি আমাকে বলেছিলে, 'আমি যদি মানুষ হই যেন তোমাকে বেশী চাপ না দিই।' কথাটা আমার মনে খুব লেগেছে। এব্যাপারে তোমাকে বেশী চাপ দেব না আমি—অন্ততঃ এখুনি তো বিয়ে করতে বলবই না। আগামী দু'এক বছরের মত না হয় আমাদের বিয়ের কথা তোলা থাক।

কিন্তু—কিন্তু—তোমার জন্যে আর কি করতে পারি আমি? লুসেটা বলল. তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি। এখন আমার টাকাপয়সা হয়েছে। তোমার উপকারের বিনিময়ে আমি বাস্তব কিছু একটা প্রতিদান দিতে চাই।

হেনচার্ড চিন্তা করতে লাগল। এমনটা সে ভাবে নি আগে। তারপর বলল,—একটা কাজ তুমি করতে পার—তবে সেটা ঠিক প্রতিদান নয়।

তবে কি! নতুন একটা আতঙ্কের সাথে বলল লুসেটা।

সেটা তোমাকে খুব গোপনে বলতে হবে। তুমি বোধহয় জান যে এবছর আমার সময় খুব খারাপ গেছে। এবার আমি পাগলের মত আন্দাজে বাজি ধরে ব্যবসা করেছি—যা আগে কখনো করি নি। আর সেই কারণেই পথে বসেছি।

সেজন্যে কি তুমি কিছু টাকা ধার চাও ?

না, না, হেনচার্ড প্রায় রেগে উঠে বলল—মেয়েলোকের পয়সা নেব, তেমন পুরুষ আমি নই—সে আমার যতই আপনজন হোক না কেন লুসেটা। তুমি আমাকে বাঁচাতে পার অন্যভাবে। আমি গ্রোয়ার-এর কাছে কিছু দেনা করেছি। আমার মান সম্মান তার হাতে। কিন্তু দিন পনের আমাকে ছাড় দিলেই সামলে নিতে পারি। তার জন্যে একটাই মাত্র উপায় আছে। তুমি শুধু ওর সামনে দেখাবে যে তুমি আমার বাগদত্তা—এবং দিন পনের পরেই আমাদের বিয়ে হতে যাচ্ছে। শোনো পুরোটা তোমাকে বলা হয় নি এখনো। এটা শুধু ওপর ওপর দেখাবে—আসলে আমাদের বিয়ে দু'বছর পরেও হতে পারে। অন্য কেউ জানবে না। শুধু তুমি আমার সঙ্গে মিঃ গ্রোয়ার-এর বাড়ী যাবে। তার সামনে আমি তোমার সঙ্গে এইরকম আভাস দিয়ে কথা বলব। ওকেও বলব ব্যাপারটা গোপন রাখতে। তাতে তার আপত্তির কোন কারণ নেই। দিন পনের সে অপেক্ষা করতে রাজী হবে। ততদিনে আমি ব্যবস্থা করে ফেলব। ওকে বলে দেব যে আমাদের বিয়ে দু'একবছরের মত পিছিয়ে গেল। শহরের কেউ জানবে না, তুমি আমার কত উপকার করলে। তুমি চাও বলেই বললাম—এই একটা রাস্তা আছে।

এই সময়টাকেই লোকে বলে 'গোধূলি'। সন্ধ্যে হতে বোধহয় মিনিট পনের বাকি। হেনচার্ড প্রথমে টের পেল না তার কথাগুলোর কি প্রতিক্রিয়া হল লুসেটার ওপর।

অন্য কিছু করা যায় না ? লুসেটা বলল। কথা শুনে মনে হচ্ছে, ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে তার।

এ তো খুব তুচ্ছ ব্যাপার। খানিকটা বিরক্তভাবে বলল হেনচার্ড। তুমি যতটা দিতে চাইছিলে তার তুলনায় কিছুই নয়। এই সেদিন তুমি যে কথা দিয়েছ তার শুরুমাত্র। আমি নিজেই তাকে এ কথা বলতে পারতাম। কিন্তু সে বিশ্বাস করবে না।

আমি যে বলতে চাইছি না—তা নয়—আসলে আমি তা বলতে পারব না। খুব বিপন্নভাবে বলল লুসেটা।

তুমি কি বলতে চাও ! রেগে উঠল হেনচার্ড। তুমি যে কথা দিয়েছ আমায়, সেটা আমি ইচ্ছা করলে জোর করে স্বীকার করিয়ে নিতে পারি।

তাহলেও আমি পারব না, মরিয়া হয়ে বলল লুসেটা।

কেন ? এই একটু আগেই আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তোমাকে এখুনি বিয়ে করার হাত থেকে রেহাই দিয়েছি।

কারণ—উনি যে সাক্ষী ছিলেন।

সাক্ষী? কিসের?

তোমাকে যখন বলতেই হবে—আমাকে গালমন্দ কোর না।

আচ্ছা—শুনি কি ব্যাপার?

আমার বিয়ের সাক্ষী—মিঃ গ্রোয়ার ছিলেন সেখানে।

বিয়ে?

হ্যাঁ, মিঃ ফারফ্রীর সাথে। মাইকেল! এ সপ্তাহেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে পোর্ট-ব্রেডিতে। এখানে না করার যথেষ্ট কারণ ছিল। মিঃ গ্রোয়ার সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কারণ ঐ সময়ে ওঁনারও কি কাজ পড়েছিল ওখানে।

হেনচার্ড বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তাকে চুপ হয়ে যেতে দেখে লুসেটা এত ভয় পেয়ে গেল যে বিড়বিড় করে সে কিছু একটা বলল, বোধহয় এই পক্ষকালটা কাটিয়ে ওঠার মত যথেষ্ট অর্থ ঋণ দিতে চাইল।

ওকে বিয়ে করেছ? হেনচার্ড বলল অবশেষে। হায় ভগবান! ওকে বিয়ে করে এলে! কোথায় আমাকে বিয়ে করার কথা তোমার!

অশ্রুপূর্ণ চোখে কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগল লুসেটা—রাগ করো না—কি হয়েছে শোনো। আমি ওকে এত ভালবাসি! আমার ভয় হয়েছিল; যদি পুরনো কথা সব ওকে বলে দাও তুমি—তাহলে আমার দুঃখের শেষ থাকবে না। তারপর যখন তোমাকে কথা দিলাম, তখনই রটনা শুনলাম যে তুমি তোমার আগের স্ত্রীকে গরু-ঘোড়ার মত বিক্রী করে দিয়েছিলে এক মেলায়। এ কথা শোনার পরেও কি করে আমি কথা রাখি? অমন ঝুঁকি নিয়ে আমি নিজেকে তোমার হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। কিন্তু ডোনাল্ডকে আমার হারাতে হত—যদি তখনই তাকে না বাঁধতে পারি। কারণ, তুমি যে আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে, আমাদের পুরনো পরিচয়ের কথা সব বলে দেবে। কিন্তু এখন নিশ্চয়ই আর বলবে না কিছু, তাই না মাইকেল? কারণ, বললেও এখন আর আমাদের আলাদা করে দিতে পারবে না।

সেন্ট পীটার্স গীর্জায় ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজল। তারপরেই শহরের সর্বত্র সান্ধ্য বাদ্যধ্বনি শুরু হয়ে গেল।

ও! তাহলে এইসব বাজনা-বাদ্যি বোধহয় সেইজন্যেই। বলল সে।

হ্যাঁ—বোধহয় সে বলে পাঠিয়েছে, অথবা মিঃ গ্রোয়ার হয়তো খবর দিয়েছেন।.... আচ্ছা—এখন কি আমি যেতে পারি? সে আজকে সারাদিন পোর্ট-ব্রেডিতে আটকেছিল—আমাকে কয়েকঘন্টা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

ও! তার মানে, আমি আজ বিকেলে তার স্ত্রীর জীবন বাঁচালাম।

হ্যাঁ—সেজন্যে সে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।

খুব করেছে আমার! কিন্তু তুমি মিথ্যেবাদী! আমায় কথা দিয়েছিলে—চেঁচিয়ে উঠল হেনচার্ড।

হ্যাঁ—কিন্তু সে আমি বাধ্য হয়ে কথা দিয়েছিলাম। তোমার পুরনো কথা সব জানতাম না তাই।

এখন তোমার পাওনা শাস্তিটি যদি তোমাকে দিই! এই নব-পরিণীত স্বামীটিকে যদি শুধু একটা কথা জানিয়ে দিই, কিভাবে তুমি আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিলে। যাবতীয় সুখ তোমার ফুঁয়ে উড়ে যাবে।

মাইকেল! এটুকু অনুগ্রহ কর আমায়—একটু উদার হও।

কোনো অনুগ্রহ তোমার প্রাপ্য নয়। আগে ছিল, এখন আর নয়।

আমি তোমার যাবতীয় দেনা শোধ করে দেব।

হুঃ, ফারফ্রীর বৌয়ের থেকে সাহায্য নেব আমি—কক্ষণো না। আর দাঁড়িয়ো না আমার সামনে। খারাপ কিছু বলে ফেলব, বাড়ী যাও।

দক্ষিণের দেওয়ালের পাশ দিয়ে, গাছের নিবিড় ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল লুসেটা। ব্যাণ্ডের বাজনা তখনো বেজে চলেছে। ইঁট পাথরে তার প্রতিধ্বনি উঠে, লুসেটার সুখের উৎসবে মেতে উঠল সবাই। লুসেটা কিন্তু লক্ষ্য করল না কিছু—পেছনের রাস্তা দিয়ে প্রায় দৌড়ে সে সবার অজান্তে নিজের বাড়ীতে এসে ঢুকল।

॥ ত্রিশ ॥

ফারফ্রী তার বাড়ীওয়ালীকে জিনিসপত্র সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল—সেটা তার বর্তমান আবাস থেকে লুসেটার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে। কাজটা খুব শক্ত ছিল না। কিন্তু বাধা পড়ছিল থেমে যাওয়ার জন্যে। বাড়ীওয়ালী মাঝে মাঝে বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। এমন হঠাৎ, মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিসে কেউ বাড়ী ছেড়ে দেয় কখনো!

পোর্টব্রেডি থেকে চলে আসার আগে, শেষ মুহূর্তে ফারফ্রী কিছু বিশিষ্ট খরিদ্দারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আটকে গেল ঠিক জন গিলপিনের মত। যতই দরকার থাকুক না কেন, ফারফ্রী এইসব খরিদ্দারদের অবহেলা করার মত লোক ছিল না। তাছাড়া লুসেটা আগে বাড়ী ফিরে যাওয়ায় অন্য সুবিধাও আছে। তার বাড়ীতে এখনও কেউ জানে না, ঘটনা কি ঘটেছে। সেটা তার পক্ষে ব্যক্ত করাই যথাযথ। তার স্বামীর

থাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ তারই দেওয়া উচিত। সেইজন্যেই ফারক্রী মাত্র দুদিনের বিবাহিতা স্ত্রীকে ভাড়া-করা গাড়ীতে করে পাঠিয়ে দিয়েছিল আগে, আর নিজে চলে গেল কয়েক মাইল তফাতে গম আর বার্লির গাদা দেখতে। লুসেটাকে সে বলে দিল, সন্ধ্যের দিকে কোনসময় নাগাদ ফিরতে পারে। এইজন্যেই, এই কয়েক ঘণ্টার বিচ্ছেদের পরে লুসেটা আবার সেই একই রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিল।

হেনচার্ডকে ছেড়ে এসে লুসেটা বহুচেষ্টায় নিজেকে শান্ত করল যাতে একটু পরেই সে তার বাড়ীতে ডোনাল্ডকে অভ্যর্থনা জানাতে পারে। একটা চিন্তাই তার মনে খুব শক্তি যোগাল যে, যা কিছুই ঘটুক না কেন, সে তাকে পেয়েছে। আধঘণ্টাটাক পরে, ফারক্রী এসে ঢুকল। লুসেটা এক চরম স্বস্তি আর সুখের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করল—যে গভীর অনুভূতি মাসাধিককালের দীর্ঘ বিরহেও সঞ্চারিত হয় না।

আজ বিকেলে ষাঁড়ের হাতে পড়ে কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, সাগ্রহে তা বর্ণনা করার পর লুসেটা বলল, একটা কাজ কিন্তু করা হয় নি—অথচ খুবই উচিত ছিল. সেটা হল এলিজাবেথকে আমাদের বিয়ের কথা জানানো হয় নি।

সেকি, তুমি বল নি? ফারক্রী চিন্তিতভাবে বলল। মরাই থেকে তুলে নিয়ে এলাম তাকে আসার পথে, অথচ আমিও তো বলি নি। আমি ভেবেছি সে হয়তো শুনেছে সব, কিন্তু লজ্জায় চুপ করে আছে।

না, না, কোত্থেকে শুনবে? আচ্ছা দেখছি দাঁড়াও! একবার ওর কাছ থেকে ঘুরে আসি। আচ্ছা ডোনাল্ড! ও যদি আগের মত আমার এখানে থাকে, তুমি কিছু মনে করবে না তো? মেয়েটি খুব ভাল।

না না, আমার আপত্তি করার কি আছে! ফারক্রী বোধহয় কিঞ্চিৎ অস্বস্তির সঙ্গে জানাল, কিন্তু সেকি এখানে থাকতে চাইবে।

হ্যাঁ থাকবে। লুসেটা আগ্রহের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই থাকবে। তাছাড়া বেচারী! ওর তো আর থাকার জায়গাও নেই।

ফারক্রী লুসেটার দিকে তাকিয়ে দেখল, সে তার ঐ স্বল্পবাক্ বন্ধুটির সম্পর্কে আদৌ সন্দেহ পোষণ করে না। এই সরল বিশ্বাসের জন্যেই তাকে আরও ভাল লাগল ফারক্রীর। সে তুমি যেভাবে পার চেষ্টা করে দেখ, সে বলল, আমিই তোমার বাড়ীতে এসেছি, তুমি তো আর আমার বাড়ীতে আসো নি।

দেখি, কথা বলে আসি। বলল লুসেটা।

দোতলায় এলিজাবেথের ঘরে ঢুকে লুসেটা দেখল সে একখানা বই নিয়ে ব্যস্ত। একটুক্ষণের মধ্যেই লুসেটা বুঝতে পারল যে এলিজাবেথ কিছুই শোনে নি।

আমি আর তোমার ঘরে যাই নি, মিস টেম্পলম্যান। বলল এলিজাবেথ।

যাচ্ছিলাম একবার দেখতে, তোমার ভয় কেটে গেছে কিনা, কিন্তু দেখলাম, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ। আচ্ছা ! গীর্জার ঘণ্টাটা কেন বেজে চলেছে বলো তো—কারও বিয়ে না কি ? নয়তো বোধহয় ক্রিসমাসের জন্যে তালিম দিচ্ছে।

লুসেটা 'হ্যাঁ' বলে একটা অনিশ্চিত উত্তর দিল, তারপর কিছু একটা বলার উদ্দেশ্যে বসল এলিজাবেথের পাশে। তুমি এত একা একা থাকো, বলল লুসেটা, কোথায় কি ঘটছে খবরও রাখো না। লোকে কি বলাবলি করছে, তাতে কানও পাতো না। অন্য মেয়েদের মত তোমারও বাইরে মেলামেশা করা উচিত, তাহলে আমাকে ওসব জিজ্ঞেস করতে না। শোনো, এখন যা বলছি শোনো।

এলিজাবেথ খুব গোছগাছ করে শুনতে বসল।

একটু পুরনো কথাই বলতে হয় তোমাকে। লুসেটা বলল। প্রতিটি কথা যেন তার সঙ্গিনীর কানে অসীম উৎসাহে প্রবেশ করছিল। কিছুদিন আগে তোমার সঙ্গে সেই যে বিবেকের দ্বন্দ্ব নিয়ে গল্প করেছিলাম, মনে আছে—সেই প্রথম প্রেমিক আর দ্বিতীয় প্রেমিকের কথা ? ভাঙা ভাঙা কথায় সে বুঝিয়ে দিল, কোন গল্প সে করেছিল আগে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে, তোমার সেই বান্ধবীর গল্প, লুসেটার চোখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ অর্থটি ধরার চেষ্টা করছিল। সেই দুই প্রেমিকের কাহিনী—পুরনো আর নতুন প্রেমিক। দ্বিতীয়টিকে সে বিয়ে করতে চায়—অথচ প্রথমটিকে বিয়ে করা উচিত। ভাল পথ ছেড়ে খারাপটিই তার পছন্দ।

না, না, খারাপ পথে ঠিক যাই নি সে। লুসেটা তাড়াতাড়ি বলল।

কিন্তু তুমি বলেছিলে যে সেই বন্ধু- মানে আসলে তুমি—এলিজাবেথ এবারে সব রহস্য ভেঙে দিয়ে বলল—প্রথমজনকে বিয়ে করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

লুসেটা ধরা পড়ে যাওয়ায় একবার ফিক করে হেসে ফেলল। তার পরমুহূর্তেই উদ্বিগ্নভাবে বলল, তুমি কিন্তু কাউকে বলবে না একথা, এলিজাবেথ ! বলে দেবে ?

তুমি না চাইলে, কক্ষনো বলব না।

তাহলে আরও শোনো, ব্যাপারটি আরও জটিল—আমার গল্পে যা শুনেছ, তার থেকে অনেক অনেক বেশী। আমি আর সেই প্রথম ভদ্রলোকটি ঠিক করেছিলাম পরস্পর বিয়ে করে ফেলব। তিনি একজন বিপত্নীক বলে মনে করতেন নিজেকে। আসলে তিনি অনেকদিন যাবৎ স্ত্রীর কোনও খবর পান নি। কিন্তু পরে তাঁর স্ত্রী ফিরে এলে, আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু সেই স্ত্রী এখন মারা গেছে। ভদ্রলোক আবার এসে বলছেন আমাকে, যে এখন আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এলিজাবেথ ! এ সবই আমার কাছে এখন নতুন করে প্রেম করার মত। কারণ ভদ্রমহিলা ফিরে আসায়—আমি সবরকম প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত

হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু ইদানীং কি তুমি নতুন করে আবার কথা দাও নি? তার অল্পবয়সী বন্ধুটি শান্ত অনুমানের ভঙ্গিতে বলল। প্রথম ব্যক্তিটিকে সে গৌরবের আসনে বসিয়ে দিল।

সে প্রতিশ্রুতি আমাকে ভয় দেখিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

হুঁ, তা হয়েছে। কিন্তু অতীত জীবনে যদি তোমার মত কারও জীবনে কোনও পুরুষের আবির্ভাব হয়ে থাকে, তবে সম্ভব হলে তাকেই বিয়ে করা উচিত, যদি তার মনে কোনও পাপ না থাকে।

লুসেটার চেহারা থেকে ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে গেল। সে বলল—কিন্তু তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে আমার ভয় লাগল। সত্যি, ভয় লাগল—আর নতুন করে এই কথা দেওয়ার আগে পর্যন্ত আমি সব ঘটনা শুনিও নি।

তাহলে একটাই রাস্তা আছে, তোমার মোটেই বিয়ে না করা উচিত।

কিন্তু ভাল করে চিন্তা করো—ভেবে দেখো—

হুঁ ভেবে দেখেছি। তার সঙ্গিনীকে খুব দৃঢ় মনে হল। খুব ভালই বুঝতে পেরেছি আমি, যে ঐ ব্যক্তিটি আমার বাবা। এবং বিয়ে করতে হলে, তোমার ওঁকেই বিয়ে করা উচিত, নইলে কাউকেই নয়।

না, আমি তা মানি না, আবেগভরে বলল লুসেটা।

মানো, আর না মানো, এটাই ঠিক।

লুসেটা ডানহাত দিয়ে তার চোখদুটো চেপে ধরল, যেন আর সে যুক্তি খাড়া করতে পারছে না আর বাঁ হাতটা তুলে ধরল ঠিক এলিজাবেথের সামনে।

ও! তুমি তো দেখছি ওঁকে বিয়ে করে ফেলেছ। লুসেটার আঙুলের দিকে তাকিয়ে আনন্দে লাফ দিয়ে উঠল এলিজাবেথ। কখন হল বিয়ে? আমাকে কিছু না জানিয়ে, এতক্ষণ শুধু রাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা! খুব ভাল করেছ। শুনেছি একবার নেশার ঘোরে উনি আমার মার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। কখনও কখনও অবশ্যি খুব নিষ্ঠুর মনে হয় ওঁকে, কিন্তু তুমি ঠিক পারবে ওঁকে বশে রাখতে। তোমার সৌন্দর্য্য আছে, সম্পদ আছে, রুচি আছে। তোমার মত মেয়েকে উনি খুব ভালবাসবেন—তাতে আমাদের তিনজনেরই যথেষ্ট সুখের কথা।

না গো এলিজাবেথ! লুসেটা বিপন্নভাবে বলল। বিয়ে আমি করেছি, কিন্তু সে অন্য একজনকে। মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম আমি—ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, পুরনো ঘটনা জানাজানি হয়ে হয়তো আমি তার ভালবাসা হারাব—তাই কাউকে না জানিয়েই আমি বিয়ে করে ফেলেছি। যাই ঘটুক না কেন, অন্ততঃ সপ্তা খানেকের সুখ

যেন পাই।

তুমি—বিয়ে করেছ—মিঃ ফারফ্রীকে! এলিজাবেথ বলল।

লুসেটা মাথা নাড়ল। এতক্ষণে সে অনেকটা সামলে নিয়েছে।

সেইজন্যেই গীর্জায় ঘণ্টা বাজছে। লুসেটা বলল। আমার স্বামী নিচে অপেক্ষা করছেন। আর একটা ভাল বাড়ী না পাওয়া পর্যন্ত তিনি এখানেই থাকবেন। এবং তুমিও আগের মত এখানেই থাক—এটাই আমি চাই—সেকথাও আমি বলেছি তাঁকে।

আমাকে একা একা চিন্তা করে দেখতে দাও। সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল। অপরিসীম দক্ষতায় অন্তরের যাবতীয় ঝড় বাতাস কুলুপ এঁটে বন্ধ করে দিল সে।

ঠিক আছে, তাই করো। আমি নিশ্চিত যে, একসঙ্গে আমরা ভালই থাকব।

লুসেটা নিচে চলে গেল ডোনাল্ডের কাছে। সেখানে তাকে খুব সহজ ভাবে বসে থাকতে দেখে, লুসেটার যথেষ্ট আনন্দ সত্ত্বেও অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। এলিজাবেথের জন্যে এ অস্বস্তি নয়, কারণ তার আবেগের জগৎ সম্পর্কে কোনো খবরই রাখত না লুসেটা। কিন্তু উদ্বেগটা হচ্ছিল হেনচার্ডকে ঘিরে।

সুসান হেনচার্ডের মেয়ে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল যে সে আর এ বাড়ীতে থাকবে না। লুসেটার আচরণে কিছুটা আশাহত হওয়ার জন্যে তো বটেই তা ছাড়া ফারফ্রী এত নিশ্চিতভাবে অনুরক্ত ছিল তার প্রতি যে সে ভাবল আর থাকা যায় না এখানে।

তখনও সন্ধ্যা ভাল করে নামে নি। এলিজাবেথ তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে গেল। সবকিছু তার অত্যন্ত পরিচিত বলে একটা উপযুক্ত আশ্রয় খোঁজ করে নিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সেই রাত্রেই নতুন আশ্রয়ে চলে যেতে মনস্থ করে নিঃশব্দে ফিরে এল সে। সুন্দর পোষাকটি খুলে রেখে একটি সাধারণ জামা পরল। ঐটিই তার একমাত্র ভাল পোষাক। সেটিকে ভাঁজ করে তুলে রাখল। এখন তাকে হিসেব করে চলতে হবে। লুসেটার উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে রাখল—কারণ লুসেটা ফারফ্রীর সঙ্গে দরজা বন্ধ করে বসে গল্প করছে। তারপর একটা ঠেলাওয়ালাকে ডেকে মালপত্র তুলে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল তার নতুন বাসায়। হেনচার্ডের বাড়ীও এই রাস্তায়। প্রায় তার বাড়ীর উল্টোদিকেই পড়ল এলিজাবেথের নতুন বাসা।

এখন সে বসে বসে চিন্তা করতে লাগল জীবিকা নির্বাহের উপায়। তার সৎ পিতা তার জন্যে যে মাসোহারার ব্যবস্থা করেছেন তাতে কোনোরকমে দু মুঠো জোটানো যেতে পারে। ছোটবেলায় নিউসনের সঙ্গে থাকতে সে যে জাল-বোনা শিখেছিল সেটাই এখন এই বিপদের দিনে কাজে লাগতে পারে। এযাবৎ সে যা

কিছু পড়াশুনো করেছে তাতেও কিঞ্চিৎ উপকার হওয়া সম্ভব।

এতক্ষণে ক্যাস্টারব্রিজের সর্বত্র এই নতুন বিবাহের বার্তা প্রচারিত হয়ে গেছে। খুব চীৎকার করে কেউ কেউ আলোচনা করল কালভার্টে বসে। গোপনে ফিসফিস করে কেউ আলাপ করল। দোকানের কাউণ্টারে আর 'থ্রী মেরিনার্স'-এ এ সংবাদ খুশীর হাওয়া বইয়ে দিল। সবথেকে বেশী যে কথাটা আলোচিত হ'ল—তা হচ্ছে এখন দেখবার বিষয়—ফারফ্রী তার ব্যবসা বিক্রী করে দিয়ে স্ত্রীর ধনদৌলত নিয়ে বাবুটি হয়ে বসে, নাকি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এখনও তার ব্যবসাপত্তর চালিয়ে যায়। এটাই বিশেষ নজর রাখবার মত।

।। একত্রিশ ।।

বিচারকদের সামনে ফার্মিটি-বুড়ী যে উত্তর দিয়েছিল, খুব দ্রুত সে কথা চাউর হয়ে গেল সর্বত্র। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্যাস্টারব্রিজে আর কেউ বাকি রইল না, যে বহুবছর আগে ওয়েডনের মেলায় হেনচার্ডের সেই ক্ষ্যাপামির কাহিনী কানে শুনল না। এমনই নাটকীয় সে কাহিনী, পরের জীবনে হেনচার্ড উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করলেও কোনো দাম হল না তার। আগে থেকেই এ ঘটনা সকলের জানা থাকলে হয়তো এমন সাড়া জাগানোর মত কিছু হ'ত না—কিন্তু এখনকার এই বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক বছর আগের সেই একরোখা যুবকের মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত। এখন সেই তরুণ বয়সের কলঙ্ক ভয়ানক এক অপরাধের মূর্তি ধরে তার বর্তমানকে মসীলিপ্ত করে দিল।

আদালতে সেদিনকার সেই ঘটনা যত তুচ্ছই হোক না কেন, হেনচার্ডের ভাগ্যের পতন ডেকে আনতে তাই ছিল যথেষ্ট। সেই দিন প্রায় সেই মুহূর্ত থেকেই সৌভাগ্য আর সম্মানের চূড়ো থেকে নেমে আসা শুরু হল তার। কত তাড়াতাড়ি যে পতন নেমে এল ভাবা যায় না। অবিবেচকের মত কেনাবেচা করে ব্যবসার ক্ষেত্রে লোকসান খেতে হয়েছিল যেমন, ততোধিক বেগে তার সামাজিক মর্য্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে গেল একেবারে।

বাইরে বেরুলে এখন হেনচার্ড আর লোকের বাড়ীর দিকে না তাকিয়ে রাস্তায় তাকিয়ে থাকে। লোকের পা ছাড়িয়ে মুখের দিকে দৃষ্টি ওঠে না—অথচ একদিন তাকে দেখলে শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদার তেজে অন্যদের দৃষ্টি নত হয়ে আসত পথে।

নতুন ঘটনা ঘটতে লাগল তার সর্বনাশ এগিয়ে আনার পথে। একটা লোককে বিশ্বাস করে সে অনেক টাকা ধার দিয়েছিল, সেই লোকটিই ভরাডুবি ঘটিয়ে দিল। একটি পয়সাও দেনা শোধ করতে পারল না। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে হেনচার্ড আরও কতকগুলো নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলল। ব্যবসা করতে গেলে যা নিতান্ত অপরিহার্য—সেটাই সে রক্ষা করতে পারল না। নমুনার সঙ্গে বিক্রীত সামগ্রীর অমিল ধরা পড়ল। একজন কর্মচারীর ভুলেই এমনটি ঘটে গেল। নমুনা হিসেবে যে গম রাখা ছিল, বিক্রী করার সময় সেই লোকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু গম দিয়ে দিল। বলে-কয়ে দিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু এই প্রবঞ্চনা, বিশেষতঃ এই মুহূর্তে, হেনচার্ডের সুনামকে একেবারে আস্তাকুঁড়ে নামিয়ে আনল।

তার এই ব্যর্থতার কাহিনী আর পাঁচটা ঘটনার মতই। একদিন এলিজাবেথ 'কিংস আর্মস' হোটেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেদিন হাট বার নয়—অথচ বহুলোকের জমায়েৎ হয়েছে। এলিজাবেথ কিছু জানে না দেখে একজন পথচারী বিস্মিত হল. তারপর বলল, মিঃ হেনচার্ডকে দেউলিয়া ঘোষণা করার জন্যে কমিশনারদের সভা বসতে যাচ্ছে। এলিজাবেথের চোখে জল এসে গেল। হেনচার্ড তখন ঐ সভাতেই আছে শুনে এলিজাবেথ দেখা করতে যাচ্ছিল কিন্তু সেদিন তাকে কেউ হোটেলে ঢুকতে দিল না।

দেনাদার আর পাওনাদাররা একটা সামনের দিকের ঘরে জড় হয়েছে। জানালা দিয়ে হেনচার্ড দেখল এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। ঘরের মধ্যে কথাবার্তা তখন শেষ হয়ে গেছে। পাওনাদাররা চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে। এলিজাবেথকে দেখে হেনচার্ড কিছুটা আনমনা হয়ে গেল। জানালা থেকে মুখ সরিয়ে সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে গলা চড়িয়ে বলল—দেখুন আমার যে সম্পত্তির কথা আমি বলেছি বা ব্যালান্স-শীটে যা পাচ্ছেন তাছাড়া আরও এইগুলো আছে। এ সবই আপনাদের। অন্যান্য জিনিসের মত এগুলোও আমি দিয়ে দিতে চাই। বলে পকেট থেকে সোনার ঘড়ি বার করে টেবিলে রাখল। তারপর তার ম্যানি-ব্যাগ বার করল। অন্যান্য ফার্মারদের মত খুব সুদৃশ্য হলুদ ক্যানভাসের তৈরী ব্যাগ। তার থেকে যাবতীয় পয়সাকড়ি উপুড় করে ঢেলে দিল ঘড়ির পাশে। তারপর বলল—আমার যা কিছু ছিল সব দিয়ে দিলাম। আরও কিছু থাকলে অবশ্যি ভাল হোত।

সমস্ত পাওনাদার ও চাষীরা ঘড়ি আর টাকার দিকে তাকাল একদৃষ্টে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে তাকাল বাইরে। ওয়েদারবেরীর একজন ফার্মার, জেমস এভার্ডিন বেশ আন্তরিকস্বরে বলল—না না হেনচার্ড, এ আমরা নিতে পারি না। তুমি বলেছ সেটাই অনেক। এগুলো তুমি রেখে দাও। কি আপনারা কি, বলেন—তাই তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এ আমরা নিতে চাই না। গ্রোয়ার নামে আর একজন পাওনাদার বলল।

ওগুলো ওঁরই থাক। পেছন থেকে বিড়বিড় করে বলল গম্ভীর প্রকৃতি এক যুবক। তার নাম বোল্ডউড। বাকি সবাই একবাক্যে সমর্থন করল তাকে।

হেনচার্ডকে উদ্দেশ্য করে সিনিয়র কমিশনার বললেন—ঠিক আছে। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক তবে আমি কখনও এমন সৎ এবং ভদ্র দেনাদার কাউকে দেখিনি। ব্যালান্স-শীট আমি পরীক্ষা করে দেখেছি—এঁর মধ্যে কোনও কারচুপি নেই। আমাদের কোনও কষ্ট পেতে হয় নি, এঁর মধ্যে মিথ্যা বা চেপে যাওয়ার কোনও চেষ্টা নেই। হঠকারিতার জন্যেই আজ এমন দশা হয়েছে বটে কিন্তু কাউকে ঠকানো'র ইচ্ছা মোটেই ছিলনা।

কথাগুলো শুনে হেনচার্ড যে আরও কত দুর্বল হয়ে গেল তা শ্রোতারা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। আবার জানলা দিয়ে তাকাল সে বাইরে। কমিশনারের বক্তব্য শোনার পর সবার মুখেই একটা ঐক্যমত শোনা যেতে লাগল। সভা ভেঙে গেল তারপর। সবাই চলে গেলে হেনচার্ড দেখল ঘড়িটা তারা ফেরৎ দিয়ে গেছে। নিজের মনে মনে সে বলল—এতে তো আমার আর কোনও অধিকার নেই। যা আমার নয়, তা আমি নিতে পারি না। পুরনো কথা মনে পড়ায় সে উল্টোদিকে ঘড়ির দোকানে গেল। দোকানদার যে দামে রাজী হল তাতেই ঘড়িটা বিক্রী করে দিল। তারপর টাকাটা নিয়ে সে ভার্ণওভারে এক ছোটখাট পাওনাদারের বাড়ী গেল। তার হাতে তুলে দিল টাকাটা।

হেনচার্ডের যাবতীয় সম্পত্তিতে নম্বর লাগান শেষ হলে নীলাম শুরু হয়ে গেল। শহরের লোক হঠাৎ যেন সহানুভূতি বোধ করতে লাগল তার জন্যে। এতদিন কিন্তু তিরস্কার ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি ছিল না। এখন প্রতিবেশীদের কাছে হেনচার্ডের পুরো জীবন চিত্রটা ভেসে উঠতে লাগল। কিভাবে নিঃসম্বল অবস্থা থেকে শুধু একটি মাত্র গুণ অদম্য উৎসাহের জোরে নিজেকে সে প্রাচুর্যের শিখরে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। এই শহরে যখন সে প্রথম আসে একজন ভ্রাম্যমান কিষাণ হিসেবে তখন অপরকে দেখানোর মত নিজের প্রতিভা বলতে—এই উদ্যমই ছিল তার সবকিছু। এখন তার প্রতিবেশীরা আশ্চর্য্য হল, তার এই পরিণতিতে দুঃখিত হল।

এলিজাবেথ হাজার চেষ্টা করেও দেখা করতে পেল না। অন্য কেউ তার ওপরে আস্থা না রাখলেও এলিজাবেথ তাকে বিশ্বাস করত এখনও। আগেকার দুর্ব্যবহার এলিজাবেথ মনে রাখে নি। যদি তার কোনো উপকারে লাগতে পারে এই কথাটা জানাবার জন্যেই এলিজাবেথ দেখা করতে চাইছিল।

সে চিঠি লিখল কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। তখন গেল হেনচার্ডের বাড়ী। সেই বিরাট বাড়ী—যেখানে সে কিছুদিন খুব সুখে বাস করেছিল। বড় বড় কাচের জানলা। সামনের দিকটা লাল ইঁট বেরিয়ে আছে। কিন্তু হেনচার্ডকে সেখানে পাওয়া গেল না। প্রাক্তন মেয়র তার বাড়ী ছেড়ে এখন জোপের কুটিরে গিয়ে উঠেছে। প্রায়োরি মিলের পাশে সেই বিষণ্ণ পল্লীতে—যেখানে একদিন রাত্রে হাঁটতে হাঁটতে এসেছিল হেনচার্ড—যে রাত্রে সে প্রথম জানতে পারে যে এলিজাবেথ তার মেয়ে নয়। এলিজাবেথ এখন সেইদিকেই গেল।

কিছুতেই সে ভেবে পাচ্ছিল না এমন জায়গায় থাকাটা হেনচার্ড পছন্দ করল কি করে—আবার ভাবছিল প্রয়োজনের সময় পছন্দ অপছন্দের বিচার করা যায় না। কোন প্রাচীনকালের ধর্মযাজকদের পোঁতা গাছগুলো এখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনদিকে সেই কারখানা, যেখান থেকে বহু বছর ধরে একটানা আওয়াজ ভেসে আসে। কুঁড়েঘরটার দেওয়ালগুলো পাথরেরই তৈরী। ভাঙা চোরা জানালা, খিলান, কোনও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, এইসব জোড়াতালি দিয়ে তৈরী করা।

এই কুঁড়েতেই জোপের দুখানা ঘর আছে। এই জোপ একদিন ছিল হেনচার্ডের কর্মচারী। অনেক তিরস্কার ও মিষ্ট কথা শুনেছে, আবার বরখাস্তও হয়েছে। সে'ই এখন গৃহকর্তা। কিন্তু এখানেও এলিজাবেথ হেনচার্ডের সাক্ষাৎ পেল না।

তাঁর মেয়ের সঙ্গেও দেখা করা বারণ? এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ আপাততঃ কারও সঙ্গে নয়। সেইরকমই আদেশ আছে। উত্তর পেল সে। ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে সে গমের গুদাম, বিচুলিগাদার পাশ দিয়ে এগুচ্ছিল। এই এলাকাটাই হেনচার্ডের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিল একদা। এখন তার আর কোনও প্রভাব নেই এখানে—একথা এলিজাবেথ জানত। কিন্তু হঠাৎ পরিচিত এই দৃশ্যের দিকে তার দৃষ্টি আটকে গেল। গাঢ় সীসা রঙ দিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে মুছে দেওয়া হচ্ছে হেনচার্ডের নাম—নামের অক্ষরগুলো তবুও দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেমনভাবে কুয়াশার মধ্যে জাহাজ দেখা যায় অস্পষ্ট ভাবে। তার উপরে টকটকে সাদা রঙ দিয়ে লেখা হচ্ছে ফারফ্রীর নাম।

অ্যাবেল হুইটল তার ল্যাকপেকে শরীর নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল, মিঃ ফারফ্রী এসব কিনেছেন নাকি?

আজ্ঞা—হাঁ—মিস হেন্কেট। বলল অ্যাবেল। পুরো ব্যবসাটাই—কর্মচারীদের শুদ্ধ কিনে নিয়েছেন মিঃ ফারফ্রী। ওঃ আগের থেকে অনেক ভাল আছি আমরা। অবিশ্যি তোমার কাছে একথা বলা ঠিক হচ্ছে না। আগের থেকে অনেক বেশী কাজ করছি কিন্তু পরাণে ভয় নেই। ওঃ ভয়ের চোটে আমার চুলগুলোই উঠে গেছে।

কেউ হৈচৈও করছেনা, দুমদাম করে দরজাও বন্ধ করছে না। হপ্তায় অবশ্যি এক শিলিং কম পাচ্ছি আগের থেকে—তা'হলেও ভাল আছি। দিনরাত তটস্থ হয়ে থাকলে কাঁহাতক ভাল লাগে, তাই না মিস হেক্কেট ?

বাপারটা মোটামুটিভাবে ঠিকই। হেনচার্ডের গুদামগুলো এতদিন নিঃসাড়ে পড়েছিল। তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করার দিনগুলোতে কাজকর্মের সন্ধানই ছিল না। এখন নতুন দখলদার এসে পড়ায় নতুন করে প্রাণের জোয়ার এসেছে। বড় বড় বস্তার আনাগোনা শুরু হয়েছে। রোদ্দুরে বস্তার চেনগুলো ঝলসে ওঠে। চতুর্দিকে ব্যস্ততা। রোমশ হাতগুলো দরজার বাইরে বেরিয়ে আসছে—বস্তাগুলোকে টেনে নিচ্ছে ভেতরে। বিচুলি গাদার আশেপাশে খড়কুটো উড়ে বেড়াচ্ছে। পোকা-মাকড় ভোঁ ভোঁ করছে। উঠোনে ওজন করার সুবিধের জন্যে বিশাল দাঁড়িপাল্লা। আগে এসবের বালাই ছিল না, আন্দাজেই চলত সব।

॥ বত্রিশ ॥

ক্যাস্টারব্রিজ শহরের যেদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সেখানে দুটি ব্রিজ আছে। একটা ঠিক হাই স্ট্রীটের পরেই। বহু প্রাচীন আবহাওয়ার স্মৃতি বহন করছে তার ইট-গুলো। ঐ হাই স্ট্রীট থেকেই একটা সরুগলি নেমে গেল ডার্ণওভার লেনের দিকে। তাই এই ব্রিজটাকে ধনীমানী এবং গরীব দুঃখী উভয়েরই মিলনস্থল বলা যায়। আর দ্বিতীয় ব্রিজটা পাথরের তৈরী—আরও খানিকটা আগে প্রায় মাঠের মধ্যে, যদিও শহরের সীমানার বাইরে নয়।

এই ব্রিজদুটো যেন কথা বলতে জানত। এদের প্রতিটা ইট-পাথরে পুরনো দিনের স্মৃতি। বহু পুরুষ ধরে বহু মানুষের ব্যস্ত ও অলস মুহূর্তের অগণিত পদচিহ্ন এদের বুকে। বহুলোক হয়তো এখানে এসে তাদের মনের কথা খুলে বলেছে। বিশেষতঃ বহু ব্যর্থতা ও বেদনাকে আকর্ষণ করত এই ব্রিজদুটো। প্রেম, ব্যবসা, সৌজন্য বা অপরাধ, যে কোন বিষয়ে ব্যর্থ হলে মানুষ এখানে আসত। অন্য কোথাও না গিয়ে এই ব্রিজদুটো যে কি কারণে এত পছন্দ ছিল তাদের, কেউ তা জানে না।

তবে কাছাকাছি এই ইটের ব্রিজ আর দূরের পাথরের ব্রিজে যে দুধরণের লোক যাতায়াত করত—তাদের পার্থক্য ছিল খুব স্পষ্ট। একেবারে নিচু শ্রেণীর লোকদের পছন্দ ছিল শহরের কাছাকাছি ব্রিজটা—অপরের দৃষ্টিপাতে তাদের লজ্জাবোধ হত্না।

তাদের সাফল্য কখনই আহা মরি ছিল না, বেশিরভাগ লোকেরই জুতোর বাঁধন খোলা, কোমরের বেল্ট ঢিলে হয়ে পাছার ওপর ঝুলে পড়েছে, হাত দুটো পকেটে ঢোকানো। বিপদে তারা দীর্ঘশ্বাস না ছেড়ে থুথু ফেলে। জোপ মাঝে মাঝে দুঃখের দিনে এখানে এসে দাঁড়াত। তেমনি আসত মাদার কাক্সম, ক্রিষ্টোফার কোনী আর বেচারী অ্যাবেল হুইট্‌ল্।

দূরের ব্রিজটাতে যেসব দুঃখীর সমাবেশ হত তারা অপেক্ষাকৃত ভদ্রশ্রেণীর। তাদের মধ্যে ছিল যারা নানা বেদনায় ভুগছে, পেশাদার ব্যক্তির মধ্যে যারা অযোগ্য অথবা সেইসব ভদ্রলোকরা যারা সকালের খাওয়া দুপুরের খাওয়া এবং রাত্রির খাওয়ার মধ্যবর্তী সময়গুলোকে খরচ করতে জানে না। এইসব লোকেরা সাধারণতঃ প্যারাপেট ছাড়িয়ে তাকিয়ে থাকে নিচে জলের দিকে। অমনভাবে জলের দিকে তাকিয়ে-থাকা যে কোন লোককে দেখে বলা যেতে পারে যে সে জগতের থেকে সদয় এবং ভদ্র ব্যবহার পায় নি। আর শহরের দিকের ব্রিজটায় যারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের অত লাজলজ্জা নেই। প্যারাপেটের দিকে পিছন করে তারা মানুষের মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে। অবশ্যি অন্তরের ব্যথা ভুলতে পারে না তাই অপরিচিত কাউকে এগিয়ে আসতে দেখলে তাড়াতাড়ি জলের দিকে তাকায় যেন সেখানে কি এক আশ্চর্য্য মাছ চোখে পড়েছে। নদীর জলে কিন্তু পাখনাধারী কোন প্রাণীই মানুষের শিকার হতে হতে আর বাকি ছিল না।

অত্যাচার পীড়ন যার দুঃখের কারণ সে চাইত লক্ষপতি হ'তে। অপরাধ বা পাপ দুঃখের কারণ হলে, সে ভাবত কোনও সন্ত বা দেবদূত হলে ভাল ছিল আর ব্যর্থপ্রেম যাদের দুঃখের কারণ তারা ভাবত বহু নারীর প্রেমিকপুরুষ অ্যাডোনিসের কথা। কেউ কেউ শোনা যেত এমন একদৃষ্টে এই নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে যে তাদের দেহগুলোও সেই দৃষ্টিকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। তারপর পরদিন সকালবেলা দেখা যায় তারা যাবতীয় দুঃখের পরপারে চলে গেছে—কেউ কেউ এখানেই ভেসে ওঠে কেউ কেউ বা একটু এগিয়ে ব্ল্যাকওয়াটার নামে নদীর যে অংশটা খুব গভীর, সেখানে।

এই ব্রিজেই এসে বসেছিল হেনচার্ড। তার মত অনেক হতভাগ্য আগেই এসেছে। তার বর্তমান ঠিকানাও নদীর ধার বেয়ে ঐ রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই। বিকেলবেলা বেশ বাতাস বইছিল। ডাণওভারের গীর্জায় পাঁচটা বাজল ঢং ঢং করে। ভিজে স্যাৎসেঁতে বাতাসের মধ্যে কে একটা লোক যেন পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল এবং পেছন থেকে ডাকল নাম ধরে। হেনচার্ড ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লোকটা জোপ, তার পুরনো কর্মচারী। এখন সে অন্যত্র কাজ করে। হেনচার্ড তাকে অপছন্দ করত। তথাপি বর্তমান আশ্রয়ের জন্যে সে জোপের কাছেই গিয়েছিল। ক্যাস্টারব্রিজে

একমাত্র এই লোকটির মতামতকেই সে অবজ্ঞা করলেও হাল্কা তাচ্ছিল্যভরে দেখত।

হেনচার্ড প্রায় চোখে না পড়ার মত করে মৃদু মাথা নাড়ল। জোপ থেমে গেল তার সামনে।

ওরা স্বামী-স্ত্রী তো নতুন বাড়ীতে উঠে গেছে। বলল জোপ।

ও! অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল হেনচার্ড। কোন বাড়ীতে?

কেন, আপনার পুরনো বাড়ীতে।

আমার বাড়ীতে? আশ্চর্য হয়ে ঝাঁকি দিয়ে বলল হেনচার্ড—আমার বাড়ী ছাড়া শহরে আর বাড়ী পাওয়া গেল না?

না, কেউ না কেউ তো ওখানে বাস করবেই। এখন আপনি করলেন না—অতএব ওরা থাকলেই বা ক্ষতি কি?

কথাটা ঠিকই। হেনচার্ড বুঝল যে তাতে তার কোন ক্ষতি নেই। ফারফ্রী এ'র আগেই গুদাম ইত্যাদির দখল নিয়েছিল—এখন বাড়ীতেই এসে উঠল কারণ নৈকট্যের জন্যে কাজকর্মের সুবিধা হয়। তাহলেও সেই বিশাল অট্টালিকার প্রশস্ত ঘরগুলো সে ভোগদখল করবে—আর যে আসল মালিক সে রাত কাটাবে কুঁড়েঘরে, এটা হেনচার্ডের মনে অবর্ণনীয় বেদনা জাগিয়ে তুলছিল।

জোপ বলে যেতে লাগল—আরো শুনেছেন তো! সেই যে ছোকরা আপনার ফার্ণিচারের জন্যে সবথেকে বেশী দর হাঁকছিল নীলামের সময়—সে নাকি ফারফ্রীরই লোক। আসবাবপত্র কিছুই আর ঘর থেকে বেরয় নি—বাড়ীটাতো সে লীজ নিয়ে নিয়েছে।

আমারই ফার্ণিচার পর্যন্ত! তাহলে তো ও আমার এই দেহ আর আত্মাটাও কিনে নিতে পারে।

পারেই তো! আপনি যদি বিক্রী করেন তবে কিনতে পারে। একদা বাদশা-তুল্য তার মনিবের অন্তরে এই ব্যথার ক্ষত দেগে দিয়ে জোপ তার গন্তব্যপথে চলে গেল। হেনচার্ড নাচতে নাচতে চলা নদীর দিকে তাকিয়েই রইল। তাকাতে তাকাতে তার মনে হচ্ছিল ব্রিজটা তাকে শুদ্ধ অনবরত পিছু হঠছে।

নিচের মাটি আরও কালো দেখাতে লাগল আর ওপরের আকাশ হয়ে উঠল আরও ধূসর। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যখন মনে হল কেউ কালি লেপ্টে দিয়েছে, তখন এই বিশাল পাথরের ব্রিজটার দিকে আর একজন কেউ এগিয়ে এল। সে গাড়ী করে শহরের দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ খিলানের নিচ দিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় এসে গাড়ীটা থেমে গেল। মিঃ হেনচার্ড?—ফারফ্রীর গলা শোনা গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হেনচার্ড।

ফারফ্রী দেখল অন্ধকারে সে চিনতে ভুল করে নি। গাড়ীর চালককে বলল গাড়ী নিয়ে বাড়ী চলে যেতে। সে নিজে নেমে এগিয়ে গেল তার প্রাক্তন বন্ধুর দিকে।

মিঃ হেনচার্ড, শুনলাম আপনি চলে যাচ্ছেন এখান থেকে? ফারফ্রী প্রশ্ন করল—সত্যি নাকি?

কয়েক মুহূর্তের জন্যে হেনচার্ড উত্তরটাকে চেপে রাখল। তারপর বলল—হ্যাঁ সত্যি। কয়েক বছর আগে তুমি যেখানে চলে যাচ্ছিলে সেখানেই যাচ্ছি আমি। সেবারে তোমাকে আমি বাধা দিয়েছিলাম। এখানে রেখে দিয়েছিলাম। ঘুরেফিরে সেই একই ইতিহাস তাই না? মনে আছে তোমার? সেবারে হাঁটতে হাঁটতে তোমাকে কত বুঝিয়েছিলাম এখানে থাকার জন্যে? তখন তোমার নামের সঙ্গে এত লেজুড় যুক্ত হয় নি আর আমি ছিলাম কর্ণ স্ট্রীটের ঐ বাড়িতে। এখন আমার সহায়-সম্বল কিছুই নেই—আর তুমি হয়েছ সেই অট্টালিকার মালিক।

তা ঠিক, তা ঠিক, জগৎটা এইরকমই বটে—বলল ফারফ্রী।

তাইই না? হাঃ হাঃ!—হাসি ঠাট্টার স্বরে বলল হেনচার্ড—উত্থান আর পতন! ওতে আমার অভ্যাস আছে। খারাপ কি? এইতো বেশ।

আমি যা বলছি শুনুন—বলল ফারফ্রী—আমি যেমন আপনার কথা মেনেছিলাম আপনিও আমার কথা শুনে এখানেই থাকুন, যাবেন না।

কিন্তু চলে যাওয়া ছাড়া আমার আর তো কোনও উপায় নেই বন্ধু! হেনচার্ড বলল—যে কটা টাকা অবশিষ্ট আছে তাতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আমার দুবেলা দুমুঠো জুটবে—তার বেশী নয়। এখন আর সেই আগের মত মাঠে মাঠে ঠিকা কাজ করা পোষাবে না। কিন্তু কিছু না করেও তো থাকতে পারব না তাই আমার পক্ষে বাইরে চলে যাওয়াই মঙ্গল।

না আমি বলি কি—অবশ্যি আপনি যদি রাজী থাকেন তো আপনার পুরনো বাড়ীতেই এসে বাস করতে পারেন। আপনার জন্যে আমরা গোটা কয়েক ঘর খুব ছেড়ে দিতে পারব। আমার স্ত্রীও কিছু মনে করবে না আমি ঠিক জানি। অন্ততঃ যতদিন না আপনার আবার অবস্থা ফেরে।

হেনচার্ড আশ্চর্য্য হল। ডোনাল্ড প্রাক্তন ইতিহাস কিছু জানত না। তাই নিষ্পাপমনে সে তার এবং লুসেটার একই গৃহে বসবাস করার যে চিত্রটি উপস্থিত করছিল হেনচার্ডের পক্ষে সেটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা সহজ ছিল না। হেনচার্ড ফ্যাসফেসে গলায় বলল—না না তা হয় না। আমাদের ঝগড়া বিবাদ হতে পারে।

আপনি আপনার মত আলাদা থাকবেন একধারে। বলল ফারফ্রী। কেউ আপনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। তাতে অন্ততঃ এখন যেখানে আছেন তার

থেকে ভাল থাকবেন আশা করা যায়।

তবু হেনচার্ড রাজী হল না, বলল—তুমি যা বলতে চাইছ তার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছ না। তবু যাই হোক, বলেছ বলে ধন্যবাদ।

দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শহরে প্রবেশ করল ঠিক সেইদিনের মত যেদিন হেনচার্ড তরুণ স্কচম্যানকে বুঝিয়ে রাজী করিয়েছিল এখানে থাকতে। শহরের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছে যেখান থেকে তাদের দু'জনের পথ আলাদা হয়ে গেছে সেখানে এসে ফারফ্রী বলল—চলুন রাত্রে এখানে খেয়ে যাবেন।

না থাক।

ও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আপনার ফার্ণিচার অনেক গুলোই কিনে নিয়েছি আমি।

হ্যাঁ সেইরকমই তো শুনলাম।

আমার নিজের জন্যে তো কিনি নি সব। আমার ইচ্ছা আপনি যেটা যেটা পছন্দ করেন নিয়ে নিন। অনেক জিনিসের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে থাকতে পারে—বা আপনার ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা থাকতে পারে। সেগুলো আপনি আপনার বাড়ীতে নিয়ে যান— তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। অল্প জিনিসেই আমাদের ভাল চলবে। তাছাড়া পরে দরকারমত আমি কিনে নিতে পারব।

সেকি? বিনামূল্যে দিয়ে দেবে আমাকে? হেনচার্ড বলল—কিন্তু তোমাকে তো দাম দিতে হয়েছে।

হ্যাঁ তা দিতে হয়েছে কিন্তু জিনিসগুলোর দাম হয়তো আমার থেকে আপনার কাছেই বেশী।

হেনচার্ড কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, বলল—কখনো কখনো মনে হয়, তোমার প্রতি অবিচার করেছি! অন্ধকারে তার মুখ দেখে অন্তরের অস্থিরতা বুঝবার উপায় ছিল না। হঠাৎ ফারফ্রীর সঙ্গে করমর্দন করে সে তাড়াতাড়ি সরে গেল যেন আর নিজেকে ঠকাতে চায় না। ফারফ্রী দেখল, হেনচার্ড রাস্তা বেয়ে এগিয়ে গেল বুল-ষ্টেকের দিকে। সেখান থেকে প্রায়োরি মিলের পথ ধরল।

এলিজাবেথ এতক্ষণ তার ছোট্ট কুঠরিতে বসে যথাসাধ্য শ্রমে জাল বুনছিল। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সময় পেত, সে নানা কাজে ব্যস্ত রাখত নিজেকে। তার বর্তমান আবাস, তার সৎ-পিতার বাড়ীর উল্টোদিকে। সেই বাড়ীটাই আবার ফারফ্রী নিয়েছে এখন। ডোনাল্ড এবং লুসেটাকে সে প্রায়ই দ্রুত এঘর ওঘরে যাতায়াত করতে দেখে। যথাসম্ভব চেষ্টা করে ওদিকে না তাকানোর। কিন্তু ও'বাড়ীর দরজা দুম করে বন্ধ হওয়ার শব্দ হলে, মানবিক দুর্বলতাবশতঃ সেদিকে না

তাকিয়ে পারে না।

এইরকম সাদামাটা জীবনযাপন করতে করতে একদিন তার কানে এল, হেনচার্ড ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছে—প্রায় শয্যাশায়ী। অসুখ করার কারণ সম্ভবতঃ ভিজে স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় মাঠে মাঠে ঘোরাঘুরি করা। তখুনি সে হেনচার্ডকে দেখতে গেল। এবারে এলিজাবেথ ঠিক করেই এসেছিল, যে কোন উপায়ে বাবার সঙ্গে দেখা করবে। সোজা উঠে গেল সে দোতলায়। ঢাউস একখানা কোট গায়ে দিয়ে হেনচার্ড বসেছিল বিছানায়। এলিজাবেথ এসে পড়ায় সে প্রথমে খুব অসন্তুষ্ট হল, বলল—চলে যাও, চলে যাও। এখানে তোমাকে আসতে বলেছে কে ?

কিন্তু, বাবা—

না, না, তোমাকে আমি দেখতেই চাই না ? আবার বলল সে।

যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে বরফ গলতে শুরু করল। এলিজাবেথ থেকে গেল। ঘরটাকে বেশ গুছিয়ে রাখল। নিচের লোকদের এটা ওটা নির্দেশ দিল। এতক্ষণে তার বাবা, তার আসাটাও মেনে নিয়েছে মন থেকে।

এলিজাবেথের সেবাশুশ্রূষা বা তার উপস্থিতির কারণেই হয়তো হেনচার্ড অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে একবার বাইরে বেরুতে পারল। এখন সব কিছুরই রং বদলে গেছে তার চোখে। আর সে দেশত্যাগী হওয়ার কথা ভাবছিল না, বরং ভাবছিল এলিজাবেথের কথা। কোন কাজকর্ম না থাকাটাই তার পক্ষে বেশী অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতকাল পরে একদিন ফারফ্রীকে বেশ ভালই মনে হল তার। আরও ভাবল, সৎপথে থেকে পরিশ্রম করায় লজ্জার কিছু নেই। তাই উদাস অদৃষ্টবাদীর মত একদিন ফারফ্রীর গুদামে হাজির হল সে, জিজ্ঞেস করল, গম ঝাড়াই মাড়াইয়ের কোন ঠিকা কাজ পাওয়া যায় কিনা। তখুনি তাকে কাজ দেওয়া হল। তবে ফারফ্রী নিজে সরাসরি প্রাক্তন মনিবের সামনে এল না। কাজ দিল তাকে একজন গোমস্তার মারফত। হেনচার্ডকে সাহায্য করার মত যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকলেও, তার অনিশ্চিত মেজাজ সম্পর্কেও সে অবহিত ছিল—তাই ভেবেছিল পরস্পরের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব থাকাই বাঞ্ছনীয়। হেনচার্ডকে কবে কোন মরাইতে যেতে হবে, সে আদেশ পাঠাত সে তৃতীয় একজন লোকের মাধ্যমে।

কিছুদিনের জন্যে এই ব্যবস্থা চলল বেশ। সাধারণতঃ গম গুদামে এনে তোলার আগে ঝাড়াই-মাড়াইয়ের কাজ হত মরাইগুলোতে। হেনচার্ড কখনও কখনও সারা সপ্তাহ ধরে এইসব কাজ করতে লাগল, তাই এখানে অনুপস্থিত থাকত প্রায়ই।

সে কাজ সব শেষ হয়ে গেলে হেনচার্ড অন্যদের মতই প্রতিদিন বাড়ীতে আসতে লাগল কাজ করার জন্যে। একদা যে ব্যক্তির মহাজন আড়ৎদার এবং মেয়র হিসেবে রমরমার শেষ ছিল না আজ দিন-মজুর হিসেবে সে কাজ করতে লাগল সেই গুদাম আর মরাইতে যেগুলো একদিন ছিল তারই সম্পত্তি।

আগেও তো কত ঠিকা কাজ করেছি—আপনমনে সব কিছু অগ্রাহ্য করার ভঙ্গিতে ভাবল সে—এখন আবার করব তাতে আর কি আছে! কিন্তু আগেকার থেকে এখন তার আকার আকৃতিতে অনেক তফাৎ। আগেকার দিনে তার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার থাকত। জামাকাপড়ের রঙ ছিল বেশ হালকা কিন্তু প্রাণোচ্ছল। পায়ের মোজাগুলো ছিল গাঁদাফুলের মত হলদে। রুমাল ফুলের বাগানের মত রঙীন। কিন্তু এখন তার পরনে পুরনো দিনের নীলরঙা স্যুট। যখন সে ভদ্রলোক-মহাজন ছিল তখনকার যুগের একটা ম্যাড়মেড়ে রেশমী টুপি এবং একদা কৃষ্ণবর্ণ সাটিনের দুটি নোংরা মোজা। এই পোষাকেই সে ইতস্ততঃ হেঁটে বেড়াচ্ছিল। এখনও যথেষ্ট কাজের মানুষ সে। বয়স সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। এখান থেকেই সে অন্য সবার মত দেখতে পেত ডোনাল্ড ফারফ্রী সবুজ দরজাটা ঠেলে কখনও ভেতরে ঢুকছে বাইরে বেরুচ্ছে—সঙ্গে লুসেটাকেও দেখা যেত।

শীতের গোড়ায় গোড়ায় ক্যাস্টারব্রিজের সর্বত্র রটে গেল মিঃ ফারফ্রী আগামী দু'একবছরের মধ্যেই শহরের মেয়র হতে পারেন। টাউন—কাউন্সিলের মেম্বর তিনি আগেই হয়েছেন।

একদিন ফারফ্রীর মরাইতে যাওয়ার পথে এ কথা হেনচার্ডের কানে গেল। শুনে বলল সে মনে মনে—নাঃ লুসেটা ঠিকই করেছে, বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেছে। এইকথা ভাবতে ভাবতে পুরনো অনুভূতি জেগে উঠল তার মনে। ডোনাল্ড ফারফ্রী তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কিনা এইভাবে টেক্কা দিয়ে যাবে!

অত অল্প বয়সে মেয়র হবে!—কষ্ট করে মুখে হাসি এনে চিন্তা করল সে—আসলে লুসেটার টাকা-ই ওকে ওপরে তুলে দিয়েছে। হাঃ হাঃ—কি আশ্চর্য্য ঘটনা! আমি তার পুরনো মনিব তার কাছে দিন-মজুরের কাজ করছি আর সে কিনা আজ আমার মনিব হয়েছে। আমার বাড়ী আমার আসবাব-পত্র বলতে গেলে আমার বৌ-ও সবকিছু আজ তার সম্পত্তি।

দিনের মধ্যে বারংবার এই একই কথা তার মনে মনে ফিরত। লুসেটার সঙ্গে তার যবে থেকে পরিচয়—এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কখনই লুসেটাকে এত দৃঢ়ভাবে পেতে চায় নি সে। তাই এখন তাকে হারানোর বেদনা অন্তরে বাজত খুব বেশী। লুসেটার ধন সম্পত্তির প্রতি তার কোন ব্যবসায়িক লোভ ছিল না। তবে সেই ধনসম্পত্তির

শুণেই লুসেটা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল—তার মত পুরুষদের চোখে এমন নারী মোহময়ী। লুসেটাকে তার দারিদ্র্যের দিনে সে দেখেছে—এখন চাকরবাকর পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নিয়ে লুসেটা এক অভিনব রূপসী।

মাঝে মাঝে এক খেয়াল চেপে বসত হেনচার্ডের মাথায়। ফারফ্রীর মেয়র হওয়ার সম্ভাবনা যতবার মনে আসত ততবারই এই স্কচম্যানটির প্রতি পুরনো ঘৃণা ফিরে আসত। এইসঙ্গে এক নৈতিক পরিবর্তনও আসতে লাগল তার জীবনে। মাঝে মাঝে অবিবেচনাপ্রসূত চিন্তায় সে বিড়বিড় করে বলে উঠত—আর মাত্র পনেরটা দিন।—আর মাত্র বারো দিন। এইভাবে আস্তে আস্তে দিনের সংখ্যা কমতে লাগল।

কেন কিসের বারো দিন? সলোমন লংওয়েজ একদিন পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে করতে প্রশ্ন করল।

বারোদিন পরে আমি আমার শপথ-মুক্ত হব।

কিসের শপথ?

আমি দিব্যি করেছিলাম কোনো উত্তেজক পানীয় খাব না। আর বারোদিন পরে তার একুশ বছর পুরে যাবে। তখন আবার প্রাণ খুলে নিজেকে উপভোগ করব আমি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

এলিজাবেথ এক রোববারে বসেছিল জানলার ধারে। এমনসময় রাস্তায় একটা কথোপকথন শুনতে পেল যার মধ্যে হেনচার্ডের নাম উঠছিল বারবার। বিস্মিত হয়ে সে বোঝার চেষ্টা করছিল ব্যাপারটা কি। এমন সময় রাস্তাতেই এক তৃতীয় ব্যক্তি তার মনের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করল আরেকজনকে।

মাইকেল হেনচার্ড আবার মদ খেতে শুরু করেছে? দীর্ঘ একুশ বছর ধরে এসব কিছুই সে খায় নি?

শুনে লাফ দিয়ে উঠল এলিজাবেথ। জামাকাপড় পরে বেরিয়ে গেল তারপর।

॥ তেত্রিশ ॥

ক্যাস্টারব্রিজ শহরে এই সময়ে একটা প্রথার খুব চল ছিল—ঠিক প্রথা-পদ্ধতির স্বীকৃতি না পেলেও বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। প্রত্যেক রোববারের বিকেল-বেলা ক্যাস্টারব্রিজের যত ঠিকা-কর্মচারী, দিন-মজুর, নিয়মিত গীর্জায় যাওয়া যাদের

অভ্যাস, উদ্বেগমুক্ত যাদের দৈনন্দিন জীবন—সবাই সারি বেঁধে গিয়ে হাজির হত 'থ্রী মেরিনার্স' নামক সরাইখানায়। তাদের বেহালা, বাঁশী, খঞ্জনী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে খৃষ্টের বন্দনাগান আবৃত্তি, বেশ একটা হৈচৈএর ব্যাপার।

এই রকম একটা শুদ্ধাচারী পরিবেশে প্রতিটি লোকের পবিত্র দায়িত্ব ছিল নিজের ওপরে নজর রাখা, যেন আধ পাঁইটের বেশী মদ্য গলা বেয়ে না নেমে যায়। সরাই-খানার মালিকও তাদের এই বিবেচনা সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল তাই ঠিক ঐ মাপেরই পেয়ালা দেওয়া হত তাদের প্রত্যেককে। প্রতিটি পেয়ালাই একরকম দেখতে। প্রত্যেকটার গায়ে পত্রহীন একটা করে লেবুগাছ আঁকা। এরকম কত পেয়ালা যে এই সরাই-মালিকের ছিল তা নিয়ে মাঝে মাঝে আঁক কষত বাচ্চা ছেলেরা। অত বড় ঘরে অন্ততঃ চল্লিশটা পেয়ালা যে হবেই তাতে সন্দেহ নেই—ষোলখানা পায়া-ওয়ালা বিরাট ওক কাঠের টেবিলটাতে গোল হয়ে ঘিরে বসত সবাই। চল্লিশটা পেয়ালার পরেই দেখা যেত চল্লিশটা গীর্জাফেরৎ মানুষ আর তাদের পশ্চাতে চল্লিশটা চেয়ারের পেছন দিক।

সেদিনকার আলাপ-আলোচনা সপ্তাহের অন্যদিনের মত নয়। তার থেকে অনেক গম্ভীর এবং সূক্ষ্ম। প্রায়শঃই তারা গীর্জার উপদেশটাকে আলোচনা করত, বিশ্লেষণ করত, দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ নিয়ে বিচার করত। সাধারণ অভিমত ছিল এই, যে বিষটি গড়পড়তা জীবন যাত্রায় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। গীর্জার কাজকর্মের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা একটু বেশী নিশ্চয়তার সুরে কথাগুলো বলত কারণ গীর্জার অনুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তাদের যে সরাসরি যোগ।

হেনচার্ড তার নিরানন্দ একঘেয়ে জীবনকে কাটানোর জন্যে এই 'থ্রী মেরিনার্স'-কেই বেছে নিয়েছিল। এই চল্লিশটা লোক যেই পেয়ালায় চুমুক দিতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে এসে ঢুকল হেনচার্ড। মুখের উজ্জ্বলভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তার ব্রতপালনের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন যা-খুশী তাই করার সময়। বিরাট ওক-কাঠের টেবিলটার পাশে ছোট্ট একটা টেবিল থাকত গীর্জার লোকদের বসার জন্যে। সেইখানেই গিয়ে বসল হেনচার্ড। কেউ কেউ তাকে দেখে মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল—আরে মিঃ হেনচার্ড! আপনি এখানে? একি?

কয়েক মুহূর্তের জন্যে উত্তর দেওয়ার মত কষ্ট করল না হেনচার্ড। লম্বা করে নিজের পা বাড়িয়ে দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল—হুম্ তা বটে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আমার দুঃসময় যাচ্ছে। তোমরা অনেকেই হয়তো কারণটা জানো। এখন অনেকটা ভাল আছি—তবে একেবারে ভাল নয়। তোমরা একটা গান কর না হে শোনা যাক।

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—প্রথম বেহালাবাদক বলল—আমরা সব গুটিয়ে ফেলেছিলাম—তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। বার করো হে বন্ধুরা—ভদ্রলোককে শুনিয়ে দাও একবার।

যা হোক একটা হলেই হবে—বলল হেনচার্ড—স্তবস্তোত্র—ব্যালে—অথবা রাবিশ যা খুশী—শুধু বাজনাটা ঠিকমত হওয়া চাই।

আরে হ্যাঁ হ্যাঁ সে খুব পারব। এখানে বিশ বছরের নিচে বাজাচ্ছে এমন কেউ নেই। তাদের নেতা বলল। আজ রোববার যখন, চার নম্বর গানটাই হোক—স্যামুয়েল ওয়েকলির সুর—আমি সেটাকে একটু মেজে ঘষে নিয়েছি।

ধুৎ তোমার! স্যামুয়েল ওয়েকলির কথা রাখো তো। বলল হেনচার্ড। একটা পুরনো গান ধরো—উইন্টশায়ারের সেই সুরে। আমার অল্প বয়সে ঐ সুর শুনলে রক্তে জোয়ার খেলে যেত। গানের বইটা নিয়ে সে পাতা ওল্টাতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল সে। মনে হল একদল লোক যাচ্ছে। এরা নিঃসন্দেহে ওপরদিকের ঐ গীর্জার সমাবেশ থেকে ফিরছে। ওখানে নিচের এই গীর্জার থেকে প্রার্থনাটা কিঞ্চিৎ বেশি হয়। বিশিষ্ট অন্যান্য লোকদের মধ্যে ছিল মিঃ কাউন্সিলর ফারফ্রী, সঙ্গে তার হাত ধরে লুসেটা। অন্য সব মেয়েরা তাকে দেখে অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। হেনচার্ডের মুখচোখে ঈষৎ পরিবর্তন দেখা দিলেও সে বইখানার পাতা উল্টে যাচ্ছিল।

তাহলে শুরু কর, এখুনি—বলল সে—একশো নয় নম্বর গানের দশ থেকে পনের স্তবক পর্যন্ত। নাও আমি কথাগুলো বলে দিচ্ছি—

> ওর সন্তান সব অনাথ হবে, স্ত্রীর দুঃখের সীমা রবে না
> ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করেও, বাচ্চারা কেউ ভিখ পাবে না।
> ধনসম্পদ সব বাঁধা পড়বে, সুদখোরদের কাছে
> পরিশ্রমের ফল বিলাবে, অচেনা লোকের মাঝে।
> অভাবের দিনে পাবে নাকো কারও, করুণা সহানুভূতি
> পাই পয়সারও সাহায্য নেই, ও'র ছেলেদের প্রতি।
> রইবে না কেউ বাকি যে আর, বংশে বাতি দিতে
> নাম ধাম সব মুছে যাবে, অদূর ভবিষ্যতে।

হ্যাঁ হ্যাঁ জানি এটা জানি—ওদের নেতা তাড়াতাড়ি বলল—কিন্তু আমি বলি এটা থাক। এ গানটা গাইবার জন্যে নয়। গীর্জার ঐ ভদ্রলোকের ঘোড়া চুরি হয়ে গেল সেবার—বেদেরা নিয়ে গেল—তখন আমরা করেছিলাম ঐটা। কিন্তু উনি শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কে জানে এমন গান থাকার কি মানে? যে

গান গাইতে গেলে নিজের মনে লজ্জা হয়, অমন গান থাকবে কেন? যাক্ সে নাও, চার নম্বর গানটা ধরো, স্যামুয়েল ওয়েকলির সুর—আর আমি যেমন যেমন পাল্টেছি।

ধুত্তোমার—রাখো তো! ঐ একশো নয় নম্বরটাই গাইতে হবে। উইন্টশায়ারের সুরে। নাও আরম্ভ করো—হেনচার্ড চিৎকার করে উঠল—ঐ গানটা শেষ না হলে কেউ এখান থেকে উঠবে না। টেবিল ছেড়ে উঠে সে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ঠেস দিয়ে। তারপর বলল—নাও আরম্ভ করো, নইলে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে আজ।

না, না, মাথা গরম করবেন না, আজ রোববার। তাছাড়া ও গানের কথাগুলো যখন আমাদের নয়, স্বয়ং ডেভিডের, তখন আবার আপত্তির কি আছে, কি বল হে? ভয় পেয়ে একজন বলে উঠল দলের মধ্যে থেকে। বলে আর সবাইর দিকে তাকাতে লাগল। অগত্যা বাদ্যযন্ত্রগুলোতে সুর ভাঁজা শুরু হল, তারপর গানটাও গাওয়া হল।

হেনচার্ড খুব নরম সুরে তাদের ধন্যবাদ জানাল। চোখদুটো তার মাটির দিকে, যেন গানটা শুনে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে।—না, না, তোমরা ডেভিডকে দোষারোপ করোনা—মৃদুস্বরেই মাথা নাড়তে নাড়তে বলল হেনচার্ড। তখনও মাটির দিকে তার দৃষ্টি। ডেভিড যখন লিখেছিলেন তখন তিনিই জানতেন তাঁর মনের অবস্থা। আজ আমার জীবনে যে দুর্দশা নেমে এসেছে—পারলে, আমিই তোমাদের মত দলকে দিয়ে রোজ এই গান গাওয়াতাম। দুঃখের কথা কি জান, যখন আমার পয়সা ছিল, তখন কি চাই সে প্রয়োজন অনুভব করি নি আর এখন নিঃস্ব হয়ে গেছি এখন চাইলেও পাওয়ার উপায় নেই।

কথাবার্তা থামলে দেখা গেল লুসেটা আর ফারফ্রী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বাড়ীর দিকে। গীর্জা থেকে বেরিয়ে চা খাওয়ার আগে পর্যন্ত একটু বেড়িয়ে আসা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। হেনচার্ড বলল—ঐ যে যাচ্ছে, যার গান গাওয়া হল সে যাচ্ছে ঐ।

বাজনদার এবং গায়করা সবাই তাকাল সে দিকে। খঞ্জনীবাদক বলল—না না ঈশ্বর রক্ষা করুন!

আমি বলছি ঐ লোকটাই! হেনচার্ড গোঁয়ারের মত বলল।

ক্ল্যারিওনেট বাজাচ্ছিল যে লোকটা, সে গম্ভীরমুখে বলল—আগে জানলে আমি কক্ষণো বাজাতাম না। যদি জানতাম যে কোন জীবন্ত ব্যক্তিই এই গানের উদ্দেশ্য তাহলে দেখতাম কে আমার এই বাঁশী থেকে আওয়াজ বার করে!

প্রথম গায়ক বলল—আমি গাইতাম না। ভাবলাম যে গানটা শুনে কেউ যদি খুশী হয় তো করলে ক্ষতি কি।—সুরটা তো ভালই।

যাক গানটা তোমরা করেছ তো, ব্যস! বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল হেনচার্ড—ও'র কথা আর কি বলব, গান শুনিয়েই ও আমার মন কেড়েছিল। আর আজ তো

একেবারে খেদিয়ে ছেড়েছে। আমিও করতে পারতাম অনেক কিছু—কিন্তু তা আমি করব না। বলে বাইরে বেরিয়ে এল হেনচার্ড।

ঠিক এই সময়টাতেই এলিজাবেথ খুব বিমর্ষ মুখে ঢুকে পড়ল সেখানে। গানের দলের লোকেরা বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে। এলিজাবেথ হেনচার্ডের দিকে এগিয়ে গেল, বলল তার সঙ্গে বাড়ী যেতে।

এতক্ষণে হেনচার্ডের আগ্নেয়গিরির মত উত্তাপ কমে এসেছে। মদ্যপানও সে খুব বেশী করে নি—অতএব রাজী হয়ে গেল সহজেই। এলিজাবেথ তার হাত ধরে নিয়ে হাঁটতে লাগল। হেনচার্ড হাঁটছিল ঠিক অন্ধের মতন আর অন্যমনস্কভাবে সেই গানের শেষ লাইনদুটো গাইছিল গুনগুন করে—

নামধাম সব মুছে যাবে তার, অদূর ভবিষ্যতে।

অবশেষে এলিজাবেথকে সে বলল—আমি এক কথার মানুষ। একুশ বছর ধরে মদ খাই নি—এখন খাব বলে মনে কোনও পাপ নেই।......ওকে যদি শিক্ষা না দিই তো আমার নাম নেই। আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে ও। যা খুশী আমার তাই করব—সেজন্যে কোনও কৈফিয়ৎ দেব না।

এই অর্ধোচ্চারিত কথাগুলো শুনে এলিজাবেথ ভয় পেয়ে গেল—বিশেষতঃ হেনচার্ড যে কি রকম একগুঁয়ে স্বভাবের সেটা সে জানত।

কি করবেন আপনি? খুব সতর্কভাবে সে জিজ্ঞেস করল। অস্থিরতার জন্যে সে প্রায় কেঁপে উঠছিল, হেনচার্ডের উদ্দেশ্যও মোটামুটি আঁচ করতে পারছিল।

কোন উত্তর দিল না হেনচার্ড। একটু পরেই তারা জোপের কুটিরে পৌছে গেল। এলিজাবেথ বলল—আমি আসব ভেতরে?

না না আজ থাক। উত্তর দিল হেনচার্ড। এলিজাবেথ চলে গেল। ভাবল ফারফ্রীকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়াটা তার একান্ত কর্তব্য—মনে মনে গুরুভার একটা দায়িত্ব অনুভব করছিল সে।

রোববার কি, আর অন্যদিন কি—ফারফ্রী ও লুসেটা শহরে ঘুরে বেড়াত ঠিক দুটি প্রজাপতির মত। স্বামীর সঙ্গে ছাড়া লুসেটা কোথাও বেরুত না। ব্যবসার কাজে যেদিন আটকে যেত ফারফ্রী সেদিন আর লুসেটার বাইরে যাওয়া হোত না—বাড়ীতেই বসে থাকত ফারফ্রীর ফিরে আসার অপেক্ষায়। তার সেই মুখখানা এলিজাবেথ নিজের জানালায় বসে দেখতে পেত পরিষ্কার। সেজন্যে অবশ্যি তার এমন কথা মনে হত না যে এই গভীর প্রেম দেখে ফারফ্রীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বরং বই পড়ে পড়ে তার ধারণা হয়েছিল রোজালিণ্ড এর মত, বলত—মানিনী নিজের ওজনটা বুঝে দেখো—আর অমন একটি লোকের ভালবাসা পেয়েছ বলে ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ দিও।

হেনচার্ডের দিকেও নজর রাখছিল এলিজাবেথ। তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিত। একদিন তার কথার উত্তরে হেনচার্ড বলল, অ্যাবেল হুইটল-এর অনুকম্পা-মিশ্রিত আচার-আচরণ তার ভাল লাগে না। ব্যাটা এমনই বোকা, মন থেকে মোটেই এই চিন্তাটা দূর করতে পারছে না যে একদিন আমিই ছিলাম এই সব কিছুর মালিক।

ঠিক আছে আমি একদিন গিয়ে বলে আসব। বলল এলিজাবেথ। তার আসল উদ্দেশ্যটি হল ফারফ্রীর পরিচালনায় কাজকর্ম কেমনভাবে চলছে সেটা একদিন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা। হেনচার্ডের কথা-বার্তায় এলিজাবেথ খুব ভয় পেয়েছিল, ইচ্ছা ছিল একদিন নিজের চোখে দেখবে হেনচার্ডের সঙ্গে ফারফ্রীর মুখোমুখি কেমন কথাবার্তা হয়।

একদিন বিকেলবেলা সবুজ ফটকটা খুলে ফারফ্রী ভেতরে ঢুকল, তার পেছন পেছন লুসেটা। ডোনাল্ড তার স্ত্রীকে সামনে এগিয়ে দিল নির্দ্বিধায়। ফারফ্রীর মনে তো কোনও সন্দেহ ছিল না যে তার স্ত্রীর সঙ্গে ঐ লোকটির কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে।

হেনচার্ড কিন্তু এই দম্পতির মধ্যে কারও দিকেই তাকাল না। নিজের কাজই সে করে যাচ্ছিল একমনে। পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নিজেকে জাহির না করার যে ভদ্রতা সেই সৌজন্যবোধেই ফারফ্রী হেনচার্ড যেদিকে কাজ করছিল সেদিকে গেল না। কিন্তু লুসেটা জানত না যে হেনচার্ড তার স্বামীর অধীনে কাজে ঢুকেছে, তাই টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে সে মরাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ সেখানে হেনচার্ডের সামনে পড়ে গেল সে। চমকিত হয়ে ছোট্ট করে বলে ফেলল—ও! কথাটি কিন্তু ফারফ্রীর কানে গিয়ে পৌঁছল না। হেনচার্ড যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে অ্যাবেল হুইটল আর অন্যদের মতই টুপির কোনা ছুঁয়ে অভিবাদন জানাল। তার উত্তরে অর্ধমৃতের মত নিঃশ্বাস ছেড়ে লুসেটা বলল—গুড—আফটারনুন।

এ্যাঁ। কি বল্লেন ম্যাডাম! হেনচার্ড বলল, যেন সে কিছু শুনতে পায় নি।

গুড আফটারনুন—কোনরকমে পুনরাবৃত্তি করল লুসেটা।

ও হ্যাঁ গুড আফটারনুন, ম্যাডাম! আবার টুপি ছুঁয়ে বলল সে—আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগল। লুসেটাকে বিব্রত দেখাচ্ছিল। হেনচার্ড বলে যেতে লাগল—আমরা গরীব জনমজুর। আপনারা কেউ খোঁজখবর নিলে আমাদের খুব ভাল লাগে।

এই শ্লেষ লুসেটার কাছে প্রায় অসহনীয় মনে হল—সে অনুরোধের দৃষ্টিতে তাকাল হেনচার্ডের দিকে।

কটা বাজে বলতে পারেন? জিজ্ঞেস করল হেনচার্ড।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বলল লুসেটা—সাড়ে চারটে।

ধন্যবাদ। এখনও দেড় ঘণ্টা বাকি আছে। ম্যাডাম! আমরা নিচু শ্রেণীর লোকেরা কি আর আপনাদের মত অবসরের আনন্দ ভোগ করতে পারি?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুসেটা তার কাছ থেকে সরে গেল। এলিজাবেথকে দেখে মাথা নাড়ল, হাসল—তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেল তার স্বামীর কাছে। সেখান থেকে তার স্বামী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল অন্যদিক দিয়ে, যাতে হেনচার্ডের মুখোমুখি না পড়ে যায়। লুসেটা যে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছে—তাতে সন্দেহ ছিল না। এর ফলাফল দেখা গেল পরের দিন সকালবেলা—হেনচার্ডের হাতে পোষ্টম্যান এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল।

ছোট্ট একটা চিরকুটে যতদূর বিরক্তি প্রকাশ করা সম্ভব, সেইভাবে লুসেটা লিখেছে—তোমার কাছে অনুরোধ, আবার যদি কখনও উঠোনে হাঁটতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তো অমন শ্লেষভরে কথা বলো না। তোমার সঙ্গে তো আমার কোন ঝগড়া নেই—বরং তুমি যে আমার স্বামীর ফার্মে কাজ করছ—এতে আমি খুবই খুশী। কিন্তু সাধারণভাবে তার স্ত্রী হিসেবে যেমন ব্যবহার পাওয়া উচিত, ব্যঙ্গবিদ্রুপ না করে সেটাই কোর। আমি তো কোনো অপরাধ করি নি বা তোমার কোনো ক্ষতি করি নি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হেনচার্ড বলল—বোকা কোথাকার! এমন করে কি লিখতে আছে নাকি! এখন যদি ও'র স্বামীকে সব দেখিয়ে দিই আমি! ধুর!—বলে চিঠিটা সে আগুনে ফেলে দিল।

লুসেটা আর কখনো উঠোনের এই দিকটাতে আসে নি। দ্বিতীয়বার এখানে হেনচার্ডের সঙ্গে দেখা হওয়ার থেকে তার কাছে মৃত্যু ছিল ভাল। দিনের পর দিন তাদের দূরত্বটা বেড়ে চলল। ফারফ্রী আলাপ-ব্যবহারে যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দিলেও তার পক্ষে এই প্রাক্তন আড়ৎদারকে অন্যদের থেকে বিশিষ্ট আচরণ দ্বারা তৃপ্ত করা সম্ভব ছিল না। হেনচার্ড সেটা লক্ষ্য করেও উদাসীন হয়ে থাকত আর প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা 'থ্রী মেরিনার্স'-এ গিয়ে মদ গিলতে লাগল আরও বেশী করে!

এলিজাবেথ প্রায়ই বিকেল পাঁচটা নাগাদ চা তৈরী করে নিয়ে যেত বাবার জন্যে—যাতে অন্ততঃ কিছুটা তাকে অন্য পানীয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। একদিন সে এসে দেখল তার বাবা ওপর-তলায় রেপ-সীড আর ক্লোভার-সীড ওজন করতে ব্যস্ত। সেখানে উঠে গেল সে। ওপরতলা থেকে একটা মোটা শিকল ঝুলানো আছে। নীচের থেকে বস্তা তোলার জন্যে।

মাথা উঁচু করে এলিজাবেথ দেখল ঠিক ওপর তলায় দরজার সামনেই হেনচার্ড

এবং ফারফ্রী দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ফারফ্রী ঠিক দেয়ালের ওপরটাতেই দাঁড়িয়ে—আর হেনচার্ড একটু ভেতরে। তাদের কথাবার্তায় যাতে বাধা না পড়ে তাই এলিজাবেথ সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রইল। আর মাথা উঁচু করল না। সেখানে দাঁড়িয়ে এলিজাবেথ কেমন যেন দেখতে পেল—আগে থেকেই একটা ভয় তার মনে ঢুকে ছিল, হয়তো তার বাবার একখানা হাত ফারফ্রীর ঘাড়ের পেছনদিকে উঠে এসেছে। মুখে তার দুর্বোধ্য এক ভঙ্গি। ফারফ্রী এ সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিল না—তবে টের পেলেও হয়তো মনে করত যে হেনচার্ড হাত ছড়িয়ে দিয়ে আড়ামোড়া ভাঙছে। অন্য কোনও গোপন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু ছোট্ট একটুখানি ঠেলা দিলেই ফারফ্রী ভারসাম্য হারিয়ে একদম ডিগবাজি খেয়ে দুম করে পড়বে নিচে।

কি যে ঘটতে পারে ভেবে এলিজাবেথ শিউরে উঠল। দুর্ঘটনাকে রুখতে, সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রের মত চায়ের পাত্রটা নিয়ে উঠে এল ওপরে। পাত্রটা বাবার সামনে রেখে চলে এল। পরে চিন্তা করতে করতে সে ভাবছিল, ব্যাপারটা হয়তো কোনো সাময়িক খেয়াল ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া একদিন তার বাবা যেখানে সব কিছুর মালিক ছিল, আজ সেখানেই তাকে মজুরের মত খাটতে হচ্ছে, এটা বোধহয় মানসিক দিক দিয়ে বিষবৎ যন্ত্রণাদায়ক। অতএব এলিজাবেথ ঠিক করল ফারফ্রীকে সে এসব ব্যাপারে সময়মত সাবধান করে দেবে।

।। চৌত্রিশ ।।

পরদিন ভোর পাঁচটায় উঠে পড়ল এলিজাবেথ। রাস্তায় বেরিয়ে দেখল তখনও আলো ফোটে নি—ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে চারিদিক। শহরের সর্বত্র অন্ধকার এবং নিঃস্তব্ধতা। শুধু আয়তক্ষেত্রাকার রাস্তাগুলো বেয়ে ভেসে আসছে এক সমবেত তাল আর লয়ের ধ্বনি। গাছের ডাল থেকে টপটপ করে পড়ে চলেছে ফোঁটা ফোঁটা শিশির—পশ্চিমের রাস্তা, দক্ষিণের রাস্তা, কখনও বা দুদিক থেকে শোনা যাচ্ছে সে আওয়াজ একই সঙ্গে। কর্ণ স্ট্রীটের শেষ মুড়ো পর্যন্ত এগিয়ে গেল এলিজাবে ফারফ্রীর দৈনন্দিন সময়সূচী সম্পর্কে সে এতই ওয়াকিবহাল যে দু-চার মিনি অপেক্ষা করতেই সদর ফটকের খিল খোলার শব্দ হল। ফারফ্রী হাঁটতে হাঁটে এগিয়ে এল তার দিকেই। রাস্তার প্রান্তে শেষতম বাড়ীটাকে ছায়া করে রেখেছে

শেষতম গাছটি, তার তলায় দেখা হ'ল দুজনে।

ফারফ্রী প্রথমে বুঝতেই পারে নি এলিজাবেথের উপস্থিতি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল সে—আরে! মিস্ হেনচার্ড! এত সক্কালে উঠে পড়েছ?

এমন অপ্রত্যাশিত সময়ে তাকে চমকে দেওয়ার জন্যে মার্জনা চাইল এলিজাবেথ, বলল—একটা বিশেষ কথা বলা দরকার আপনাকে—কিন্তু মিসেস ফারফ্রী পাছে ভয় পেয়ে যান, তাই ওঁর সামনে বলতে চাই নি। ফারফ্রী বেশ একটু দেমাকী হাসি হেসে বলল—এ্যাঁ! কথা আছে? বেশ তো বলো না কি কথা?

মনে মনে এলিজাবেথের কত কথা যে ওলটপালট করছিল, কিন্তু গুছিয়ে বলার মত কিছুতেই সাজাতে পারছিল না। যাইহোক, কোনরকমে শুরু করে সে হেনচার্ডের নাম উচ্চারণ করল। তারপর অতি কষ্টে বলল—আমার ভয় হয়, উনি কোনদিন হয়তো আপনাকে—অপমান করতে পারেন।

সে কি? আমরা তো পরস্পরের বন্ধু।

হয়তো বা ঠাট্টাচ্ছলেও হতে পারে—মনে রাখবেন, তিনিও তো কম দুঃখ পান নি।

কিন্তু আমাদের মধ্যে তো কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয় নি।

অথবা হয়তো এমনকিছু করতে পারেন, যাতে আপনার ক্ষতি হবে বা আঘাত লাগতে পারে। প্রতিটা কথা উচ্চারণ করতে এলিজাবেথ দ্বিগুণ যন্ত্রণা অনুভব করছিল। তবুও যেন ফারফ্রীর বিশ্বাস হচ্ছিল না কিছুতেই। তার অধীনস্থ কর্মচারী হেনচার্ড—তাকে সে একদা ক্ষমতাবান হেনচার্ড বলে ভাবতে পারছিল না। কিন্তু হেনচার্ড শুধু আগেকার হেনচার্ডই নয়—এখন বরং তার সুপ্ত নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি আরও ভয়ানক হয়ে জেগে উঠেছে।

ফারফ্রী অত খারাপ কিছু বোঝে নি, তাই এলিজাবেথের ভয়কে অমূলক বলে হাল্কা করে দিল। এইভাবেই পৃথক হয়ে গেল দু'জনে। সকাল হয়ে গেছে। জনমজুররা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। গাড়ীওয়ালারা চলেছে গাড়ী সারাই করতে—ঘোড়াওয়ালারা চলেছে ঘোড়ার ক্ষুরে নাল পরাতে—খেটে-খাওয়া মানুষরা সবে নড়াচড়া শুরু করেছে তখন। এলিজাবেথ খুব অতৃপ্তচিত্তে ঘরে ফিরে এল। সে ভাবছিল এই সতর্ক করতে গিয়ে সে আদৌ ভাল কাজ করে নি, বরং নিজের বোকামি প্রকাশ করে ফেলেছে।

কিন্তু ডোনাল্ড ফারফ্রীর কাছে কোনো ঘটনাই বিনা তাৎপর্যে হারিয়ে যায় না। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখেই সে সব ঘটনার বিচার করত—তাৎক্ষণিক মতামতই সবসময়ে তার স্থিরসিদ্ধান্ত না'ও হতে পারত। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালের পরিবেশে এলিজাবেথের সেই আকুল মুখখানা, সারাদিনে কয়েকবার তার মনে ভেসে উঠল।

এলিজাবেথের স্বভাবে যে গভীরতা আছে, সেটা চিন্তা করেই ফারফ্রী তাঁর কথাগুলোকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না।

তাই বলে হেনচার্ড সম্পর্কে কোনো বিরূপ মনোভাবও তার অন্তরে এল না। কয়েকদিন থেকেই সে হেনচার্ডের জন্যে কি ব্যবস্থা করা যায় তাই নিয়ে ভাবছিল। ভাবনাটা ব্যক্ত হল বিকেলের দিকে, আইনজীবী জয়েসের কাছে। এলিজাবেথের দুর্ভাবনা সে চিন্তায় বাধা হয় নি।

ফারফ্রী বলল জয়েসকে—সেদিন যে বীজের দোকানটার কথা বলছিলাম—ঐ যে গীর্জার পাশে যেটা ভাড়া হবে. আমার জন্যে নয়, আমি চাইছিলাম ওটা আমাদেরই বন্ধু হেনচার্ডকে দেওয়া হোক। ছোট হলেও, উনি তাহলে নতুন করে শুরু করতে পারেন। আর তাছাড়া আমি কাউন্সিলেও কথাবার্তা বলেছি—ওঁর ব্যবসা শুরু করবার মত পুঁজি আমরা চাঁদা করে তুলে দেব—ধরা যাক আমিই পঞ্চাশ পাউণ্ড দিলাম—যদি বাকিরা সবাই মিলে আর পঞ্চাশ পাউণ্ড তুলে দেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে ব্যাপারটা। তা বেশ তো, এ'তে আপত্তির কিছু নেই—আইনজীবী ভদ্রলোক তাঁর সরল সোজা ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন—তবে কথা হচ্ছে কি জান ফারফ্রী! তোমার চোখে না পড়লেও—অন্যের দৃষ্টি তো এড়ায় নি। সবাই বলছে, হেনচার্ড তোমার শত্রু, তোমার ভাল চায় না। একথাগুলো তোমারও জেনে রাখা দরকার, আমি তো জানি, কাল রাত্রে সে 'থ্রী মেরিনার্সে' বসে যা নয় তাই করে তোমার নামে বলেছে সবার সামনে।

তাই নাকি এ্যাঁ—তাই নাকি? ফারফ্রী মুখ নীচু করে বলল। কেন অমন করে বলার কারণটা কি? তার কণ্ঠস্বর একটু তিক্ত মনে হল—আমি তো তার কোনো ক্ষতি করি নি তবে আমার এ বদনাম করার অর্থটা কি?

ভগবান জানেন—ভুরু কুঁচকে বলল জয়েস—তোমার সঙ্গে মিশ খাওয়া খুব মুস্কিল আছে। আমার তো মনে হয় ওকে কাজ থেকেও ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

কিন্তু একদিন যে আমার উপকারী বন্ধু ছিল তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেব? যখন প্রথম আসি এখানে, তার সাহায্যেই যে আমি দাঁড়িয়েছি সেকথা ভুলি কি করে? না না একদিনের জন্যেও যদি কাজ থাকে তো আমি ছাড়িয়ে দেব না। আমি কক্ষনো এতটুকু স্বার্থত্যাগ করতে গররাজী হতে পারি নে। তবে দোকান করে দেওয়ার ব্যাপারটা আবার ভাল করে ভেবে দেখতে হবে।

পরিকল্পনাটি মন থেকে ত্যাগ করতে ফারফ্রীর কষ্ট হল খুব। কিন্তু বাজারে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল বেশ তাই তাকে নিজে গিয়ে আবার সব বাতিল করে দিতে হল। দোকানের তখনকার মালিকের সঙ্গে গিয়ে ফারফ্রী কথা বলল। কেন যে

তার পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করতে হল সে কথা বোঝাতে গিয়ে হেনচার্ডের নামও এসে পড়ল। সে বলতে বাধ্য হল যে, কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত পাল্টে গেছে।

দোকানের বর্তমান মালিক বেশ হতাশ হয়ে পড়ল। হেনচার্ডের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তাকে আসল কথাটি খুলে বলল সে যে কাউন্সিলের অন্য সবার যথেষ্ট ইচ্ছা থাকলেও ফারফ্রীর অমতের জন্যেই হেনচার্ডের কপালে দোকানটা জুটল না। এইভাবে এক ভুলের থেকে জন্ম নিল তাদের পারস্পরিক শত্রুতা।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ফারফ্রী যখন বাড়ী এসে ঢুকল, চায়ের কেটলিতে তখন সপ্তমে স্বর বাজছে। পরীর মত হাল্কাপায়ে দৌড়ে এসে তার হাত ধরল লুসেটা। ফারফ্রী চুমু খেয়ে আদর জানাল।

ইয়াকি করে জানালার দিকে তাকিয়ে লুসেটা বলল—আরে! জানালাগুলো বন্ধ করা হয় নি যে—লোকে দেখে ফেলবে যে—ছিছি লজ্জা!

বাতি জ্বালা হল। পর্দা ফেলে দিয়ে যখন তারা চা খেতে বসল, লুসেটা দেখল ফারফ্রীকে গম্ভীর দেখাচ্ছে। লুসেটা কেন অমনভাবে তাকিয়ে আছে এসব কিছু প্রশ্ন না করে ফারফ্রী অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করল—কেউ এসেছিল নাকি? আমাকে খোঁজ করছিল কেউ?

না তো, কেন কি হয়েছে ডোনাল্ড?—বলল লুসেটা।

না এমন কিছুই নয়। বিমর্ষভাবে উত্তর দিল ফারফ্রী।

তাহলে ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? তুমি ঠিক পারবে। স্কচম্যানদের ভাগ্য খুব ভাল।

না সবসময়ে তা হয় না। টেবিলের একটা ফাটল খুঁটতে খুঁটতে গম্ভীরভাবে বলল ফারফ্রী আর মাথা নাড়াতে লাগল। আমি অনেককে জানি যারা হেরে গেছে। স্যাণ্ডি ম্যাকফার্লেন তো আমেরিকা যাওয়ার পথে ডুবেই গেল। আর্চিবাল্ড লেইথ ম'ল খুন হয়ে—আরও শুনবে বেচারী উইলি ডানব্রীজ আর মেইটল্যাণ্ড ম্যাকফ্রীজ খারাপ পথে চলে গেল—এইরকমই সবার অবস্থা।

না না আমি সাধারণভাবে বলছিলাম। তুমি এমন আক্ষরিক অর্থে ধরো না কথাগুলো। নাও চা খাওয়া হয়ে গেলে একবার সেই গানটা করো তো—সেই যে মজার গানটা—একচল্লিশজন প্রেমিক আর—

না না আজ আর কোনো গান করতে পারব না। আসলে কি জান—হেনচার্ড আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে—অতএব আমি চেষ্টা করলেও তার বন্ধু হতে পারব না। তার হিংসার কারণ কিছুটা বুঝতে পারি—কিন্তু সে যে আসলে কি বলতে চায় বুঝি না। তুমি কি কিছু ধরতে পার লুসেটা? এ যেন শুধু ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় প্রাচীন ধরণের সেই প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা'ও বটে।

লুসেটা কিছুটা যেন নিভে গেল, বলল—না।

ওকে আমি কাজ দিয়েছি, কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে চাই না। কিন্তু তাই বলে চোখ কান বন্ধ করে বসে থাকতে পারি না—ও'র মত একরোখা লোক যা খুশী করে বসতে পারে।

কেন কি শুনেছ তুমি ডোনাল্ড? লুসেটা ভয় পেয়ে বলল, তার ঠোঁটে যেন এই কথাগুলি ভাসছিল—আমার সম্পর্কে কিছু? কিন্তু তা সে বলল না। অন্তরের উদ্বেগও দমন করতে পারল না। শুধু চোখদুটো জলে ভরে এল।

না না তুমি যত ভাবছ তত ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়—ফারফ্রী কোমল ভঙ্গিতে বলল। যদিও লুসেটার থেকে সে কমই জানত ব্যাপারটা কতদূর ভয়ানক বা কিছু।

লুসেটা খুব ভগ্নকণ্ঠে বলল—আমরা আগে যা ভেবেছিলাম তাই করলেই বোধহয় ভাল হয়। ব্যবসাপত্তর বন্ধ করে চলো এখান থেকে চলে যাই। যথেষ্ট টাকা আছে আমাদের—এখানে না থাকলেই বা কি হয়?

ফারফ্রী মনে হল ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবছে। এই সব কথাবার্তা চলতে চলতেই এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। তিনি তাদের প্রতিবেশী অল্ডারম্যান মিঃ ভ্যাট।

শুনেছ বোধহয় ডাক্তার চকফিল্ড মারা গেছেন। হ্যাঁ, আজই বিকেল পাঁচটায় মারা গেছেন। বলল মিঃ ভ্যাট। ডাক্তার চকফিল্ড গত নভেম্বর মাসে শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন।

খবরটা শুনে ফারফ্রী বেশ দুঃখিত হল। মিঃ ভ্যাট বলে যেতে লাগলেন—বেশ কিছুদিন থেকেই তো ভুগছিলেন, তাই ওঁর বাড়ীর লোকরাও খানিকটা সামলে নিয়েছে। এখন কথা হল—আমি যেজন্যে তোমার কাছে এসেছি—একটা গোপন ব্যাপার—মেয়রের পদের জন্যে যদি তোমার নাম আমি প্রস্তাব করি, তাহলে বোধহয় বিশেষ কোন বিরোধিতা হবে না। কিন্তু তুমি রাজী হবে তো?

কিন্তু আমি কেন, আমার আগে তো অন্য অনেকের সুযোগ আসা উচিত। তাছাড়া আমার বয়স কম—কেউ কেউ ভাবতে পারে আমার জন্যে তদ্বির করা হচ্ছে—একটু থেমে বলল ফারফ্রী।

না, না, আমি শুধু আমার মতটাই তো বলছি না, অনেকেরই ইচ্ছা তাই। তুমি গররাজী নও তো?

আমরা ভাবছিলাম, এখান থেকে চলে যাব—মাঝখান থেকে বলল লুসেটা। বলে ফারফ্রীর দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে রইল।

না, সেটা একটা খেয়াল আর কি!—ফারফ্রী আস্তে আস্তে বলল—তবে

কাউন্সিলের মোটামুটি সবাই যদি তাই চান, তাহলে আমার আপত্তি নেই।

ঠিক আছে, তবে ধরে নাও তুমি নির্বাচিত হয়ে গেছ। বৃদ্ধ মেয়র আমরা অনেক দেখেছি, আর নয়।

ভদ্রলোক চলে গেলে, ফারফ্রী চিন্তামগ্নভাবে বলল—দেখ, আমাদের কাজকর্ম, চলাফেরা সবই বিধাতার বিধান। ভাবছি একরকম করব—হয়ে যাচ্ছে আরেকরকম। আমাকে যদি এরা মেয়র করতে চায়, তো আমি থেকে যাব এখানে—তাতে হেনচার্ড আরও বেশী করে মাথার চুল ছিঁড়বে—কি আর করা যাবে।

এইদিন সন্ধ্যের পর থেকে লুসেটা যেন খুব অস্থির হয়ে পড়ল। দু'একদিন পরে যখন হেনচার্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ, নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন না হলে, সে অমন কথা হেনচার্ডকে বলতে পারত না। সেদিন হাটবার—লোকের ভিড়ে তাদের কথোপকথন অত কেউ খেয়াল করল না।

লুসেটা বলল—মাইকেল! মাসকয়েক আগে তোমাকে যা বলেছিলাম, আরেকবার তোমাকে সেটা মনে করিয়ে দিতে চাই—আমার চিঠিপত্র বা অন্যান্য কাগজ যা আছে আমাকে ফেরৎ দিয়ে দাও। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—আমাদের সবার মঙ্গলের জন্যে. জার্সির সেই পুরনো দিনগুলোর কথা, আমাদের মুছে ফেলা উচিত।

আরে দেখ কাণ্ড—তোমাকে দিয়ে দেবার জন্যেই তো, আমি সেগুলো বেঁধেছেঁদে তৈরী করে রেখেছিলাম—কিন্তু সেবার সেই গাড়ীতে তো তুমি এলে না।

লুসেটা বলল সেবারে তার মাসি হঠাৎ মারা যাওয়ায় সেদিন সেই গাড়ীতে সে আসতে পারে নি।—কিন্তু পার্সেলটা তাহলে হল কি? প্রশ্ন করল লুসেটা।

নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারল না হেনচার্ড—বলল, ভেবে দেখবে। লুসেটা চলে গেলে, সে মনে করে দেখল, একগাদা অদরকারী কাগজপত্র সে বাণ্ডিল করে রেখে দিয়েছিল, খাওয়ার ঘরের আলমারীর মধ্যে। তার সেই পুরনো বাড়ী এখন ফারফ্রীর দখলে। চিঠিপত্রগুলোও সম্ভবতঃ সেখানেই আছে।

এক দুর্বোধ্য হাসি দেখা দিল হেনচার্ডের মুখে। সে আলমারী কি তবে খুলে দেখেছে কেউ?

পরেরদিনই সন্ধ্যেবেলা ক্যাস্টারব্রিজ যেন উৎসবে মেতে উঠল। চারিদিকে ঘণ্টাধ্বনি। ঝাঁঝ, কাঁসর, আর ঢাক-ঢোলের বাদ্যি-বাজনা শুরু হয়ে গেল। ফারফ্রী মেয়র হয়েছে। রাজা প্রথম চার্লসের যুগ থেকে এই নির্বাচন হয়ে আসছে—এই প্রথায় দুশো কততম যেন স্থান হল ফারফ্রীর। শহরের সবথেকে বেশী শুভেচ্ছা আসতে লাগল লুসেটার কাছে। কিন্তু সুগন্ধি পুষ্পেও যে কীট থাকে!—হেনচার্ডের

কি প্রতিক্রিয়া হবে !

ফারফ্রীর বিরোধিতার ফলেই যে বীজের দোকানটি তার হস্তগত হ'ল না এই মিথ্যা সংবাদে প্ররোচিত হয়ে হেনচার্ড ইতিমধ্যে রি রি করে জ্বলছিল। তার উপরে আবার এই মেয়র হওয়ার খবর আছড়ে পড়ল তার গায়ে। ফারফ্রীর বয়স অল্প, তায় সে স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছে। তাই তার পক্ষে মেয়র নির্বাচিত হওয়া সাধারণ গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও অনেক লোককে আগ্রহী করে তুলেছিল। ব্যাণ্ডের বাজনা আর ঘণ্টাধ্বনি বিমর্ষ হেনচার্ডের কানে বিষবৎ জ্বালা ধরিয়ে দিল—এতদিনে মনে হল তার উৎপাটন সম্পূর্ণ হয়েছে।

পরদিন সকালবেলাও হেনচার্ড অন্যান্য দিনের মত কাজে গেল। বেলা এগারটা নাগাদ ফারফ্রী এসে ঢুকল মরাইতে। এখন আর তাকে আগের মত শ্রদ্ধাবান দেখাচ্ছে না। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরে হেনচার্ডের সঙ্গে তার ভাগ্য-পরিবর্তন এত দৃঢ়ভাবে ফুটে উঠতে লাগল যে স্বভাবতঃ বিনয়ী এই যুবক বরং আরও বিব্রত বোধ করতে লাগল এই ঘটনায়। কিন্তু হেনচার্ডকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন এসব মোটেই গায়ে মাখেনি।

হেনচার্ড বলল—একটা কথা জানতে চাইছিলাম—আমি বোধহয় খাওয়ার ঘরের পুরনো আলমারীতে একটা পুরনো কাগজপত্রের প্যাকেট ফেলে এসেছি। কি কি ছিল তার মধ্যে তাও খুলে বলল হেনচার্ড।

তাহলে সেসব সেইভাবেই আছে—উত্তর দিল ফারফ্রী—আমি তো এখনও পর্যন্ত সে আলমারী খুলে দেখি নি। আমার কাগজপত্র সব ব্যাঙ্কে রাখি আমি—নইলে রাতের ঘুম খুব ভাল হয় না।

না, আমার কাছে এমন কিছু দরকারী নয় সে কাগজপত্রগুলো, বলল হেনচার্ড—তবে তুমি যদি কিছু না মনে করতো, আজ সন্ধ্যেবেলা একবার যাব সেগুলো আনতে।

হেনচার্ড তার কথা রাখল, তবে এল অনেক রাত্রে। আজকাল প্রায়ই মদ্য পান করে সে মেজাজ খুশী রাখত। আজও খেয়েছিল ভাল পরিমাণে। মুখে এক শ্লেষ মিশ্রিত হাসি—যেন কি একটা ভয়ঙ্কর মজা অপেক্ষা করছে তার জন্যে। মালিক হিসাবে এই বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার পর এই প্রথম আবার ঢুকল সে এখানে। বেল বাজাল—তাতে যেন আগেকার সেই হাঁকডাক-মিশ্রিত আলাপের ধ্বনি—দরজা খুলে ঢুকল সে—তাতেও পুরনো দিনের স্মৃতি ভেসে উঠল।

ফারফ্রী তাকে ডেকে খাওয়ার ঘরে নিয়ে বসাল। আলমারীটা সে খুলে ফেলল। হেনচার্ডের নিজের আলমারী—তারই নির্দেশে বিশেষ ভাবে দেওয়াল কেটে তৈরী করা। ফারফ্রী সেখান থেকে চিঠি এবং অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্যাকেটটা টেনে

বার করল। সময়মত সেগুলো ফেরৎ না দিতে পারার জন্যে ফারফ্রী দুঃখপ্রকাশ করল বারবার।

শুষ্ককণ্ঠে হেনচার্ড বলল—না, না, তাতে কি আছে। ও'তে বেশিরভাগই হচ্ছে—তোমার—চিঠিপত্র। লুসেটার চিঠির বাণ্ডিল খুলতে খুলতে সে বলতে লাগল—এই আবার খুলে দেখতে হচ্ছে আমাকে। আচ্ছা! মিসেস ফারফ্রী ভাল আছেন তো? কাল সারাদিনে তাঁকে তো কম ধকল সইতে হয় নি।

হ্যাঁ, একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর কি! তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে আজ।

চিঠিগুলোকে খুলে পরপর সাজাতে লাগল হেনচার্ড। ফারফ্রী তখন খাওয়ার টেবিলের উল্টোদিকে বসে। হেনচার্ড বলতে লাগল—তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে—সেই যে আমার অতীত জীবনের ইতিহাস তোমাকে বলেছিলাম। আমাকে কিছু কিছু পরামর্শও দিয়েছিলে তুমি। চিঠিগুলো সব সেই সময়কার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এখন সে ঝামেলা সব মিটে গেছে!

বেচারী সেই মেয়েটির কি হল শেষপর্যন্ত? ফারফ্রী শুধাল।

পরে তার বিয়ে হয়ে গেছে। ভাল জায়গাতেই বিয়ে হয়েছে। বলল হেনচার্ড—তাই এই যে সব চিঠিপত্র সে আমাকে লিখেছিল—এখন আর এগুলোর জন্যে আমার কোন টান নেই। শোনো, শোনো, মেয়েরা রেগে গেলে কেমন চিঠি লেখে শোনো।

ফারফ্রীর নিজের মোটেই আগ্রহ ছিল না, হাই তুলছিল বারবার। তবু হেনচার্ডকে খুশী করার জন্যেই সে যথাসম্ভব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

আমার নিজের আর ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই—পড়তে লাগল হেনচার্ড—তোমার কাছে নিজেকে এত উজাড় করে দিয়েছিলাম—যে এখন অন্য কারও স্ত্রী হব ভাবতেও শিউরে উঠি। কিন্তু তোমার কাছে এখন আমি রাস্তায় দেখা-হওয়া অন্য যে কোনো মেয়ে লোকের থেকে একটুও বেশী নই। আমাকে নষ্ট করেছ, এমন কোনো অপবাদ তোমাকে দিতে চাই না তবু তোমার জন্যেই আমার আজ এই অবস্থা। তোমার বর্তমান স্ত্রী মারা গেলে হয়তো আমাকে ঘরে নেবে এই একটিমাত্র সান্ত্বনা আমার আছে। কিন্তু সে আর কতটুকু ভরসা? আমার আত্মীয়স্বজনরা আমাকে ত্যাগ করেছে—আর তুমিও তাই করলে!

এইভাবেই লিখেছে সে একের পর এক চিঠিতে—বলল হেনচার্ড—অথচ পরিস্থিতি তখন এমনই যে আমার কিছু করবার ছিল না।

হুঁ—ফারফ্রী আলতো করে বলল—সব মেয়েদেরই ঐ এক কথা। ফারফ্রী যদিও নারীজাতি সম্পর্কে জানত খুবই অল্প কিন্তু সে নিজে যেমন মেয়েকে পছন্দকরে আর এই অপরিচিতা ভদ্রমহিলার মধ্যে এমন সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছিল

যে মহিলাটি যেই হোক না কেন সবার মধ্যেই এক আফ্রোদিতিকে দেখতে পাচ্ছিল ফারফ্রী।

আর একটা চিঠি খুলে পড়ে ফেলল হেনচার্ড একেবারে ইতি—লেখার আগে পর্যন্ত।—তার নাম কি আমি বলব না—হেনচার্ড বলল খুব ভদ্রভাবে—আমি যেহেতু তাকে বিয়ে করি নি, অন্যলোকে বিয়ে করেছে অতএব তার নামটা বলে দেওয়া ঠিক হবে না।

সে তো ঠি-ক-ই—বলল ফারফ্রী—কিন্তু আপনার স্ত্রী সুসান মারা গেলে তাকে বিয়ে করলেন না কেন? এইরকম আরও কিছু কিছু প্রশ্ন করল ফারফ্রী। প্রশ্নগুলো নিতান্তই নির্লিপ্ত যেন ব্যাপারটার সঙ্গে তিলমাত্রও সম্পর্ক নেই।

হ্যাঁ সেটা একটা কথা বটে! নবচন্দ্রোদয়ের মত হাসি দেখা দিল হেনচার্ডের মুখে। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত রাজী করানো গেলেও আমি যখন বিয়ে করব বলে এগিয়ে গেলাম, তখন সে আর আমার নেই।

কেন অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলেছে বুঝি তার মধ্যে?

হেনচার্ড ভাবল সবকিছু আরও খুলে বলতে গেলে সব বেরিয়ে পড়বে, তাই কোন-রকমে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

তবে বোধহয় ভদ্রমহিলার হৃদয়টা যেখানে সেখানে খুব সহজেই জোড়া লেগে যায়।

ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ। হেনচার্ড জোর দিয়ে বলল।

তৃতীয় চতুর্থ আরও একটা চিঠি পড়ে ফেলল হেনচার্ড। পড়তে পড়তে তার মনে হচ্ছিল চিঠির নীচে স্বাক্ষরটিও বোধহয় সে পড়ে ফেলছে। কিন্তু সময় থাকতেই থেমে যাচ্ছিল সে। আসলে কথাটা হল, এই রকম নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এই আশাতেই সে আজ এসেছিল এখানে। কিন্তু এখন ঠাণ্ডা মাথায় তা সে করতে পারল না। হৃদয়টা এমন খানখান করে ভেঙে দেওয়ার চিন্তা, তাকেও বোধহয় ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। হেনচার্ড মানুষটা এমনই, যে শারীরিক আঘাত করতে বললে, সে ওদের দুজনকেই একেবারে শেষ করে দিতে পারত—কিন্তু তাই বলে কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মুখে হলাহল ছড়ানো, তার শত্রুতার সংজ্ঞায় আসত না।

।। পঁয়ত্রিশ ।।

লুসেটা ক্লান্ত বলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল। সেইরকমই মনে করেছিল ফারফ্রী। শুয়ে কিন্তু সে পড়েনি, বিছানার ধারে চেয়ারে বসে, সারাদিনের ঘটনাগুলো ভাবছিল মনে মনে। হেনচার্ড যখন বেল বাজাল, লুসেটার আশ্চর্য লাগল, এত রাতে কে এল আবার। খাওয়ার ঘরটা প্রায় তার শোয়ার ঘরের নিচেই। একজন কেউ এসে সেখানে ঢুকল, এটা ওপর থেকে বোঝা গেল বেশ। আস্তে আস্তে কিছু একটা পড়ার শব্দও শোনা যাচ্ছিল।

সাধারণতঃ যে সময়টাতে ডোনাল্ড ওপরে আসে, সে সময়টি এসে চলে গেল; তবুও নিচের পড়া এবং কথাবার্তা থামল না। এমনটি তো কোনদিন হয় না। লুসেটার মনে হল, অন্য আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই ভয়ানক কোন অপরাধের ঘটনা ঐ আগন্তুক 'ক্যাস্টারব্রিজ ক্রনিক্‌ল্‌' নামক সংবাদপত্র থেকে পড়ে শোনাচ্ছে ফারফ্রীকে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল লুসেটা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। খাওয়ার ঘরের দরজাটা আদ্ধেক ভেজানো। একদম নিচের ধাপে নেমে আসার আগেই নিঃস্তব্ধ বাড়ীতে সে ঐ কণ্ঠস্বর এবং তার পাঠ্য বিষয়বস্তু পরিষ্কার চিনে নিতে পারল। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লুসেটা। হেনচার্ডের গলা থেকে তার নিজেরই কথাগুলো বেরিয়ে আসছে—যেন কবর থেকে প্রেতাত্মার মত।

দেওয়ালে ভর দিয়ে, সিঁড়ির রেলিংয়ের উপর গাল রেখে শুনতে লাগল লুসেটা যেন এই দুর্দিনে সেটিই তার একান্ত বন্ধু। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বহুকথা এসে পৌঁছুল তার কানে। কিন্তু তার স্বামীর কণ্ঠস্বরটাই যেন বড় আশ্চর্যজনক। নিতান্ত সাধারণভাবে সে বলছে—আচ্ছা একটা কথা!—হেনচার্ড তখন নতুন আর একটা পাতা ওল্টাচ্ছে—সেই ভদ্রমহিলার চিঠি এত খোলাখুলিভাবে একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছে পড়াটা কি ঠিক হচ্ছে? চিঠিগুলো তো শুধু আপনার জন্যেই লেখা!

হেনচার্ড উত্তর দিল—তা নয়! আমি তো তার নাম বলি নি। শুধু নারীজাতির উদাহরণ হিসেবে তোমাকে শোনালাম—কারও কুৎসা করার জন্যে নয়।

আমি হলে ওসব নষ্ট করে ফেলতাম। বলল ফারফ্রী। এতক্ষণ সে চিঠিগুলো সম্পর্কে এত আগ্রহ প্রকাশ করে নি।—সে ভদ্রমহিলা এখন অপরের স্ত্রী—কাজেই

এটা জানাজানি হলে তার বদনাম হবে।

না, আমি এ'র একটাও নষ্ট করব না—চিঠিগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে বলল হেনচার্ড। তারপর সে উঠে পড়ল। আর কিছু লুসেটার কানে এল না।

অর্দ্ধ-অসাড় অবস্থায় লুসেটা তার শোবার ঘরে ফিরে গেল। ভয়ে সে জামাকাপড়ও ছাড়ল না, বিছানার একপ্রান্তে বসে থাকল চুপ করে। হেনচার্ড কি তবে যাওয়ার সময় গোপন কথাটি বলে যাবে? দুঃসহ এই সশঙ্ক প্রতীক্ষা। ডোনাল্ডকে সে যদি তার সদ্যোপরিচয়ের দিনগুলোতে সব কিছু খুলে বলত, তবে হয়তো ডোনাল্ডের পক্ষে এটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল, বিয়ে থা'ও হয়ে যেত যথারীতি—যদিও আগে সেটা আদৌ সম্ভব বলে মনে হয়নি। কিন্তু এখন তার পক্ষে বা অন্য যে কোনো মেয়ের পক্ষেও এসব খুলে বলতে যাওয়াটা অতি মারাত্মক।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লুসেটা শুনতে পেল, তার স্বামী ছিটকিনি টেনে দিচ্ছে। অন্যদিনের মত সবদিক দেখে শুনে আস্তে আস্তে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। শোয়ার ঘরে যখন সে ঢুকল এসে, লুসেটার চোখদুটো থেকে জ্যোতি নিভে এল প্রায়। মুহূর্তের জন্যে তার দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল—কিন্তু তারপরেই আনন্দের ঝিলিক দিয়ে উঠল যখন সে দেখল যে ফারফ্রী হাসছে, যেন বহুক্ষণের এক বিরক্তিকর অধ্যায় থেকে মুক্তি পেয়ে উঠে এসেছে। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না লুসেটা, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

একটু নিজেকে যখন সামলে নিল সে, ফারফ্রী স্বাভাবিকভাবেই হেনচার্ডের কথাবার্তা শুরু করল—ওঁনার মত লোকের সঙ্গে কে দেখা করতে চায়! তাছাড়া এখন বোধহয় ভদ্রলোক খানিকটা উন্মাদের মত হয়ে গেছেন। কবেকার কোন অতীত জীবনের পাওয়া একগাদা চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিল আমাকে—আমি আর কি করব, বসে শোনা ছাড়া উপায় ছিল না।

এইটুকুতেই যথেষ্ট বোঝা গেল। হেনচার্ড তাহলে নাম-টাম কিছু বলে নি। চলে যাওয়ার সময় ফারফ্রীকে সে যা বলেছিল তা হ'ল—যাক্, তুমি যে বসে শুনলে এতক্ষণ, সেজন্যে ধন্যবাদ। আরেকদিন তোমাকে তার সম্পর্কে অনেক কথা বলব।

এইকথা শুনে, হেনচার্ডের মনে কি মৎলব আছে, তাই ভেবে চিন্তায় পড়ে গেল লুসেটা। মানুষ যাকে শত্রু বলে ভাবে, তার সম্পর্কে বহু কাল্পনিক ভয়ের চিন্তা করতে বাধে না, যদিও প্রতিশোধ নেওয়া বা উদারতা দুটোই হয়তো তার পক্ষে সমান অসম্ভব হতে পারে।

পরদিন সকালবেলা লুসেটা বিছানায় শুয়ে শুয়েই ভাবতে লাগল, কিভাবে এই আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করবে। একেকবার ভাবল সেটা দুঃসাহসে পরিণত হবে।

তার ভয় ছিল, হয়তো সবকিছু শুনলে পরে ফারক্রীও আর সবার মত তার দুর্ভাগ্যকে দোষ না দিয়ে, তাকেই যত দোষারোপ করবে। লুসেটা ঠিক করল বুঝিয়ে রাজী করাবে—ডোনাল্ডকে নয়, তার শত্রুকেই। নারী হিসাবে এখন তার হাতে এই একটি অস্ত্রই অবশিষ্ট আছে। পরিকল্পনা ঠিক করে সে কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল হেনচার্ডকে, যার জন্যে আজ এই আতঙ্কের দোলায় দুলতে হচ্ছে তাকে।

গত রাত্রে আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার যে কথোপকথন হয়েছে, তা আমি শুনেছি। তোমার চোখে দেখেছি প্রতিহিংসার তীব্রতা। এই চিন্তাতেই আমি মাটিতে মিশে যাচ্ছি। আমার জন্যে কি তোমার মনে একটুও অনুকম্পা হয় না। আমাকে দেখলে তোমার দুঃখ বাধা মানবে না। তুমি জান না, ইদানীং আমি কি এক উদ্বেগের মধ্যে আছি! আজ সন্ধ্যেবেলা যখন তুমি কাজ ছেড়ে যাবে—আমি থাকব দি রিংয়ের কাছে—ঠিক সূর্যাস্তের আগে। দয়া করে ঐ পথে এসো। তোমার সঙ্গে মুখোমুখি কথা না হওয়া পর্যন্ত আমার আর স্বস্তি নেই। তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই যে আর এভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে না তুমি।

চিঠি লেখা শেষ করে সে নিজের মনে মনে বলল—সবলের সঙ্গে লড়তে হলে, দুর্বলের একমাত্র অস্ত্র হল অনুরোধ আর চোখের জল—একথা যদি সত্যি হয়, তবে তার পরীক্ষা হয়ে যাবে আজ।

এইভেবে সে আজ একটু অন্যরকম সাজগোজ করল। সাবালিকা হওয়ার পর থেকেই বহুভাবে নিজেকে সাজিয়ে আরও মোহময়ী করে তোলার বিদ্যায় তার অভিজ্ঞতাও কম ছিল না। কিন্তু আজকে তা করল না—এমনকি নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকেও কিছুটা ম্লান করে তোলার চেষ্টা করল। আগের দিন রাত্রে ঘুম হয়নি একফোঁটা—তাছাড়া উদ্বেগ—চোখমুখে এক দুঃখজনিত বার্দ্ধক্যের ছাপ এসে পড়েছে। সবথেকে সাদাসিদে, বহুপুরোন একটা পোষাক বার করল সে—এ'র থেকে ভাল যেমন তার পরতে ইচ্ছা করছিল না, তেমনি এটাই আবার পরার জন্যে ইচ্ছাও হচ্ছিল খুব।

পাছে ধরা পড়ে যায় তাই ওড়নায় মুখ ঢেকে, নিঃশব্দে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল লুসেটা। পাহাড়ের ওপারে সূর্য দেখা যাচ্ছে, চোখের পাতার উপর একফোঁটা রক্তের মত। ধ্বংসপ্রাপ্ত অ্যাম্ফিথিয়েটারের উল্টোদিক দিয়ে উঠে এল লুসেটা। ভেতরটা ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার—জনপ্রাণীর অনুপস্থিতি ঘোষণা করে চলেছে সজোরে।

ভয়মিশ্রিত আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিল লুসেটা। হতাশ হতে হল না। উঁচু পাচিল পার হয়ে আস্তে আস্তে নেমে এল হেনচার্ড—লুসেটা তখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ভেতরে নেমে এলে পর হেনচার্ডকে কেমন যেন একটু

অস্বাভাবিক মনে হল। বেশ খানিকটা তফাৎ থাকতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কেন তা লুসেটা বুঝতে পারল না।

অন্য কারো জানবার কথাও নয়। পরস্পরের মিলনের জন্যে লুসেটা এমন একটি জায়গা এবং সময় নির্বাচন করেছিল যে, কথাবার্তা শুরু হওয়ার আগেই, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল অর্ধেক। হেনচার্ড এমনই খেয়ালী মানুষ, আর তার মনের মধ্যে এত অন্ধকার ও কুসংস্কার রয়েছে—যে এই বিরাট শূন্যতার মধ্যে লুসেটাকে দেখে তার আরেকজনের কথা মনে পড়ে গেল। সেইরকমই সাধারণ পোষাক, আশা এবং আবেদন মিশ্রিত সেই একই মনোভাব—অনেকদিন আগে এই রকম পরিস্থিতিতেই আর এক হতভাগ্য নারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—সে এখন নীরব শান্তিতে শায়িত। হেনচার্ডের পৌরুষ অর্ধেক উবে গেল—দুর্বল এই নারীর প্রতি আঘাত করার চিন্তাও সে মনে আনতে পারল না। হেনচার্ড যখন এসে দাঁড়াল, লুসেটা কিছু বলার আগেই তার কার্যসিদ্ধি করে ফেলল অর্ধেক।

নির্লিপ্ত উদাসভাবে নেমে আসছিল হেনচার্ড। নিষ্ঠুর সেই আধো-হাসি এখন তার মুখে দেখা গেল না, বরং সদয় মৃদুস্বরে সে বলল—গুড নাইট। তুমি আমাকে আসতে বলেছ বলে খুব খুশী হয়েছি।

ব্যাপার কিছুটা আন্দাজ করে লুসেটা বলল—অনেক ধন্যবাদ।

নিজের মনের কারুণ্য লুকোতে পারছিল না হেনচার্ড, কিছুটা আমতা আমতা করে বলল—তোমাকে এত অসুস্থ দেখে খুব খারাপ লাগছে।

লুসেটা মাথা নাড়ল, তারপর বলল,—তোমার খারাপ লাগবে কেন? তোমার জন্যেই তো এমন হয়েছে।

কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে বলল হেনচার্ড—কেন? আমি কি কোনরকমে ক্ষতি করেছি তোমার?

লুসেটা বলল—তোমার জন্যেই তো! আর তো কোন দুঃখ নেই আমার! তুমি ভয় দেখানোর জন্যেই আমি আজ সুখ পেয়েও সুখী হতে পারছি না। মাইকেল! এভাবে শাস্তি দিয়ো না আমাকে। যখন এখানে এসেছিলাম বয়স কম ছিল। এখন কত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছি। আর কিছুদিন পর আমার স্বামী কেন, কেউ আমাকে পুঁছবে না।

হেনচার্ড নিরস্ত্র হয়ে গেল। নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণা জেগে উঠল তার—এই ভাবে যে নিজেকে লুটিয়ে দিয়েছে —অনেকটা যেন প্রথমা স্ত্রীর প্রতিমূর্তি। তাছাড়া, যে দূরদৃষ্টির অভাব লুসেটার যাবতীয় ঝঞ্ঝাটের কারণ, সেই দোষটি তার এখনো পুরোমাত্রায় রয়ে গেছে—এই ভাবে না ভেবেচিন্তে সে এমন জায়গায় তার সঙ্গে দেখা

করতে এসেছে। এমন নারীকে কিছু বলা যেন নিতান্ত শিশু এক হরিণ শাবককে শিকার করা। হেনচার্ডের লজ্জা লাগল। লুসেটাকে অপমান বা উত্যক্ত করার যাবতীয় বাসনা দূর হয়ে গেল মন থেকে। ফারফ্রীর জন্যেও আর হিংসা হচ্ছিল না তার। ফারফ্রী ও'র টাকাকেই বিয়ে করেছে। আর কিছু পায় নি। হেনচার্ড স্থির করল এসব থেকে সে হাত গুটিয়ে নেবে।

খুব ভদ্রভাবে বলল সে—আচ্ছা! তুমি আমাকে কি করতে বলো! যা বলবে তাতেই রাজী। চিঠিগুলো সেদিন পড়ছিলাম নেহাৎ মজা করার জন্যে—তাছাড়া আমি তো কিছুই বলি নি।

তুমি আমাকে সেই চিঠিগুলো বা বিয়েসংক্রান্ত অন্য আর কিছু কাগজপত্র থাকলে ফেরৎ দিয়ে দাও।

তাই হবে। সব দিয় দেব। কিন্তু তোমার এবং আমার মধ্যে কিছু একটা বোধহয় সে ধরে ফেলবে—এখনই হোক বা পরেই হোক।

কিন্তু ততদিনে আমি তার একান্ত নির্ভরযোগ্য স্ত্রী হয়ে যাব—কাজেই তখন হয়তো সে অপরাধের জন্যে পার পেয়ে যাব।

নীরবে তাকিয়ে থাকল হেনচার্ড তার দিকে। এতখানি ভালবাসা পাওয়ার জন্যে তার যেন একেকবার ফারফ্রীর প্রতি হিংসা হচ্ছিল। হেনচার্ড বলল—তা হয়তো ঠিক। তবে তোমার চিঠিপত্র সব ফেরৎ পেয়ে যাবে এবং আমি শপথ করছি কাউকে বলবো না।

তুমি এত ভাল! কিন্তু কি করে পাব আমি?

একটু চিন্তা করে হেনচার্ড বলল, পরদিন সকালে পাঠিয়ে দেবে। আরও বলল—আমাকে অবিশ্বাস কোর না—আমি কথা রাখতে জানি।

॥ ছত্রিশ ॥

ফিরে এসে লুসেটা বাড়ী ঢোকার মুখে দেখল, ঠিক তার দরজার সামনে একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। একটু থেমে যেই ভেতরে ঢুকতে যাবে, লোকটা এগিয়ে এল। সে জোপ।

অনেক কাকুতি-মিনতি করে কথা পাড়ল সে—মিঃ ফারফ্রীর কাছে নাকি একজন বড় আড়ৎদার, কাজকর্ম দেখাশোনা করার মত একজন অংশীদার খুঁজে দিতে বলেছে। জোপ এই কাজটা পাওয়ার জন্যে আগ্রহী। দরকার হলে সে উপযুক্ত

টাকা জমা রাখতেও পারে। এসব কথা মিঃ ফারফ্রীকেও সে চিঠি লিখে জানিয়েছে। কিন্তু লুসেটা যদি একবার তার হয়ে সুপারিশ করে দেয় তো বড় উপকার হয়।

লুসেটা পাত্তা না দেওয়ার সুরে বলল—আমি তো সেসব জানি না কিছুই।

কিন্তু ম্যাডাম! আপনি তো আমাকে অনেকের থেকে ভালই জানেন—জোপ বলল—জার্সিতে থাকতে অনেক বছর আপনাকে দেখেছি।

তাই নাকি, আমি তো চিনতাম না। লুসেটা উত্তর দিল।

জোপ পীড়াপীড়ি করতে লাগল—আপনি একবার একটু বলে দিলে, কাজটা আমি পেয়ে যাই, যদি একটু বলে দেন।

লুসেটা সরাসরি জানিয়ে দিল, এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে না। স্বল্পকথায় রাস্তা থেকেই বিদায় করে দিল তাকে—বাড়ী ঢোকার জন্যে তখন তার মন অস্থির হচ্ছে। ফারফ্রী এতক্ষণে কিছু টের পেয়েছে কি না কে জানে। তাই জোরে জোরে বাড়ীর মধ্যে পা চালাল লুসেটা।

জোপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, যতক্ষণ তাকে দেখা যায়। তারপরে সেও ফিরে গেল। বাসায় ফিরে জ্বলন্ত আঁচের কিনারে বসে থাকল সে চুপচাপ। ওপরতলায় নড়াচড়ার শব্দ শুনে কিঞ্চিৎ বিচলিত বোধ করছিল—এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল হেনচার্ড—তার হাতে ছোট একটা বাক্সের মত বস্তু।

হেনচার্ড বলল—জোপ! তুমি যদি আমার একটা কাজ করে দাও, খুব উপকার হয়। মানে, তুমি পার তো আজ রাত্রে একবার এইটা মিসেস ফারফ্রীর হাতে দিয়ে এসো। আমার নিজেরই দিয়ে আসা উচিত—কিন্তু আমি ঠিক যেতে চাই না ওখানে।

হেনচার্ড তার কথা রেখেছিল। বাঁশপাতা কাগজে মুড়ে সীলকরা একটা প্যাকেট সে জোপের হাতে দিয়ে দিল। আস্তানায় ফিরেই হেনচার্ড পুরনো যাবতীয় জিনিসপত্র ঘেঁটে-ঘুঁটে লুসেটার লেখা যা কিছু দেখেছিল সব বার করে বেঁধে ফেলেছিল। জোপ কিছুটা নিরাসক্তভাবে সম্মতি জানাল।

হেনচার্ড জিজ্ঞেস করল—আজ সারাদিন কি করলে? কোনও সুরাহা হল কিছু?

নাঃ, কিছুই তো দেখছি না। বলল জোপ। তবে ফারফ্রীকে সে যে চিঠি লিখেছে সে ব্যাপারে কিছু ভাঙল না।

ক্যাস্টারব্রিজে থেকে আর হবেও না কিছু—হেনচার্ড বলল—অন্য কোথাও না গেলে উপায় নেই। বলে জোপকে শুভরাত্রি জানিয়ে হেনচার্ড ফিরে গেল নিজের কুঠুরিতে।

জোপ একা-একাই বসেছিল। দেওয়ালের গায়ে প্রদীপশিখার ছায়ায় নজর

আটকে গেল তার। ছায়ার থেকে নজর গেল প্রদীপের দিকে—ঠিক যেন জ্বলন্ত লাল একটা ফুলকপি। তারপরেই দৃষ্টি গেল হেনচার্ডের প্যাকেটের দিকে। হেনচার্ড আর মিসেস ফারফ্রীর মধ্যে যে একসময় কিছুটা ভালবাসাবাসির সম্পর্ক ছিল একথা জানত জোপ। তার সেই অস্পষ্ট ধারণা এখন এই বস্তুটিকে এসে আশ্রয় করল। হেনচার্ডের কাছে এতদিন মিসেস ফারফ্রীর এমন কি জিনিস পড়েছিল যেটা নিজে গিয়ে ফেরৎ দিতে চায় না? ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো বটে। কি থাকতে পারে এই প্যাকেটের মধ্যে? এটা ভাবতে আর লুসেটার দুর্ব্যবহারের কথা মনে পড়ায় জোপ ভাবল হয়তো এ'র মধ্যে হেনচার্ডের প্রতি লুসেটার পুরনো দুর্বলতার কিছু চিহ্ন থেকে যেতে পারে। প্যাকেটটা সে খুলে ফেলল। কাগজকলম বা তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে হেনচার্ড ছিল নিতান্তই আনাড়ি এবং অমনোযোগী—তাই প্যাকেটটা গালা এঁটে বন্ধ করে দিলেও সে তাতে কোনও মোহরের ছাপ দিয়ে দেয় নি। এ চিন্তা তার মনে একবারও উদয় হয় নি যে মোহর এঁকে না দিলে, ও ভাবে গালা এঁটে বন্ধ করাটাই অর্থহীন। এসব কর্মে জোপের এটা হাতেখড়ি নয়। ছুরির ফলা দিয়ে এককোনের গালা আলগা করেই সে দেখতে পেল—ভেতরে চিঠিপত্রের বাণ্ডিল। আপাততঃ এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে বাতির আগুনে গালা নরম করিয়ে এঁটে দিল সে আবার। তারপর বেরিয়ে পড়ল হেনচার্ডের অনুরোধ রাখতে।

শহরের প্রান্তে নদীর ধার দিয়ে রাস্তা। হাই স্ট্রীটের শেষে সাঁকোর কাছে এসে মৃদু আলোয় সে দেখল মাদার কাক্সম আর ন্যান্স মকারিজ দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা যাচ্ছি মিক্সেন লেন-এর দিকে। শুয়ে পড়ার আগে একবার 'পিটার'স ফিঙ্গার, থেকে ঘুরে আসি গে যাই। কাক্সম বুড়ী বলল। আজ বোধহয় একটু গানবাজনা আছে ওখানে। আরে তুমি কোথায় চললে জোপ? চলো চলো পাঁচ মিনিট ঘুরে যাবে আমাদের সাথে।

জোপ সচরাচর এইসব লোকদের এড়িয়ে চলত বটে কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে সে অন্যদিনের মত আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করল না। কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ওদের সাথে।

ডার্ণওভার গাঁয়ের যত ওপরদিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই দেখা যায় খামার আর মরাইয়ের শোভা। কিন্তু গাঁয়ের সর্বত্র সমান নয়। বিশেষ করে এই নিচের দিকে যে এলাকাটার নাম মিক্সেন লেন—এখন এই পল্লীটার একেবারে জীর্ণদশা। আশপাশের পাড়াগুলোর মধ্যে মিক্সেন লেন-এর একটা বিশেষ পরিচয় আছে। লোকে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে, ধার শোধ করতে না পারলে, বা যে কোনরকম ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্যে এখানে এসে আশ্রয় নেয়। যেসব দিনমজুর আর চাষী

বিনা অনুমতিতে শিকার করায় অপরাধী, বা অলস মিস্ত্রী আর বদমেজাজী চাকর —তারা সবাই দুদিন আগে বা পরে এখানে এসে আশ্রয় খুঁজে নিতে বাধ্য হয়।

নিচু জলা জায়গা—তারমধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো মেটে ঘর। অনেক বেদনা, অনেক হীনতা—এবং অপবিত্রতা ঘোরাফেরা করতো এই মিক্সেন লেনে। এখানকার কিছু কিছু ঘরে পাপের অবাধ চলাফেরা। কোন কোন কালো চিমনীর তলা দিয়ে উঁকি দেয় অভিশাপ—আর মেটে দেওয়ালের নিচু জানালা পথে ধরা পড়ে যায় লজ্জা আর অবমাননা। এমনকি নরহত্যাও এখানে অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেক যুগ আগে হয়তো এই গলির কুটিরে কুটিরে ব্যাধির নামে পূজার বেদী তৈরী হয়েছিল। হেনচার্ড আর ফারফ্রী যেসময়ে মেয়র ছিল—এই ছিল তখনকার মিক্সেন লেন-এর হাল।

এই পাপ-পুরীর পাশেই কিন্তু খোলামেলা প্রান্তর। অনেক উন্নতমস্তক মহান বৃক্ষ। এবং অপরদিকে বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা। একটা ছোট খাল এই বস্তিটাকে প্রান্তরের থেকে আলাদা করে রেখেছে। আপাতঃদৃষ্টিতে পার হয়ে এদিকে আসার কোনও উপায় নেই—অনেকটা ঘুরে বড় রাস্তা দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু এদের প্রতিটি ঘরেই একখানা করে ইঞ্চিনয়েক চওড়া তক্তা আছে—সেটা দরকারমত সাঁকোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

সন্ধ্যের পরে কাজকর্ম সেরে এখানকার গৃহস্থরা গোপনে অন্ধকারে মাঠের শেষে ওপারে এসে দাঁড়ায়—খালের তীরে যেটা তার ঘর, ঠিক তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে শিষ দেয়—তারপরই দেখা যায় মনুষ্যাকৃতি একটা চেহারা সাঁকোটাকে ঘাড়ে করে এনে পেতে দেয় খালের ওপর। তারপর একপা দুপা এগুতেই—অপর দিক থেকে একখানা হাত এগিয়ে এসে পার হয়ে যেতে সাহায্য করে। লোকটির সঙ্গে কখনও কখনও পাশের খামার থেকে দুয়েকটা মুরগী বা খরগোস পার হয়ে আসে, পরদিন সকালবেলা সঙ্গোপনে বিক্রী হয়ে যায়। মাঝখানে ধরা পড়ে গেলে সেই গৃহস্থকে কয়েক দিনের জন্যে আর দেখা যায় না। তারপর আবার সে এসে হাজির হয় এই মিক্সেন লেন-এর ডেরায়।

সন্ধ্যের সময় এখানে এলে যে কোন নতুন লোকেরই দু'তিনটে ব্যাপার চোখে পড়বেই—এক হচ্ছে অদূরেই সরাইখানা থেকে ভেসে আসা একটানা ঝনর ঝনর আওয়াজ—আরেক হল, প্রায় সব ঘরের সামনেই হঠাৎ হঠাৎ শিস দেওয়ার ধ্বনি, প্রায় প্রত্যেক খোলা দরজা পথেই সেই ধ্বনি ভেসে আসে। তাছাড়া অনেক ঘরের দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে নোংরা শতচ্ছিন্ন গাউনের ওপর সাদা এ্যাপ্রণ পরা মেয়েরা। এমন পরিবেশে এ্যাপ্রণের শুভ্রতাও মনে মনে সন্দেহ জগিয়ে তোলে। শুভ্রতা এখানে একেবারেই অশোভন, বিশেষতঃ যেসব মেয়েরা এই পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের চালচলন

যেন সাদা রংয়ের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। দুইহাত দুইদিকে পাছার উপরে দিয়ে (অনেকটা যেন দুই হাতল ওয়ালা মগের মত) দরজার চৌকাঠের গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা—আবার এদের প্রত্যেকেরই গলার ওপর থেকে উঠে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো অসম্ভব রকমের অশান্ত। গলিতে কোনও পুরুষের পদক্ষেপ শুনতে পেলেই তাদের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ওঠে—ভ্রুভঙ্গি নজরে পড়ে যায়।

'পিটার'স ফিঙ্গার' নামক সরাইখানাটিকে এই এলাকার গীর্জা বলা যেতে পারে। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত—সরাইখানাটির অবস্থান এই পল্লীর কেন্দ্রস্থলে প্রায়—'কিংস আর্মস' নামে বড় হোটেলটার সঙ্গে 'থ্রী মেরিনার্স'-এর যেমন সম্পর্ক বা পার্থক্য 'থ্রী মেরিনার্স'-এর সঙ্গে 'পিটার্স ফিঙ্গার'-এরও তাই। প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে সরাইখানাটিকে বেশ উচ্চশ্রেনীর বলেই মনে হয়। সামনের দরজাটি বন্ধ। সিঁড়ির ধাপগুলো এত পরিষ্কার যে বেশ বোঝা যাচ্ছে দু'চারজনের বেশী অতিথির আগমন হয়নি এখনও পর্যন্ত। কিন্তু সরাইখানাটির ঠিক পাশ দিয়ে সরু এক ফালি রাস্তা—পাশের বাড়ীটাকে পৃথক করে রেখেছে—সেই পথে একটু এগিয়ে গেলেই ছোট একটা দরজা চকচক করছে—বহু ব্যক্তির হাত ও কাঁধের ঘষটানিতে জায়গায় জায়গায় রং উঠে গেছে। এটিই সরাইখানার আসল প্রবেশপথ।

এখানে যে ধরনের লোকরা এসে আসন গ্রহণ করেছে, তার তুলনায় 'থ্রী মেরিনার্সের' অতিথিদের গুণগত পার্থক্য আছে—তবে মেরিনার্সের নিচু স্তরের লোকেদের সঙ্গে এখানকার উঁচুস্তরের খদ্দেরদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। মালিকানী ভদ্রমহিলার বেশ নামডাক আছে—বছর কয়েক আগে, কি এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায়, অন্যায়ভাবে তাঁকে হাজতেও পাঠানো হয়েছিল।

জোপ এবং তার পরিচিতা দুই মহিলা এখানেই এসে উঠল। অন্যান্যদের মধ্যে দেখা গেল সেই ফার্মিটি-বুড়িও এখানে বসে আছে। অতি সম্প্রতিই এই ভদ্রজনদের সমাবেশে সে'ও জায়গা করে নিয়েছিল। বয়সকালে সে অনেক দেশ ঘুরেছে—তাই কথা বলার সময় তার চোখেমুখে ফুটে উঠত এক বিশাল সার্বজনীনতা এবং বিস্তৃত ধারণা। সে'ই জিজ্ঞাসা করল জোপকে, অমন বগলদাবা করে কিসের প্যাকেট নিয়ে চলেছে সে।

সেটাই তো আসল গোপন কথা—বলল জোপ—প্রেম-ভালবাসার ব্যাপার! কে বলতে পারে মেয়েলোকে কেন এক পুরুষকে অত ভালবাসে, আবার আরেক-জনকে নিষ্ঠুরের মত দূরে সরিয়ে দেয়!

কার কথা বলছ হে বাপু?

এই শহরের মধ্যে একজন মান্যগণ্য মহিলা তো বটেই—এই যে তার প্রেমপত্র

সব আমার হাতে। ইচ্ছে করলেই আমি তার মান-সম্মান খুইয়ে দিতে পারি।

প্রেমপত্র? তাহলে পড়ে ফেল, শোনা যাক—বলল কাক্রম-বুড়ী—আরে মনে পড়ে রিচার্ড! কি বোকা ছিলাম আমরা কাঁচা বয়সে! ইস্কুলের ছোঁড়াদের ধরে চিঠি লিখিয়ে নিতাম—আর একটা পেনি দিয়ে বলতাম—কাউকে যেন বলিস নি—কি লিখেছিস সে কথা কাউকে বলবি নি।

আঙ্গুলের ডগা দিয়ে চাড় দিয়ে জোপ সীলমোহরটি তুলে ফেলল—তারপর বাণ্ডিলটা খুলে এখান থেকে একটা ওখান থেকে একটা চিঠি নিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করল। লুসেটা যে কথাগুলো সযত্নে মাটিচাপা দিতে চাইছিল—সেই গোপন কথাগুলোই সব প্রকাশ হয়ে পড়ল—যদিও চিঠি পড়ে, সবকিছু জলের মত পরিষ্কার হচ্ছিল না, আভাস ইঙ্গিতে ধরা যাচ্ছিল মাত্র।

মিসেস ফারফ্রীর লেখা এই চিঠি! ন্যান্স মকারিজ বলল—না, না, আমাদের মেয়ে-জাতের মানসম্মানের প্রশ্নে এটা খুবই সাংঘাতিক—আমাদের মতই একজন কিনা অমন কথা লিখতে পারে—আবার বিয়ে করল গিয়ে অন্যলোককে!

রক্ষে পেয়েছে! বৃদ্ধা ফার্মিটি বুড়ী বলল—আমার জন্যেই সে বেঁচে গেছে। ঐ বিয়ে বন্ধ না হলে ও'র দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদত—অথচ আমাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলে না।

এমন সময়ে বাইরে থেকে খুব তীক্ষ্ণ একটা শিস দেওয়ার ধ্বনি ভেসে এল। মালিকানী চার্ল নামক লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল—মনে হচ্ছে, জিম আসছে। আমার হয়ে তুমি একবার যাও, সাঁকোটা পেতে দিয়ে এস।

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল চার্ল। একটা লণ্ঠন ধরে এগিয়ে গেল বাগান পেরিয়ে খালের দিকে। খালের ওপারেই খোলা মাঠ। মাঝে মাঝে শীতল হাওয়া এসে লাগছে চোখেমুখে। তক্তা প্রায় রেডী করাই ছিল একখানা। আবছা অন্ধকারের মধ্যে থেকে দেখা গেল—একজন সমর্থ পুরুষ, দুই হাঁটুতে বেশ জোর, বগলে দু'নলা বন্দুক, আর পিঠে ঝোলানো কয়েকটা শিকার-করা পাখী। সবাই মিলে জিজ্ঞেস করল তাকে—কি ব্যাপার?

না, এমন কিছু নয়—লোকটা উদাসীনভাবে বলল—তোমাদের খবর ভালো তো?

ভাল খবর শুনে সে এগিয়ে গেল—আর অন্যরা এল তার পেছনে সাঁকোটা তুলে নিয়ে। প্রায় সেই মুহূর্তেই পেছন দিকে একটা ডাক শোনা গেল—মাঠের দিক থেকে 'অ্যাহয়' বলে কে যেন থামতে বলছে।

আবার শোনা গেল ডাকটা। লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে তারা খালপারের দিকে এগিয়ে গেল আবার।

আচ্ছা, এটাই কি ক্যাস্টারব্রিজে ঢোকার রাস্তা? অপর দিক থেকে কে একজন প্রশ্ন করল।—না, না এটা রাস্তা হবে কেন—চার্ল বলল—তোমার সামনেই দেখ পগার।

হোক গে যাক, আমি এখান দিয়েই যাব—মাঠেরদিক থেকে লোকটা বলল —সারাদিন অনেক হেঁটেছি, আর পারছি নে।

দাঁড়াও তাহলে, সবুর কর—চার্ল দেখল লোকটা শত্রুপক্ষীয় কেউ নয়। জো! তক্তা আর লণ্ঠনটা নিয়ে আয়, এখানে একটা লোক পথ হারিয়ে ফেলেছে। তুমি বাপু বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে না কেন? খামখা মাঠের মধ্যে দিয়ে এদিকে এসে হাজির হয়েছ।

হুঁ, তাই যাওয়া উচিত ছিল দেখছি—আলোর রেখা দেখে ভাবলাম—এই বোধহয় শহরের কোলে এসে পড়েছি—তাই এগুলাম এদিকে।

তক্তাটা পেতে দেওয়া হল,আর অন্ধকারের ভেতর থেকে আগন্তুকের চেহারা ফুটে উঠল আস্তে আস্তে। মধ্যবয়স্ক একটা লোক—চুল দাড়ি যেন অকালে পেকে গেছে—মুখখানা বেশ বড় আর প্রসন্ন। লোকটা বিনা দ্বিধায় এগিয়ে এল তক্তা বেয়ে—যেন যাতায়াতের এমন ব্যবস্থায় অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নেই। ধন্যবাদ দিয়ে সে বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—এটা কি?

সরাইখানা।

ও! তাহলে বোধহয় একটা থাকার জায়গা পাওয়া গেল। যাক, ভাল হয়েছে! আমার জন্যে যখন কষ্ট করলে, এসো, আমার খরচায় একটু গলা ভিজিয়ে নাও।

লোকটার পেছন পেছন তারাও এসে ঢুকল। এখন আরও আলোর মধ্যে এসে পড়ায় দেখা গেল—কানে শোনার থেকে চোখের দৃষ্টিতে লোকটাকে বেশী ভদ্রস্থ বলে মনে হয়। পোষাক-পরিচ্ছদে অবস্থাপন্ন বলে ধারণা হলেও অগোছালো দেখাচ্ছে। গায়ের কোটটা দামী ফারের তৈরী—আর মাথায় শীলের চামড়ার টুপি। আজকাল রাত্রে ঠাণ্ডা পড়লেও, দিনের বেলা নিশ্চয়ই ঐ টুপি পরে গরম লাগে। শীতকাল প্রায় যাই-যাই করছে। লোকটার হাতে একটা ছোট্ট মেহগনি কাঠের বাক্স—কোণগুলো আবার পেতল দিয়ে মোড়া।

রসুইঘরের দরজা দিয়ে হঠাৎ এমন কিছু ব্যক্তি উঁকি দিয়ে গেল, যে আশ্চর্য হয়ে গেল লোকটা। আপাততঃ এখানে রাত কাটানোর বাসনা তক্ষুনি ত্যাগ করল কিন্তু হাল্কাভাবে নিল সে সব কিছু। সবথেকে ভাল পানীয়ের অর্ডার দিল। দাম মিটিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দরজার দিকে। দরজা বন্ধ। মালিকানী এগিয়ে গেল খুলে দেওয়ার জন্যে। এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে আলাপ—আলোচনা কানে এল—

কি বলছে ও'রা 'স্কিমিটি-রাইড' এর কথা? ব্যাপারটা কি?

ও কিছু না, কিছু না—বিনয়ে বিগলিত হয়ে, কানের লম্বা দুলদুটো দুলিয়ে উত্তর দিল মালিকানী—এখানকার লোকেরা একটা মজা করে যখন কারও বৌ মানে—আর কি অন্য নাগর ধরে তখন। কিন্তু আমি এখানে ওসব করতে দেব না।

তাই নাকি? এখনই হবে নাকি? বেশ মজার ব্যাপার তো!

হুঁ, মুচকি হাসল মালিকানী—তারপর স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় চোখের কোণ থেকে দৃষ্টি হেনে বলল, অমন মজা আর কিছুতে নেই—তবে খরচা করতে হবে দেখতে গেলে।

ওঃ হো, শুনেছি বটে। তা ক্যাস্টারব্রিজে যখন আছি দু-তিন সপ্তা, একবার দেখতে পেলে মন্দ হয় না। দাঁড়াও একটু—বলে সে পিছন ফিরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, তারপর বলল—এই যে ভদ্দরলোকরা! তোমাদের ঐ পুরনো মজাটা একবার দেখতে পেলে মন্দ হয় না—খরচা করতেও রাজী আছি আমি—এই নাও বলে সে একটা মোহর ছুঁড়ে দিল টেবিলের উপর। তারপর দরজার কাছে এসে মালিকানীকে জিজ্ঞেস করে শহরের রাস্তাঘাট জেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে।

মোহরটা তুলে নিয়ে যখন মালিকানীকে দেওয়া হল সযত্নে রেখে দেওয়ার জন্যে, চার্ল বলল লোকটার কাছে আরও ছিল—ও থাকতে থাকতে আরও কিছু ঝেঁপে দিলে ভাল হত।

না, না—বলল মালিকানী—এখানে ওসব চলবে না—আমার একটা মান-সম্মান আছে।

জোপ বলল—কিন্তু যেটা আরম্ভ করা গেছে, সেটা তো শেষ করা চাই।

ন্যান্স বলল—ঠিক, ঠিক। প্রাণ খুলে হাসতে পেলে আমার মদ গেলার থেকেও বেশী ভাল লাগে।

চিঠিপত্রগুলো গুছিয়ে নিল জোপ। রাত হয়ে গেছে বলে সেদিন আর ফারফ্রীর বাড়ীতে গেল না। বাসায় ফিরে, সে চিঠিগুলোকে আগের মত সীল করে রাখল। পরদিন সকালবেলা গিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিল বাণ্ডিলটা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লুসেটা সে সব পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল। হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল সে—যাক্ শেষ পর্যন্ত হেনচার্ডের সঙ্গে তার অতীতের স্মৃতি বলে কিছুই অবশিষ্ট রইল না। যতটা না স্বেচ্ছায়, বরং নিতান্ত অসুবিধায় পড়ে সে হেনচার্ডের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে, কিন্তু তাহলেও সে ঘটনা জানাজানি হলে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক যে চিড় খেতই, তাতে সন্দেহ নেই।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

'স্কিমিটি-রাইড' এর তোড়জোড় চলছে। এইরকম সময়ে একদিন ক্যাস্টারব্রিজের সাধারণ জীবনযাত্রায় নতুন এক তরঙ্গ উঠল। সমাজের নিচুস্তর থেকে শুরু করে সর্বত্রই তার ঢেউ গিয়ে লাগল। গাছের গুঁড়িতে যেমন প্রতিটি গ্রীষ্মকালের আগমনবার্তা চিরকালের জন্যে আঁকা হয়ে যায়—এটা তেমনই একটা ঘটনা—যা মফঃস্বল-শহরের সাদামাটা জীবনযাত্রা থেকে মুছে ফেলা যায় না।

রাজপরিবারের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চলেছিলেন আরও পশ্চিমে কোথায় একটা এঞ্জিনীয়ারিং প্রকল্পের উদ্বোধন করতে—যাওয়ার পথে তাঁর ক্যাস্টারব্রিজ হয়ে যাওয়ার কথা। আধঘণ্টার জন্যে তিনি ক্যাস্টারব্রিজে থাকতে রাজী হয়েছেন। সেই সময়েই তাঁকে কর্পোরেশনের তরফ থেকে একটি মানপত্র দেওয়া হবে, কৃষিকাজ এবং অর্থনীতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার প্রচেষ্টায় তাঁর অবদানের জন্যে।

সেই কোনকালে রাজাতৃতীয় জর্জের পরে রাজপরিবারের আর কেউ ক্যাস্টারব্রিজে আসেন নি। রাজা তৃতীয় জর্জকেও কয়েক মুহূর্তের জন্যে মোমবাতির আলোয় দেখা গিয়েছিল মাত্র—সেবার তিনি রাত্রিবেলা অন্য কোথাও যাওয়ার পথে এখানকার 'কিংস আর্মস' হোটেলে ঘোড়া বদল করেছিলেন। এবারে এমন অভাবনীয় সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্যে উঠেপড়ে লাগল এখানকার অধিবাসীরা। আধঘণ্টা সময়টা বেশি নয় ঠিকই, কিন্তু তাহলেও ঐটুকু সময়ে অনেক কিছু করা যেতে পারে যদি আবহাওয়া ভাল থাকে।

একজন শিল্পীকে দিয়ে সুন্দর আলঙ্কারিক হাতের লেখায় মানপত্রটি লেখানো হল। তার ওপর সোনার কাজ করিয়ে জিনিসটি বেশ সুন্দরই হল। সবকিছু পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে আগের মঙ্গলবারদিন কাউন্সিলের সভা বসল। সভা যখন চলছে, খোলা দরজাপথে শোনা গেল, সিঁড়ি বেয়ে কে একজন দৃঢ় পদক্ষেপে উঠে আসছে। একটু পরেই হেনচার্ড এসে ঢুকল ভিতরে। পরণের পোষাক মলিন। ঠিক এই পোষাকেই সে আগেকার দিনে এই সব ভদ্রলোকদের সঙ্গে আসনগ্রহণ করত।

একটা কথা ভেবেছি আমি—টেবিলের দিকে এগিয়ে, সবুজ কাপড়ের ওপর হাত রেখে বলল হেনচার্ড—আমিও তোমাদের সঙ্গে এই মহামান্য অতিথির অভ্যর্থনায়

যোগ দিতে চাই। অন্য সবার সঙ্গে আমিও হাঁটতে হাঁটতে গেলে তো ক্ষতি নেই।

সভাস্থ সকলে পরস্পরের মুখচাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। যতক্ষণ সবাই চুপ করেছিল, ততক্ষণে গ্রোয়ার তার ফাগের কলমের পেছনটা এমন চিবুতে আরম্ভ করল যে কিছুটা খেয়েই ফেলেছিল প্রায়। তরুণ মেয়র ফারফ্রী বসেছিল মধ্যিখানের বিশাল চেয়ারটাতে। সভার মনোভাব আঁচ করতে পেরে, মুখপাত্র হয়ে তাকেই বলতে হল কথাগুলো—অন্য কেউ এ দায়িত্বটুকু পালন করলে খুশী হত সে সবচেয়ে বেশী।

সেটা বোধহয় ঠিক হবে না মিঃ হেনচার্ড! আপনি এখন আর কাউন্সিলের মেম্বার নন। আর সবার মধ্যে আপনার যাওয়াটা অশোভন দেখায়। আপনি যদি আসেন, তো অন্যরাই বা আসবে না কেন?

কারণ এই অভ্যর্থনায় আমি বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

ফারফ্রী সবার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল—আমি বোধহয় সভার মনোভাবই ব্যক্ত করেছি।

হাঁ, হ্যাঁ। ডাক্তার বাথ, উকিল লং, অল্ডারম্যান টাবার এবং আরও বেশ কয়েকজন সায় দিল।

তাহলে এই অনুষ্ঠানে আমার কিছু করার নেই?

কোনো উপায় দেখছি না। আপনি অবশ্যি অন্য দর্শকদের সাথে, পুরো ব্যাপারটা দেখতে পাবেন—কি হয় না হয়।

এই পরামর্শে হেনচার্ড কান দিল না। সরাসরি পিছন ফিরে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

হেনচার্ডের মনে ব্যাপারটা প্রথমে শখের মত উদয় হয়েছিল, কিন্তু তার বিরোধীরা এত গুরুত্ব আরোপ করায় সেও যেন রুখে দাঁড়াল—হয় আমিই তাকে সম্বর্ধনা জানাব নইলে আর কেউ জানাবে না—বলতে বলতে চলে গেল সে—শুধু ফারফ্রী কেন কোনো মাতব্বরই আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

সেই বিশেষ দিনটাতে প্রভাত হল আলোয় আলোময়। ডগমগ করে সূর্য উঠল। আবহাওয়া সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা বুঝল, সারা দিনটাই এমনি যাবে। দূরদূরান্ত থেকে, নির্জন সব পাহাড়ী গাঁ বেয়ে দর্শককুল আসতে আরম্ভ করল। অভ্যর্থনা দেখার ইচ্ছা সকলেরই। দেখতে পাক না পাক অন্ততঃ কাছাকাছি তো যাওয়া যাবে। প্রতিটা লোকই সেদিন পরিষ্কার জামা গায়ে দিয়েছে। সলোমন লংওয়েজ, ক্রিষ্টোফার কোনী, বাজফোর্ড এবং তাদের বন্ধুবান্ধব সকলেই দিনটার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। তাই অন্যদিনের বেলা এগারটার অভ্যস্ত পানক্রিয়া সেদিন সাড়ে-

দশটায় সারা হয়ে গেল—তারপরেও বেশ কয়েকদিন পুরনো সময়ে ফিরে যেতে অসুবিধা হয়েছিল তাদের।

হেনচার্ড ঠিক করেছিল সেদিন কোনো কাজে হাত দেবে না। সকাল বেলা এক গ্লাস 'রাম্' পান করে দিন শুরু করল সে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখা হয়ে গেল এলিজাবেথের সঙ্গে। প্রায় সপ্তাহখানেক পরে দেখা। হেনচার্ড বলল—আজকের এই দিনটা আসার আগে ভাগ্যিস একুশটা বছর পুরে গেছে—নইলে আজ কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না—

এলিজাবেথ ভয় পেয়ে বলল—কি সম্ভব হ'ত না?

এই যে আজকের এই সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যাপারটা।

এলিজাবেথ একটু হতবাক হয়ে গেল, বলল—আমরা একসঙ্গেই দেখতে যাব তো বাবা?

দেখতে যাব? আমার অন্য কাজ আছে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ। দেখার মতই ব্যাপার হবে।

এলিজাবেথের সাধ্য ছিল না, এর থেকে বেশী কিছু জানার চেষ্টা করে। তাই বিষণ্নচিত্তে সরে গেল সেখান থেকে। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট সময় এগিয়ে এলে, সে বাবাকে দেখতে পেল আবার। এলিজাবেথ ভেবেছিল হেনচার্ড বোধহয় 'থ্রি মেরিনার্স'-এর দিকে এগিয়ে যাবে, তা না করে দু'পাশের ভিড় সরিয়ে হেনচার্ড উলফ্রীর দর্জির দোকানে গিয়ে ঢুকল। এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে রইল ভিড়ের ভেতর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হেনচার্ড বেরিয়ে এল। এলিজাবেথ আশ্চর্য হয়ে দেখল—তার পরণে উৎসবের পোষাক। তার থেকেও অবাক হওয়ার কথা, হেনচার্ড একটা হাতে, এক সেলাই করা পতাকা তুলে ধরেছে—ছোট্ট একখানা ইউনিয়ন-জ্যাক-দণ্ডটা হেনচার্ডের বগলে, সে রাস্তা বেয়ে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে যারা মাথায় লম্বা, তারা নড়াচড়া করে উঠল, আর যারা বেঁটে, তারা ডিঙি মেরে মাথা উঁচু করার চেষ্টা করল। সবাই বলাবলি করছিল—রাজপুরুষের গাড়ী এসে পড়েছে। রেলপথ ক্যাস্টারব্রিজের প্রায় কাছ ঘেঁষে গেলেও, এতদূর এসে পারে নি। পুরনো দিনের মত এটুকু পথ সড়ক বেয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে। বড়লোকদের পরিবার বাড়ীর মধ্যে বসে—আর সাধারণ লোক সব সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যতদূরে সম্ভব দৃষ্টি তাদের প্রসারিত। মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি আর অগুণতি মানুষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

এলিজাবেথ পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিল এসব। মেয়েদের জন্যে কিছু বসার

আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবার সামনের আসনে এই মুহূর্তে বসে আছে মেয়রের স্ত্রী লুসেটা। ঠিক তার চোখের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হেনচার্ড। লুসেটাকে খুব উজ্জ্বল আর সুন্দর দেখাচ্ছে। হেনচার্ডের মনে মনে একেকবার ক্ষীণ আশার হাতছানি দেখা দিচ্ছিল. লুসেটা তার দিকে তাকিয়ে দেখুক। কিন্তু কোনও নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত শক্তি তার নেই—কারণ নারীরা বাইরেটাই দেখে, ভিতরে তাদের দৃষ্টি পৌছায় না। মেয়র থেকে শুরু করে ধোপানী অব্দি সকলেই নতুন জামা কাপড় পরেছে—কিন্তু হেনচার্ড একগুঁয়ের মত পরে আছে বিগত দিনের বহু শীত গ্রীষ্মের সাক্ষী সেই পুরনো পোষাক।

অতএব ঘটনা এমন ঘটে গেল—লুসেটার দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়লেও, হেনচার্ডকে দেখে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। উৎসবের সাজে সজ্জিত কোন মেয়েই অমন পুরুষের দিকে তাকাতে পারে না। লুসেটার হাবভাবে মনে হল. লোকজনের সামনে হেনচার্ডকে আদৌ আমল দিতে চায় না সে।

কিন্তু ডোনাল্ডকে দেখে কিছুতেই যেন আশা মিটছে না—মাত্র কয়েকগজ দূরেই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দৃপ্তভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে সে। কথা বলার সময়ে তার স্বামীর যে কোনো তুচ্ছ আবেগ বা অনুভূতির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছিল লুসেটার মুখে এবং ঠোঁটে, ঠিক পুনরাবৃত্তির মত। লুসেটার নিজের যেন কোনও অস্তিত্ব নেই—স্বামীর জন্যেই তার বেঁচে থাকা। ফারফ্রী ছাড়া আর কারও প্রতি দৃষ্টি দেবার মত আগ্রহ তার নেই।

অবশেষে একেবারে রাস্তার মুড়োয় দ্বিতীয় ব্রিজটার শেষে দাঁড়ানো একটা লোকের নিশানা দেখা গেল। কর্তাব্যক্তিরা টাউনহলের সামনে থেকে শহরের প্রবেশমুখে তোরণদ্বারের দিকে এগিয়ে চলল। ধূলোর মেঘের মধ্য থেকে দেখা গেল রাজপুরুষের গাড়ীটি আসছে—তারপর সবাই মিলে মিছিল করে ধীর পদে হাঁটতে হাঁটতে টাউন হলের সামনে এল।

এখানটাতেই সবার দৃষ্টি এসে পড়েছে। রাজপুরুষের গাড়ীর সামনেই কয়েক-গজের মত ফাঁকা জায়গা। ঠিক ঐ স্থানটিতে অন্য কেউ বাধা দেওয়ার আগেই ঢুকে পড়ল একটা লোক। সে হেনচার্ড। তার নিজস্ব পতাকাটা মেলে দিল সে—তারপর ধীরগতিতে অগ্রসরমান সেই শকটের পাশে পাশে, বাঁহাতে পতাকা ওড়াতে ওড়াতে, ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিল সেই মহামান্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে।

মেয়েরা সবাই চাপাস্বরে বলে উঠল—এই মরেছে! দেখ দেখ! দেখে লুসেটা প্রায় মূর্চ্ছা যাচ্ছিল। সামনের কয়েকজনের মধ্য থেকে উঁকি দিয়ে এলিজাবেথ দেখল, কি ঘটছে। দেখে আতঙ্কিত হল সে। তারপরেই কাণ্ডটা

দেখে এমন অবাক হয়ে গেল যে ভয়-টয় সব উবে গেল।

মেয়রের মত ভঙ্গিতেই হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠেছে ফারফ্রী।

হেনচার্ডের কাঁধ ঠেলে ধরল সে। পেছন দিকে ঠেলে দিয়েই, কটুভাষায় তাকে সরে যেতে বলল। হেনচার্ডের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হল তার—ফারফ্রী নিজের উত্তেজনা এবং বিরক্তি সত্ত্বেও দেখতে পেল, হেনচার্ডের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে হেনচার্ড দাঁড়িয়ে রইল শক্ত হয়ে—তারপর হঠাৎ কি ভেবে সরে গেল সেখান থেকে। ফারফ্রী মহিলাদের আসনের দিকে তাকিয়ে দেখল—লুসেটার চোখমুখ বিবর্ণ।

আরে! ও তো তোমার কর্তার পুরনো মনিব। লুসেটার পাশ থেকে মিসেস ব্লোবডি নামে এক মহিলা বলে উঠল।

ডোনাল্ডের স্ত্রী উপেক্ষামিশ্রিত স্বরে উত্তর দিল —মনিব!

মিঃ ফারফ্রী কি লোকটাকে চেনেন না কি? ডাক্তারের বৌ, মিসেস বাথ জিজ্ঞেস করল। নতুন বিয়ে হয়ে এই শহরে এসেছে সে, তাই সবাইকে চেনে না।

হ্যাঁ, ও আমার স্বামীর খামারে কাজকর্ম করে। বলল লুসেটা।

ও! তাই নাকি? কত কথা যে লোকে বানাতে পারে! আমি শুনেছি, ঐ লোকটির সাহায্যেই নাকি তোমার স্বামী ক্যাস্টারব্রিজে প্রথম কাজকর্ম শুরু করেছিল।

লোকে কি না বলে!—মোটেই তা নয়। ডোনাল্ড তার নিজের বুদ্ধিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত যে কোনো জায়গায়। কারও সাহায্যের দরকারই হয় না ওর! হেনচার্ড না থাকলেও ওর কিছু আসত যেত না।

ডোনাল্ড যখন এই শহরে প্রথম আসে, তখনকার ঘটনা লুসেটা বিশেষ জানত না। সেজন্যও বটে, তাছাড়া অন্য মেয়েদের মুখ বন্ধ করার প্রয়োজনে লুসেটা এইরকম একটা উত্তর দিল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এইসব ঘটে গেলেও, রাজপুরুষের দৃষ্টি এড়াল না কিছুই। কিন্তু বুদ্ধিমানের মত তিনি এমন ভান করলেন যে অস্বাভাবিক কিছুই তাঁর চোখে পড়ে নি। তিনি অবতরন করলে মেয়র এগিয়ে এসে মানপত্রটি পাঠ করলেন—রাজপুরুষ তার প্রত্যুত্তর দিয়ে, ফারফ্রীকে দু'একটি কথা বললেন। মেয়রের স্ত্রী বলে লুসেটার সঙ্গে করমর্দন করলেন। মাত্র কিছুক্ষণের অনুষ্ঠান—তারপরেই মিশর সম্রাটের রথবাহিনীর মত গাড়ীগুলো সব এগিয়ে চলল বাডমাউথ রোড দিয়ে আরও পশ্চিমের দিকে।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল কোনী, বাজফোর্ড আর লংওয়েজ। কোনী বলল —এখনকার এই মেয়রের সঙ্গে সেই যে গান গেয়েছিল—সে লোকের কত তফাৎ!

এত অল্প সময়ে কি করে যে অমন একটি বৌ বাগিয়েছে, কে বলতে পারে !'

তা বটে ! ভাল কাপড় জামা পরলেই ভদ্রলোক হওয়া যায়। কিন্তু এখন আর ঐ মহিলার দিকে কেউ তাকাবে না—তার নামের সঙ্গে যে হেনচার্ডের নাম জড়িয়ে গেছে।

ঠিক বলেছ বাজফোর্ড—ন্যান্স মকারিজ উত্তর দিল—আমিও তাই মনে করি ওর ফর্সা জামাকাপড় খুলে দাও দেখবে কি বেরিয়ে পড়ে ! আমার ইচ্ছে করে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিই। খুব তাৎপর্যপূর্ণ স্বরে বলল সে।

ন্যান্স কি বলতে চাইছিল, সেকথা সবাই বুঝতে পারল। 'পিটার্স ফিঙ্গারে' সেদিন লুসেটার চিঠিপত্র জানাজানি হয়ে যাবার পর খুব দ্রুত একটা কেলেঙ্কারীর কথা ছড়িয়ে পড়ছিল সবার মুখে মুখে বিশেষতঃ মিক্সেন লেনে যাদের যাতায়াত আছে তাদের মুখ থেকে ক্যাস্টারব্রিজের রাস্তাঘাটে সর্বত্র।

একটু পরেই এই অলস লোকগুলো দুদলে ভাগ হয়ে গেল। কেউ কেউ চলে গেল মিক্সেন লেন-এর দিকে,আর কোনী বাজফোর্ড লংওয়েজরা রয়ে গেল সেখানেই।

বাজফোর্ড জিজ্ঞেস করল অন্যদের—কি ঘটতে যাচ্ছে জান ?

কোনী তার দিকে তাকিয়ে বলল—'স্কিমিটি-রাইড' নাকি ?

বাজফোর্ড মাথা নাড়ল।

দিন পনের ধরেই নাকি এ সবের তোড়জোড় চলছে ?

অমি যদি জানতাম আগে থেকে—লংওয়েজ জোর গলায় বলল—তো নিশ্চয় জানিয়ে দিতাম ওঁকে। এটা খুব বাজে ব্যাপার। মারদাঙ্গা শুরু হয়ে যেতে পারে। সবাই জানে স্কচম্যান ভদ্রলোক একজন সম্মানিত ব্যক্তি—তার স্ত্রীও অন্ততঃ যতদিন এখানে এসেছে—ততদিন থেকে মান সম্মান পাচ্ছে। তার আগে কি হয়েছে না হয়েছে, সে তাদের ব্যাপার—আমাদের তাতে কি ?

কোনী চিন্তা করতে লাগল। ফারফ্রীকে এখনও সবাই পছন্দ করে। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, মেয়র এবং ধনী ব্যক্তি হওয়ার পর থেকে সে তাদের মন থেকে সরে গেছে অনেকটা। সেই যখন নিঃস্ব অবস্থায় হাস্কামনে এদের সে গান গেয়ে শুনিয়েছিল—তখনকার থেকে এখন অনেক তফাৎ। কাজেই আগেকার দিনের থেকে তার এখানকার মানসম্মান রক্ষার প্রশ্নটা এদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিল না।

আচ্ছা ক্রিস্টোফার ! ব্যাপারটা খোঁজ নিলে কি হয় ? লংওয়েজ বলতে লাগল—যদি সত্যিই দেখি তেমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তো একটা চিঠি লিখে ওদের সাবধান করে দেব—যাতে ওরা এড়িয়ে যেতে পারে।

এটাই ঠিক হল। তারপর যে যার মত চলে গেল। বাজফোর্ড কোনীকে বলল—চল বন্ধু! এখানে আর দেখার কিছু নেই।

এই মঙ্গলাকাঙ্খী বান্ধবেরা যদি জানত যে মজার ঘটনাটা কতখানি কি ঘটতে যাচ্ছে—এবং কিভাবে এগিয়েছে, তাহলে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেত তারা। জোপ সেদিনই 'পিটার্স ফিঙ্গারে' সমাবেশে ঘোষণা করল—আজ রাতেই ঘটনাটি ঘটবে। আজকে রাজদর্শনও হল—আবার মজার ব্যাপারটিও হবে—দিনটা কাটল ভাল। জোপের কাছে অন্ততঃ ব্যাপারটা নিছক মজা না হয়ে, ছিল একটা প্রত্যুত্তর।

॥ আটত্রিশ ॥

সেদিনকার অনুষ্ঠান যেন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। অন্ততঃ লুসেটার তাই ছাড়া কিছু মনে হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা গভীর আত্মতৃপ্তি ঘিরে ছিল তাকে। রাজপুরুষের হাতের ছোঁয়াটুকু তখনও তার আঙুলে লেগে আছে। কানাঘুষোয় সে এ'ও শুনেছিল, যে হয়তো তার স্বামীকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হবে। বিষয়টা খানিকটা দূর-কল্পনা হলেও তার স্বামীর মত সজ্জন এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়।

মেয়রের কাছে ধাক্কা খাওয়ার পর হেনচার্ড মেয়েদের আসনের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়েই সে ভাবছিল আর আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল। তার কোটের যে জায়গাটাতে ফারফ্রীর হাত লেগেছে, নিজের হাত একবার সেখানে লাগিয়ে দেখল, যেন সে ভাবতেই পারছিল না—তার উদার আচরণের তুলনায় ফারফ্রীর এ কী দুর্ব্যবহার! এইরকম অর্ধপ্রস্তরীভূত হয়ে থাকতে থাকতে, অন্য মেয়েদের সঙ্গে লুসেটার কথাবার্তা তার কানে গেল। পরিষ্কার শোনা গেল, লুসেটা তাকে একটা জনমজুরের বেশী স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়।

বাসার দিকে এগুল হেনচার্ড। পথেই 'বুল-স্টেকের' কাছে দেখা হয়ে গেল জোপের সাথে। জোপ বলল—তা'লে ঠেলা খেলেন একখানা।

খেয়েছি তাতে কি হয়েছে? কড়াস্বরে উত্তর দিল হেনচার্ড।

না, আমিও একটা খেয়েছি কিনা! এখন আমাদের দুজনের একই গতি। ছোট্ট করে সে লুসেটার সেদিনকার আচরণ বর্ণনা করল।

হেনচার্ড ঘটনাটা শুনল বটে; বিশেষ একটা কান দিলনা। ফারফ্রী এবং

লুসেটার সঙ্গে তার নিজের বর্তমান সম্পর্কই তার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। নিজের মনেই ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বলছিল—এমন একদিন ছিল, যখন সে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল আমার কাছে—আর এখন কিনা চিনতে পারছে না। একবার তাকিয়েও দেখল না!..... আর ফারফ্রী, কি তার মেজাজ! গরুছাগলের মত তাড়িয়ে দিল আমাকে।........চুপচাপ মেনে নিলাম—ঐ পরিস্থিতিতে কিছু করতে পারলাম না।...........কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে এ্যাঁ—ঠিক আছে—এ'র দাম দিতে হবে—আর লুসেটারও শোধ তুলে তবে ছাড়ব—সামনাসামনি ফয়সালা করে নেব একবারে।

আর কিছু না চিন্তা করে হেনচার্ড যেন কি এক উদ্দেশ্য স্থির করে ফেলল। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ফারফ্রীর খোঁজে। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যথেষ্ট আঘাত পেয়েছে সে। জনমজুরের ব্যবহার পেয়েছে। সবথেকে বেশী অবমাননা বুঝি আজকের দিনের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। শহরসুদ্ধু লোকের সামনে একটা ভবঘুরের মত তার কলার ধরে বার করে দিল ফারফ্রী।

লোকজনের জমায়েৎ ভেঙে গেছে। ইতঃস্তত কিছু সবুজ তোরণ ছাড়া ক্যাস্টারব্রিজের জীবনযাত্রা স্বাভাবিকতায় ফিরে এসেছে। কর্ণষ্ট্রীট বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে হেনচার্ড ফারফ্রীর বাড়ীতে এসে হাজির হল। দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে খবর পাঠাল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফারফ্রী যেন তার সঙ্গে গোলাঘরে দেখা করে। খবরটা দিয়েই সে পেছন দিক দিয়ে ঘুরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল।

কেউ কোথাও নেই। সকালবেলার সেই অনুষ্ঠানের জন্যে সব গাড়োয়ান আর মজুররাই আজকে হাফ-ছুটি উপভোগ করছে। সহিসরা অবশ্যি একটু পরেই এসে পড়বে হয়তো, ঘোড়াগুলোকে খাবার দেওয়ার জন্যে। গোলাঘরের সিঁড়িতে পা দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিল হেনচার্ড। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে আপন মনেই জোরে জোরে বলল—ও'র থেকে আমার গায়ে জোর বেশী।

নেমে এসে হেনচার্ড একটা দেওয়ালের কাছে দাঁড়াল। অনেকগুলো ছোট ছোট দড়ি পড়েছিল সেখানে। একটা তুলে নিয়ে সে দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে ফেলল একটা পেরেকের সাথে। অন্যপ্রান্তটা ডানহাতে ধরে সে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিল একপাক। অন্যহাতটা তার গায়ের সঙ্গে একেবারে লাগানো। এই কৌশলে সে বাঁ হাতটা বেঁধে ফেলল। এইবার মই বেয়ে উঠে গেল গোলাঘরের ওপরতলায়।

জায়গাটা প্রায় খালি। গোটা দুই চার বস্তা মাত্র ছিল সেখানে। বিপরীত দিকে সেই দরজাটা, যেখান দিয়ে নিচের থেকে বস্তা তোলবার জন্যে শিকলটা নেমে গেছে। দরজাটা খুলে দিয়ে সে মুখ বাড়িয়ে দেখল নিচে। মাটির থেকে প্রায়

তিরিশ-চল্লিশ ফুট ওপরে—এখানটাতেই সে আর ফারফ্রী দাঁড়িয়েছিল সেদিন—যখন এলিজাবেথ তাকে হাত উঁচু করতে দেখে ভয় পেয়েছিল খুব—অজানা কি এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল তার হৃদয়।

দু-চার পা পিছিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল হেনচার্ড। এই উঁচু স্থান থেকে সে সমস্ত ছাদটা দেখতে পাচ্ছে। চেষ্টনাট গাছের ঘন সবুজ ডগাগুলো দেখা যাচ্ছে। লেবুগাছের ডালগুলো নুয়ে পড়েছে ভারে। আর একটু দূরেই ফারফ্রীর বাগান। তার ওদিকে ফটক। কিছুক্ষণ পরেই, কতক্ষণ ঠিক খেয়াল নেই—ফটক ঠেলে ফারফ্রী ভেতরে ঢুকলো। কোথাও বেরুচ্ছিল বলে মনে হয়। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয় যখন সে দেওয়ালের কোল ঘেঁষে এগিয়ে আসছিল—তার জামাকাপড়ে যেন অগ্নিশিখার রং লেগেছে। দাঁতে দাঁত চেপে হেনচার্ড দেখতে লাগল তাকে—চোয়াল তার চৌকো এবং শক্ত হয়ে উঠেছে।

ফারফ্রীর একখানা হাত পকেটে ঢোকানো। একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে আসছে সে—শুনে মনে হচ্ছে, কথাগুলো আছে তার মনে মনে। গানটা বহুদিন আগে, আপন ভাগ্যের সন্ধানে 'থ্রী মেরিনার্সে' হাজির হয়ে যে গান সে শুনিয়েছিল সেইটাই—

'হাতখানি এই বাড়িয়ে নিয়ে, দিলাম তোমার হাতে'—

হেনচার্ড সবথেকে বেশী মুগ্ধ হ'ত পুরাতন সংগীত শুনে। একটু পিছিয়ে গিয়ে শ্বাস টেনে সে বলল—নাঃ পারব না—বদমাইসটা যে গান ধরেছে এখন।

অবশেষে ফারফ্রী গান থামালে ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে হেনচার্ড বলল—একবার আসবে এখানে?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই—বলল ফারফ্রী—দেখতেই পাইনি, কি ব্যাপার কি?

মিনিটখানেক পরেই হেনচার্ড মইয়ের নিচের ধাপে শুনতে পেল ফারফ্রীর পায়ের শব্দ। আস্তে আস্তে সে দোতলা, তিনতলা পেরিয়ে—একেবারে ওপরে উঠে এল। এতক্ষণে তার মাথা দেখা যাচ্ছে।

এইসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে কেন? এগিয়ে এসে বলল ফারফ্রী—অন্যরা সবাই তো হাফ ছুটি নিয়েছে। কণ্ঠস্বরে তার দৃঢ়তার সুর। শুনে মনে হয় সকালবেলার অশোভন ব্যাপারটা সে ভোলে নি। এবং এটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস যে হেনচার্ড সেখানে বসে মদ খাচ্ছে।

কিছু না বলে হেনচার্ড সিঁড়ির দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। পেছন ফিরে সে যখন ফারফ্রীর দিকে এগিয়ে এল, ফারফ্রী দেখল হেনচার্ডের একটা হাত শরীরের সঙ্গে বাঁধা।

ধীর অকম্পিতস্বরে বলল হেনচার্ড—দেখ, এই মুহূর্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা দুটি পুরুষমানুষ। দুজনেই সমান। তোমার ধনসম্পত্তি আর সুন্দরী স্ত্রী যতই তোমার গর্বের বিষয় হোক—এই মুহূর্তে তা কিছুই নয়। তেমনি আমার দারিদ্র্যের জন্যে আমি একটুও লজ্জিত নই।

এসব কথার মানে? সহজভাবে বলল ফারফ্রী।

সবুর করো, বুঝবে। কিছুই যার হারাবার ভয় নেই, তার সঙ্গে লাগার আগে দ্বিতীয়বার ভাবা উচিত ছিল তোমার। অনেক সহ্য করেছি তোমাকে, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পথে বসেছি, তোমার তিরস্কারে ছোট হয়েছি—কিন্তু তোমার গলাধাক্কায় আমার অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে, আর আমি সইব না।

ফারফ্রী কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হল এ কথা শুনে, বলল—আপনার তো কিছুই করণীয় ছিল না ওখানে।

তোমাদেরই বা কি কম্মোটা ছিল হে ছোকরা!—আমার মত প্রবীন লোককে বলে কিনা কিছুই করণীয় ছিল না। কথা বলতে বলতে তার কপালের রগ ফুলে উঠতে লাগল।

আপনি রাজাকে অপমান করতে যাচ্ছিলেন মিঃ হেনচার্ড! অতএব আপনাকে নিরস্ত করাটা আমি কর্তব্য বলেই মনে করেছি।

রাখ তো রাজার কথা! বলল হেনচার্ড—তুমি যেমন বিশ্বস্ত প্রজা, আমিও তাই।

আমি এখানে তর্ক করতে আসি নি। আপনি মেজাজ ঠাণ্ডা করুন। ঠাণ্ডা হলে বুঝবেন, আমার সঙ্গে আপনার মতভেদ নেই।

তুমি আগে ঠাণ্ডা হও—গম্ভীরভাবে বলল হেনচার্ড—ব্যাপার এ'টাই। সকালবেলা আজ যে লড়াই শুরু করেছ, এখন এই চারচৌকো ছাদে এসো তার ফয়সলা হয়ে যাক। ঐ যে দরজা—মাটি থেকে ঠিক চল্লিশ ফুট ওপরে—আমাদের দুজনের মধ্যে একজন থাকবে এখানে—অপরকে বিদায় নিতে হবে ঐ দরজা দিয়ে চিরকালের মত। যে থাকবে সে নীচে গিয়ে সত্যি কথাও বলতে পারে অথবা বলতে পারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অপরের—সেটা তার ব্যাপার। আমি বেশী শক্তিশালী বলে সুযোগ নিতে চাই না—তাই একটা হাত এই বেঁধে রেখেছি। বুঝেছ? তাহলে এসো।

ফারফ্রী অন্য কিছু ভাববার অবকাশ পেল না, কারণ হেনচার্ড তৎক্ষণে এগিয়ে এসেছে। কুস্তির লড়াইয়ে শত্রুকে চিৎ করে ফেলাটাই উদ্দেশ্য। হেনচার্ড নিঃসন্দেহে এটাই চাইছিল যে দরজা দিয়ে উল্টে ফেলে দেবে অপরপক্ষকে।

হেনচার্ডের ডানহাতটাই মাত্র মুক্ত। শুরুতেই সেই হাত দিয়ে সে ফারফ্রীর

বাঁদিকের কলার চেপে ধরল শক্ত করে আর ফারফ্রী হেনচার্ডের ডানদিককার কলার চেপে ধরল বাঁহাত দিয়ে। ডানহাতে সে হেনচার্ডের অপর হাতটা ধরতে যতই চেষ্টা করুক, পারছিল না কিছুতেই। হেনচার্ড কিন্তু অন্য হাতটা নিশ্চিন্তে পেছনে রেখে তার এই সুদর্শন শত্রুর দিকে তাকিয়েছিল দৃষ্টি নত করে।

হেনচার্ডের একটা পা শক্ত করে আগে বাড়ানো। আর ফারফ্রীর অপর পা ঠিক একইভাবে প্রোথিত। মুখে কারও কথা নেই। কয়েক মিনিট তাদের কেটে গেল এইভাবে সাধারণ কুস্তির লড়াইয়ের মত। বৃহৎ বৃক্ষের মত যেন দুজনেই ঝড়ের তাড়নায় দুলছে। এতক্ষণে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ফারফ্রী একবার হেনচার্ডের অন্য কলার ধরার চেষ্টা করল—কিন্তু হেনচার্ডের গায়ে জোর অনেক বেশী—শরীরটাকে এমন একটা পাক দিয়ে আনল সে, যে তার পেশীবহুল হাতের চাপে ফারফ্রী হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সর্বশক্তি দিয়ে ফারফ্রী উঠে দাঁড়াল সেবারের মত—আবার চলতে লাগল লড়াই।

এমন এক ঘূর্ণি দিয়ে হেনচার্ড ডোনাল্ডকে কাবু করে ফেলল যে ডোনাল্ড প্রায় একবার ডিগবাজী খেয়ে উঠল। হেনচার্ডের অন্য হাতটা খোলা থাকলে হয়তো এখানেই লড়াইয়ের অবসান হোত—কিন্তু ফারফ্রী আবার শক্তি সঞ্চার করে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে হেনচার্ডের হাতটা মুচড়ে ধরল জোরে। হেনচার্ডের মুখ কোঁচকানো দেখে মনে হল ব্যথা পেয়েছে। তখনই সে পাছা দিয়ে ফারফ্রীকে এমন এক ঠেলা দিল, ছিটকে গিয়ে পড়ল সে দরজার মুখে। কিন্তু তখনও সে হেনচার্ডের হাতের মুঠোয়—হাতদুখানা ঝুলছে আর মাথাটা পুরোপুরি হেনচার্ডের নিয়ন্ত্রণে।

শ্বাস নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে হেনচার্ড বলল—এইবার—সকালে যা শুরু হয়েছিল এখানেই তার শেষ। তোমার জীবন আমার হাতে।

—বেশ তো, শেষ হয়েই যাক—বলল ফারফ্রী—অনেকদিন থেকে এটাই তো আপনার কাম্য।

নীরবে হেনচার্ড তাকাল তার দিকে নিচু হয়ে। চোখে চোখে মিলে গেল তাদের। না ফারফ্রী, একথা ঠিক নয়—তিক্তকণ্ঠে বলল হেনচার্ড—তোমাকে এক সময়ে যা ভালবেসেছি, মানুষে তার থেকে বেশী ভালবাসতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর জানেন সে কথা। আর এখন.......তোমাকে মেরে ফেলব বলেই এসেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমি পারব না। যাও, ছেড়ে দিলাম—যা খুশী অভিযোগ তুমি করতে পার আমার বিরুদ্ধে—কিছুই পরোয়া করি না।

হাতের মুঠি আলগা করে হেনচার্ড পেছনে সরে গেল। কোনের বস্তাগুলোর ওপরে গিয়ে বসে পড়ল ধপ করে। কিছুক্ষণ নীরবে দেখল ফারফ্রী, তারপর সিঁড়ির

দরজার খিল খুলে নেমে গেল। হেনচার্ডের ইচ্ছা হচ্ছিল একবার ডাক দেয় ওকে, কিন্তু জিভ তার আড়ষ্ট হয়ে রইল —ততক্ষণে সে যুবকের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেছে নিচে।

আত্মগ্লানি আর লজ্জায় হেনচার্ড সঙ্কুচিত হল। ফারফ্রীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের দিনগুলো মনে পড়ে গেল। রোমান্স এবং সংযমের এমনই আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ ঘটেছিল যুবকটির চরিত্রে, যে ফারফ্রী ইচ্ছা করলে হেনচার্ডকে যন্ত্রের মত ব্যবহার করতে পারত। এমনই আবিষ্ট হয়ে বসেছিল হেনচার্ড বস্তাগুলোর ওপরে, যে তার মত মানুষের অমন দুর্বলতা আদৌ শোভা পায় না। বজ্রের মত কঠোর যার প্রকৃতি, অমন মেয়েলিপনা তাকে .মানায় না। নিচে একটা কথাবার্তা শুনতে পেল হেনচার্ড, তারপরই যেন আস্তাবল থেকে গাড়ী আর ঘোড়া বেরোনোর আওয়াজ হল, কিন্তু হেনচার্ড কানে নিল না সেসব।

অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসা পর্যন্ত সে এখানেই বসে থাকল। তারপর উঠে জামাকাপড়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলল। হাৎড়ে হাৎড়ে সিঁড়ির দরজা খুলে কোনরকমে নেমে এল নিচের উঠোনে।

—একসময়ে আমার সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা ছিল ও'র—বিড়বিড় করে বলল হেনচার্ড—এখন আমাকে চিরকালের মত ঘৃণা আর অবজ্ঞা করবে।

সেই রাত্রেই আর একবার ফারফ্রীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল হেনচার্ডের। যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন, সে ফারফ্রীর সঙ্গে দেখা করে আজকের উন্মাদ আচরণের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিতে চায়। ফারফ্রীর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ল, গাড়ী আর ঘোড়া বাইরে বেরুনোর আওয়াজ শোনা গিয়েছিল যেন। ফারফ্রী যখন আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করে গাড়ী নিয়ে বেরুচ্ছিল, হুইট্‌ল্‌ তাকে একটা চিঠি এনে দিয়েছিল, হেনচার্ডের মনে পড়ল, ফারফ্রী বলেছিল—তার বাড-মাউথের দিকে যাওয়ার কথা—কিন্তু হঠাৎ যখন ওয়েদারবেরী যেতে হচ্ছে একেবারে মেলষ্টক ঘুরে আসবে। ওয়েদারবেরী আর মেলষ্টক, দু'তিন মাইলের তফাতে।

তাহলে ফারফ্রী যখন গাড়ী বার করছিল, তখন তার যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, পরে কিছু একটা সংবাদ পেয়ে সে অন্যদিকে যাত্রা করেছে, কাউকে জানাতেও পারেনি, বা সন্ধ্যেবেলায় তাদের দু'জনের মধ্যে কি ঘটে গেছে তা'ও কেউ জানে না।

এখুনি ফারফ্রীকে বাড়ীতে পাওয়া যাবে না। অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই, কিন্তু তার মত চঞ্চল ও আত্মগ্লানিজর্জর ব্যক্তির পক্ষে অপেক্ষা করাটা শাস্তি-স্বরূপ। শহরের এপ্রান্তে ওপ্রান্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। কিছুক্ষণ পাথরের ব্রিজটাতে দাঁড়িয়ে থাকল। মাঝেমাঝেই এখানে এসে দাঁড়ায় সে। জলের

কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে শুনতে দেখল, অদূরে ক্যাস্টারব্রিজের ঘরে ঘরে আলোর বর্তিকা জ্বলে উঠেছে।

প্যারাপেটের গায়ে ঠেস দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সে, হঠাৎ শহরের দিক থেকে একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনে চমকে উঠল। ছন্দোবদ্ধ অথচ জটপাকানো কেমন যেন চীৎকার। প্রতিধ্বনিতে আরো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে সে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি, ভাবল, আজকের এই স্মরণীয় দিনটাকে হয়তো শহরের বাজনদাররা এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্তি টেনে দিতে চায়। কিন্তু একটু পরেই ভুল ভেঙে গেল, আওয়াজটা ততখানি সাধারণ নয়। দুর্বোধ্য হলেও সে নিরাসক্তভাবে কান পাতল আবার। নিজে সে তখন এত তীব্র আত্ম-অবমাননায় ভুগছে যে দ্বিতীয় কোন চিন্তা তার মাথায় এল না। প্যারাপেটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে আগের মতই।

॥ উনচল্লিশ ॥

হেনচার্ডের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরে ফারফ্রী যখন নিচে নেমে এল, তখন সে ক্লান্ত। চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটু দম নিল। আকস্মিকভাবে এই ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার আগেই তার ইচ্ছা ছিল একবার বাডমাউথ রোডের কাছে একটা গ্রাম থেকে ঘুরে আসবে—তাই নিজেই গাড়ী আর ঘোড়া বার করতে যাচ্ছিল। কর্মচারীরা সবাই আজ ছুটিতে। ভয়ঙ্কর এই ঘটনার পরেও সে আর পূর্বের সিদ্ধান্ত বাতিল করল না। ভাবল, বাড়ীর মধ্যে ঢোকার আগে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে এলে, সে অনেকটা সামলে নিতে পারবে। তাতে লুসেটার চোখেও কিছুই ধরা পড়বে না।

ঠিক বেরিয়ে যাওয়ার মুখে, হুইট্‌ল এক চিঠি নিয়ে হাজির হল। খুব বাজে হাতের লেখায় চিঠিটার ওপরে ফারফ্রীর নাম ঠিকানা লেখা; আর লেখা আছে "জরুরী"। চিঠিটা খুলে ফারফ্রী আশ্চর্য হয়ে গেল। কারও স্বাক্ষর নেই—শুধু ছোট একটা অনুরোধ, তার ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে যেন আজই সন্ধ্যেবেলা একবার ওয়েদারবেরীতে যায়। ফারফ্রী এত বেশী গুরুত্ব দেওয়ার মত কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। তবুও যেহেতু সে বেরুতে যাচ্ছে—তাই এই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির অনুরোধ রাখতে আপত্তি কিছু দেখল না। তাছাড়া মেলষ্টকে একবার যাওয়ার দরকার ছিল। এক যাত্রায় সেটিও সেরে আসা যাবে। হুইট্‌লকে সে তাই গন্তব্যস্থল পরিবর্তনের কথা

জানিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই কথাগুলোই হেনচার্ডের কানে গিয়েছিল ওপরে বসে থাকতে থাকতে। ফারফ্রী খবরটা বাড়ীর মধ্যে জানায় নি, আর হুইট্‌ল্‌ও নিজ দায়িত্বে খবরটা জানানোর প্রয়োজন বোধ করে নি।

লংওয়েজ ও ফারফ্রীর অন্যান্য বন্ধুদের এক সুপরিকল্পিত কৌশল ছিল ঐ বেনামী চিঠি, যাতে সেদিন সন্ধ্যেবেলা ফারফ্রী শহর থেকে দূরে থাকতে পারে, যদিও বা সেই অশ্লীল 'স্কিমিটি-রাইড' নামক মজাটি সেদিন অনুষ্ঠিত হয় তো তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। খোলাখুলি সবকিছু জানিয়ে দেওয়ার বিপদ ছিল, কারণ তাতে তাদের বন্ধুরা যারা এই প্রাচীন কৌতুকে উৎসাহী, তাদের রুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। তাই পরোক্ষ উপায়ে চিঠি পাঠিয়ে সাবধান করে দেওয়ার ফন্দিটা প্রায় স্বাভাবিকভাবে মাথায় খেলে গেল। বেচারী লুসেটার জন্যে তারা কোনও সাবধানতা অবলম্বন করে নি, অধিকাংশ লোকের মত তারাও বিশ্বাস করত যে হয়তো এই কেলেঙ্কারীর কিছুটা সত্যি। অতএব লুসেটা যেমনভাবে পারে সহ্য করুক গে—সে ব্যাপারে এদের কিছু করণীয় নেই।

প্রায় আটটা বাজে। লুসেটা সামনের ঘরে বসেছিল একা। আধঘণ্টাটাক হল সন্ধ্যা উৎরে গেছে, তথাপি লুসেটা বাতি জ্বালায় নি। ফারফ্রী বাড়ি না থাকলে লুসেটা ফায়ারপ্লেসের ধারেই বসে থাকত। কখনও কখনও ঠাণ্ডা কম থাকলে একটা জানালা খুলে রাখত অল্প, যাতে গাড়ীর চাকার আওয়াজ সরাসরি তার কানে আসে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল লুসেটা। বিয়ের পর থেকে এমন সুখের মুহূর্ত আসে নি। সারাদিনটাই আনন্দে কেটে গেল। শুধু হেনচার্ডের উদ্ভট আচরণে কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ হয়েছিল। তা'ও হেনচার্ড বিনা প্রতিবাদে তার স্বামীর তিরস্কার হজম করে সরে যাওয়ায় কোনও গোলমালের সৃষ্টি হয়নি। একদা হেনচার্ডের প্রতি তার যে টান ছিল এখন যাবতীয় প্রমাণ বিলুপ্ত অতএব ভয় পাওয়ার মত আর কিছু ছিল না।

এই সব দিবাস্বপ্নের মত চিন্তার মধ্যে দূর থেকে একটা হৈচৈ-এর আওয়াজ ভেসে এল। আস্তে আস্তে আওয়াজের তীব্রতা বাড়ছে। এতে লুসেটা আশ্চর্য হয় নি। কারণ বিকেলবেলাটা জনসাধারণ যে আমোদ ফুর্তিতে কাটাবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু স্পষ্ট কিছু কথাবার্তা কানে আসায় লুসেটা সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে পারল না। রাস্তার উল্টোদিকের এক বাড়ীর ঝি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পাশের বাড়ীর আরও ওপরের জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা আর এক ঝিকে জিজ্ঞেস করছে—কোনদিকে যাচ্ছে গো ওরা?

কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না—অপরজন বলল—ওঃ, এইবার দেখা গেছে, ঐ যে, ঐ যে!

কোন দিকে, কোন দিকে ? প্রথমজন বলল অতোধিক উৎসাহে।

কর্ণ ষ্ট্রিট বেয়েই তো আসছে। ঐ তো এইদিকে—পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসে আছে।—

কি, দুটো নাকি—দুটো মূর্তি !

হ্যাঁ গো—গাধার পিঠে দুটো মূর্তি। পিঠে পিঠ লাগিয়ে, একটার হাত অপরটার কনুই ধরে। মেয়েটার মাথার দিকে মুখ ঘোরানো আর পুরুষটার মুখ লেজের দিকে।

বিশেষ কারও মত দেখাচ্ছে নাকি, দেখ তো ?

হ্যাঁ, হতে পারে—ছেলেটার পরণে নীলকোট, মুখটা লালপানা, পায়ে পশমের মোজা, ঢ্যাঙা চেহারায় যেন মুখোশ পরানো।

গণ্ডগোল বাড়ছিল আস্তে আস্তে, আবার কমে গেল একবার।

ঐদিকে চলে গেল—দেখতে পেলাম না। প্রথম ঝি হতাশ হয়ে বলল।

পেছনের গলিটায় ঢুকেছে—আবার বেরোবে। সুবিধাজনক স্থানে যার অবস্থিতি সেই ঝি'টা বলল।—ঐ—ঐ যে এইবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি !

মেয়েটাকে কেমন দেখাচ্ছে ? একবার বলো তো, দেখি—আমি মনে মনে যার কথা ভাবছি সে কিনা ?

আরে সেকি ? কাপড়জামা একেবারে ওনার মত—ঠিক যে পোষাকে উনি বসেছিলেন সামনের আসনে—টাউন-হলের সামনে।

লুসেটা চমকে উঠল। প্রায় তক্ষুনি খুব আস্তে অথচ দ্রুত তার ঘরের দরজা খুলে গেল। আঁচের আলোয় দেখা গেল এলিজাবেথ ঢুকছে।

তোমাকে দেখতে এলাম—হাঁপাতে হাঁপাতে বলল এলিজাবেথ—হঠাৎ ঢুকে পড়েছি, কিছু মনে কোর না। তুমি দেখছি জানালা বন্ধ কর নি এখনও।

লুসেটার উত্তরের অপেক্ষা না করে এলিজাবেথ এগিয়ে গেল জানালার দিকে, একটা কবাট টেনে দিল। পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল এসে লুসেটা, বলল—থাক না খোলা। শুকনো তার গলার স্বর। এলিজাবেথের একটা হাত চেপে ধরে, আঙুল-গুলো সরিয়ে দিল। ঘরের ভেতরে কথাবার্তা, চলাফেরা এতই নিঃশব্দে হচ্ছিল যে, বাইরের সব কথা শোনা যাচ্ছিল স্পষ্টই—

মেয়েটার গলার কাছটা খোলা, চুল বেণি করে বাঁধা—আবার চিরুণি দেখা যাচ্ছে। সিল্কের গাউন আর সাদা মোজা পরিয়েছে—পায়ে আবার রঙীন জুতো।

এলিজাবেথ আবার জানালাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু লুসেটা এসে থামিয়ে দিল তাকে।

এ তো আমি—মৃতের মত মুখ করে বলল লুসেটা—আমার আর সেই তার কুশপুত্তলিকা—তাই নিয়ে মিছিল—একী লজ্জা!

এলিজাবেথের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না, আগে থেকে সে জানত কিনা।

দেখি, বন্ধ করে দিই। এলিজাবেথ বুঝিয়ে রাজী করানোর চেষ্টা করল। গোলমাল এবং হাস্যপরিহাস যতই এগিয়ে আসছিল লুসেটার চোখমুখ আরও বেশী বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। এলিজাবেথ সেটা লক্ষ্য করে বলল—দেখি, বন্ধ করে দিই।

বন্ধ করে কোনও লাভ হবে না—লুসেটা শিউরে উঠল ভয়ে—ডোনাল্ড নিশ্চয়ই দেখতে পাবে, তাই না? এখুনি তো সে বাড়ী আসবে। আর কোনোদিন আমায় ভালবাসবে না। এ'র থেকে আমার মরণ ভাল ছিল—হায়—মরণ ভাল ছিল।

এলিজাবেথ কি করা যায় ভেবে পাচ্ছিল না, চেঁচিয়ে বলল, কোনো উপায়ে কি এটা বন্ধ করা যায় না! কেউ থামিয়ে দিতে পারে না?

লুসেটার হাত ছেড়ে দিয়ে সে দরজার দিকে ছুটে গেল। লুসেটা বেপরোয়া হয়ে বলতে লাগল—আমায় দেখতে দাও। বলে সে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। এলিজাবেথ তক্ষুণি গেল পেছন পেছন, জড়িয়ে ধরে তাকে ভেতরে টেনে আনার চেষ্টা করল। লুসেটার দৃষ্টি সোজাসুজি ঐ ভয়ঙ্কর কৌতুকের দিকে। তারা এগিয়ে আসছে দ্রুত। দুদিকের অসংখ্য বাতির আলোয় এখন দুজনকে স্পষ্ট চিনে নেওয়া যাচ্ছে। ভুল করার কোনো উপায় নেই। যাদের উদ্দেশ্য করে মূর্তিদুটি তৈরী হয়েছে এ তারা ছাড়া আর কেউ নয়।

ভেতরে এসো না—এলিজাবেথ অনুরোধ করল—দেখি, জানলাটা বন্ধ করে দিই!

ও তো আমি, স্পষ্ট আমার মত—এমন কি সবুজ রঙের প্যারাসোল পর্যন্ত রয়েছে। অট্টহাসি হাসতে হাসতে লুসেটা ভেতরে এসে ঢুকল। মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে—তারপর দম করে পড়ে গেল মেঝেয়।

তার পড়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্কিমিংটনের নিষ্ঠুর বাদ্য থেমে গেল। শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাস্যধ্বনি ছোট ছোট ঢেউয়ের মত হয়ে মিলিয়ে গেল। ঝড় থেমে যাওয়ার মত নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল সবদিক। এলিজাবেথ বুঝতে পারছিল সব কিছু। ঘর থেকে সে বেল বাজাল একবার। নিচু হয়ে দেখতে লাগল লুসেটাকে—কার্পেটের ওপর লুসেটা তখন মৃগীরোগীর মূর্চ্ছা যাওয়ার মত পড়ে আছে। বারংবার বেল বাজাতেও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ ঝি-চাকর সকলেই বাইরে বেরিয়ে গেছে মজাটাকে পুরোপুরি উপভোগ করার জন্যে।

অবশেষে ফারফ্রীর চাকরটা এসে ঢুকল। তারপর ঢুকল বাবুর্চি। জানালা

ভাল করে বন্ধ করিয়ে এলিজাবেথ আলো আনাল। লুসেটাকে তার ঘরে তুলে নিয়ে যাওয়া হল আর চাকরটাকে পাঠানো হল ডাক্তার ডাকতে। এলিজাবেথ যখন লুসেটার কাপড়জামা খুলে আলগা করে দিচ্ছিল মনে হল যেন তার চেতনা ফিরে আসছে—কিন্তু যেই তার মনে পড়ে গেল সব ঘটনা, আবার মূর্চ্ছা গেল সে। ডাক্তারবাবু যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন এটা ধারণা করা যায় নি। তিনিও অন্যদের মত বাড়ীর দরজাতেই দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিলেন। রোগিনীকে পরীক্ষা করে মূক এলিজাবেথের নীরব আবেদনের উত্তরে জানালেন—অবস্থা গুরুতর।

ফিট পড়েছে কি? এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, কিন্তু এখন ওঁর যা শরীরের অবস্থা তাতে ফিট হওয়া মানে সাংঘাতিক ব্যাপার। আপনি এখুনি মিঃ ফারফ্রীকে ডাকতে পাঠান। কোথায় গেছেন তিনি?

তিনি তো গাঁয়ের দিকে গেছেন—সদরের ঝি খবরটা জানাল—বাডমাউথ রোডে কোনো গ্রামে গেছেন বোধহয়—এখুনি আসবেন ফিরে।

যাই হোক তবু তাঁকে ডাকতে পাঠাও হয়তো তিনি দেরীও করতে পারেন। ডাক্তার আবার রোগিনীর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখুনি লোক পাঠিয়ে দেওয়া হল। একটু পরেই তার বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল।

ইতিমধ্যে মিঃ বেঞ্জামিন গ্রোয়ার টুপিটা মাথায় দিয়ে তাঁর হাই স্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। ঢাক-ঢোল, বাঁশী, করতাল জগঝম্পের আওয়াজ শুনে তাঁর ইচ্ছা হ'ল কারণটা কি জানা দরকার? ফারফ্রীর বাড়ীর কোনাকুনি আসতেই তিনি বুঝে ফেললেন ব্যাপারখানা। এখানকার স্থানীয় লোক বলে তিনি ছোটবেলাকার এমন অনেক মজা স্মরণ করতে পারছিলেন। প্রথমেই তিনি খুঁজতে লাগলেন শহরের শান্তিরক্ষকদের। দু'জনকে মাত্র পাওয়া গেল, তাও তারা একজায়গায় বসে আছে গোপনে। কারণ তাদের আশঙ্কা এবং আশঙ্কাটা অমূলক নয়, যে এই মুহূর্তে লোকের সামনে পড়ে গেলে তাদেরও দু'চার ঘা উত্তম মধ্যম জুটে যেতে পারে।

মিঃ গ্রোয়ারের তিরস্কারের উত্তরে স্টাবার্ড নামে একজন পুলিশ বলল—আমরা দু'টি মাত্র সেপাই এত লোকের বিরুদ্ধে কি করতে পারি বলুন তো?

তাহলে আর কারও সাহায্য নাও। চলো আমি যাচ্ছি। দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা। তাড়াতাড়ি করো, তোমাদের লাঠি আছে তো?

লোকে আমাদের পুলিশ বলে জানুক আমরা তা চাইনি তাই সরকারী লাঠি এই জলের পাইপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

বার করো, বার করো। শিগগির চলো এই তো মিঃ ব্লোবজ্জিকেও দেখতে

পাচ্ছি। (মিঃ ব্লোবডি ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে সংখ্যায় তৃতীয়)।

কে কে আছে? ব্লোবডি বলল—নামগুলো পেয়েছেন?

মিঃ গ্রোয়ার একজন কনষ্টেবলকে লক্ষ্য করে বলল—তুমি যাও মিঃ ব্লোবডির সঙ্গে ঐ পিছন দিক দিয়ে—ঐ দিক দিয়ে ঘুরে রাস্তায় উঠবে। আমি সামনের দিক দিয়ে যাচ্ছি ষ্টাবার্ডকে সঙ্গে নিয়ে। এইভাবে ওদের ঘিরে ফেলব। নামগুলো পাওয়া চাই।

মিঃ গ্রোয়ারের সাথে ষ্টাবার্ড এগিয়ে গেল কর্ণ ষ্ট্রীটের দিকে। সেখান থেকেই বাজনাবাদ্যি শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সেখানে পৌছে কিছুই দেখতে পেল না। ফারক্রীর বাড়ী পেরিয়ে গিয়ে তারা রাস্তার মুড়ো পর্যন্ত কিছুই দেখতে পেল না। রাস্তায় বাতির শিখাগুলো দুলছে। গাছগুলো চুপচাপ। দুচারটি লোক পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছুই স্বাভাবিক।

গ্রোয়ার তাদের মধ্যে একটা লোককে ডেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের মত জিজ্ঞেস করল—কিছু অসভ্য লোকজনকে এখানে গোলমাল করতে দেখেছ নাকি?

লোকটা আর কেউ নয়, 'পিটার্স ফিঙ্গারের' চার্ল। বিনীতভাবে বলল সে—আজ্ঞে কি বললেন? গ্রোয়ার বলল আবার।

নিষ্পাপ শিশুর মত মাথা নাড়ল চার্ল—না তো কিচ্ছু দেখি নি তো! দেখেছ নাকি জো? তুমি তো আমার আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছ তাই না?

জোসেফও অপরজনের মত সাফসুফ উত্তর দিল।

উ-ম্-আচ্ছা—বলল গ্রোয়ার—দেখি ঐ ভদ্রলোককে তো চিনি মনে হচ্ছে। জোপকে এগিয়ে আসতে দেখে গ্রোয়ার জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা এখানে একদল লোককে হট্টগোল করতে দেখেছেন? স্কিমিংটন রাইডিং—বা ঐ ধরণের কিছু?

কই না তো কিছু দেখিনি—জোপ উত্তর দিল, যেন ব্যাপারটা সে এই প্রথম শুনল—আমি অবশ্যি আজ বেশীদূর হাঁটি নি তাই বোধহয়—

না না সে তো এখানেই ঠিক এই জায়গায়—বলল ম্যাজিষ্ট্রেট।

ও এতক্ষণে বুঝেছি, তাই তো ভেবে পাচ্ছিলাম না—আজ ত্রই ঝাউগাছগুলোয় কেন শনশন আওয়াজ হচ্ছে অন্যদিকের থেকে বেশ জোরে—তাই হবে বোধহয়?—জোপ তার বিশাল কোটের পকেটে হাতদুটো সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল। (বিরাট সাইজের পকেটে তখনও একটা শিঙ্গা আর বড় বড় দুটো করতাল লুকোনো ছিল)।

না না আমাকে কি বোকা পেয়েছেন নাকি? এস হে সেপাই, এদিকে এস, পেছনের রাস্তাটা ঘুরে যাই।

সামনে পিছনে কোনো রাস্তাতেই হৈচৈকারী কাউকে দেখা গেল না। ব্লোবডি

আর দ্বিতীয় সেপাইটা এসেও একই সংবাদ দিল। কুশপুত্তলিকা, ভারবাহী গর্দভ সেজের বাতি, বাজনাবাদ্যি সব যেন 'কোমাস' নাটকের চরিত্রগুলোর মত উবে গেল।

এখন একটাই কাজ করা যেতে পারে—বলল গ্রোয়ার—জনাছয়েক লোক নিয়ে তুমি মিন্সেন লেন-এ চলে যাও। 'পিটার্স ফিঙ্গারে' মধ্যেটা ভাল করে দেখবে। সেখান থেকে যদি কিছু না ধরা যায় তো বেশ ধোঁকা দিয়েছে মানতে হবে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকজন সংগ্রহ করে শান্তিরক্ষকরা সেই কুখ্যাত জায়গাটার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। অন্ধকার রাত্রিতে সেখানে যাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। কোথা থেকেও একটু বাতির আলো দেখা যায় না। অবশেষে তারা সাহস করে সেই সরাইখানায় ঢুকতে পারল। তা'ও অনেক চেঁচামেচি এবং অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর।

বিশাল একখানা ঘরের মধ্যে ঠেসবেঞ্চি পাতা। বেঞ্চির পেছনটা আবার ঘরের আড়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। জনা কয়েক লোক অন্যান্য দিনের মতই পানক্রিয়া এবং তামাকু সেবনে ব্যস্ত। আগন্তুকদের প্রতি মোলায়েম দৃষ্টি মেলে একেবারে নিরপরাধ ভঙ্গিতে বলল মালিকানী—আসুন আসুন মশায়রা আসুন, এখনও অনেক জায়গা আছে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি তো?

ঘরটার সবদিক ভাল করে দেখে ষ্টাবার্ড একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল—ঘটেছে বৈকি! তোমাকে তো এখুনি কর্ণষ্ট্রিটে দেখলাম। মিঃ গ্রোয়ার তোমার সঙ্গে কথা বললেন না?

লোকটা চার্ল। অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে সে বলল—আমি তো আধঘণ্টা হল এখানে বসে আছি—তাই না ন্যান্স? ন্যান্স নামে পাশের মেয়েলোকটি তখন একাগ্রমনে মদের কাপে চুমুক দিচ্ছে।

হুঁ তাই তো। আমি তো সেই কখন এসেছি—তার আগে থেকেই তুমি বসেছিলে এখানে অন্যদের সঙ্গে।

অন্য একটা কনেষ্টবল তখন বড় দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়েছিল। ঘড়ির কাচের মধ্যে মালিকানীর খুব দ্রুত চলাফেরার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করে সে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল মালিকানী উনুনের মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছে।

এখানে কিছু একটা আছে মনে হচ্ছে। বলে এগিয়ে গিয়ে সে উনুনের মুখটা খুলে ফেলল ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা ঢোলক।

ওটা এখানে নাচগানের সময় বাজানো হয়—মুখ কাঁচুমাচু করে বলল মালিকানী—বাইরে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া তাই ওখানে আঁচের গরমে ওটা শুকনো থাকে।

কিছু একটা বুঝতে পেরে পুলিশটা মাথা নাড়ল। এই নির্দোষ এবং নির্বাক সমাবেশ থেকে বিশেষ কোন খবরই উদ্ধার করা গেল না। কিছুক্ষণ পরেই অনুসন্ধানকারী দলটি বাইরে বেরিয়ে গেল—সেখানে বাকি যারা দরজায় পাহারা দিচ্ছিল তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে চলে গেল অন্য কোথাও।

॥ চল্লিশ ॥

এইসব ঘটনার খানিকটা আগে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে এটা ওটা ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল হেনচার্ড। রাস্তায় একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ দেখতে পেল একটা মিছিল—একটা গলি থেকে আস্তে আস্তে আত্মপ্রকাশ করল একেবারে তার নাকের ডগায়। মশালের আলো শিঙ্গার আওয়াজ আর লোকের আওয়াজ আর লোকের ভিড়ে সচকিত হয়ে উঠল সে—গর্দভারুঢ় দু'টি মূর্তি দেখে বুঝতে পারল ব্যাপারখানা কি।

এই রাস্তা পেরিয়ে তারা একটা অপর রাস্তায় পড়ল, তারপর মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। পিছন ফিরে দু চার পা হাঁটতে হাঁটতে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল হেনচার্ড—অবশেষে খালপারের একটা রাস্তা দিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল। সেখানেও স্থির হয়ে বসতে না পেরে গেল সৎ-মেয়ের বাসায়। সেখানে গিয়ে শুনল এলিজাবেথ গেছে মিসেস ফারফ্রীর কাছে। কি এক অজানা আশঙ্কায় এক মোহের ঘোরে আবিষ্ট হয়ে সেদিকেই হাঁটতে শুরু করল হেনচার্ড এলিজাবেথের খোঁজে। ততক্ষণে হল্লোড়বাজরা অদৃশ্য হয়ে গেছে। খুব আলতো করে বেল বাজাল হেনচার্ড সে বাড়ীর দরজায়—কি কি ঘটেছে সব শুনল তারপর। ডাক্তারবাবু যে ফারফ্রীকে এখুনি বাড়ী থেকে আনতে বলেছেন, তা'ও শুনল আরও জানতে পেল ফারফ্রীর খোঁজে বাডমাউথ রোডে লোক চলে গেছে।

এই সব ঘটনায় বিচলিত হয়ে হেনচার্ড বলল—কিন্তু সে তো বাডমাউথের দিকে যায় নি, গেছে মেলষ্টক আর ওয়েদারবেরীর দিকে।

কিন্তু হায় হেনচার্ডের সুদিন চলে গেছে—এখন তার কথায় কেউ আস্থা রাখে না বোং য়া লোকটা ভুল বকছে বলে মনে করে। লুসেটার বেঁচে থাকা তখন অনেকটা নির্ভর করছে ফারফ্রীর ফিরে আসার ওপর। পাছে তার সঙ্গে হেনচার্ডের পুরনো সম্পর্ক কেউ রব চড়িয়ে ফারফ্রীব কানে তোলে এই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে

লুসেটা। কিন্তু ওয়েদারবেরীর দিকে কোন লোক গেল না ফারফ্রীকে খোঁজ করতে। তীব্র উদ্বেগ আর অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে হেনচার্ড ঠিক করল নিজেই যাবে তার খোঁজে।

শহর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সে ছুটতে আরম্ভ করল এই উদ্দেশ্যে। পূবদিকের রাস্তা দিয়ে ডার্ণওভারের গ্রাম পেরিয়ে এই বসন্ত রাত্রির আবছা অন্ধকারে সে দুটো টিলা পেরিয়ে প্রায় মাইলতিনেক চলে এল। ইয়ালবেরী—টিলাটার তলায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল হেনচার্ড। প্রথমে নিজের হৃৎস্পন্দন ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। তারপর ইয়ালবেরীর জঙ্গলে লম্বা লম্বা গাছের মাঝে বাতাসের শন্‌শন্‌ বিলাপের ধ্বনি ভেসে এল। কিন্তু একটু পরেই চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ শোনা গেল আর সেই সঙ্গে দেখা গেল মৃদু আলোর রেখা।

চাকার আওয়াজ শুনেই হেনচার্ডের মনে হল এটা নিশ্চয়ই ফারফ্রীর গাড়ী। এই গাড়ীটা একদিন তারই ছিল—অন্যান্য জিনিস পত্রের সঙ্গে বর্তমানে ফারফ্রীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। সমতল রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল হেনচার্ড। গাড়ীটা আসছিল তার পেছনে। আস্তে আস্তে গতিবেগ কমে গেল গাড়ীটার।

এই মোড় থেকে মেলষ্টকের রাস্তা বেরিয়ে গেছে। ঐ রাস্তায় ঢুকে পড়লে বাড়ী ফিরতেফারফ্রীর আরও ঘণ্টা দুই দেরী হয়ে যাবে। আলোটা সেই দিকেই ঘুরছে দেখে মনে হল ফারফ্রী এখনও সে ইচ্ছা ত্যাগ করেনি। এই সময়েই ফারফ্রীর আলো এসে পড়ল হেনচার্ডের মুখে। ফারফ্রী, তখুনি তার পুরনো প্রতিপক্ষকে চিনতে পারল।

ফারফ্রী, মিঃ ফারফ্রী!—হাত তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল হেনচার্ড।

পাশের রাস্তাটায় কয়েক পা এগুতে দিয়ে ঘোড়া থামাল ফারফ্রী। লাগাম টেনে ধরে মাথা বার করে ঘোর শত্রুকে উদ্দেশ্য করে যেভাবে লোকে কথা বলে সেইভাবে বলল—কি?

এখুনি ক্যাস্টারব্রিজে ফিরে চল—হেনচার্ড বলল—তোমার বাড়ীতে কিছু একটা বিপদ হয়েছে। সেজন্য তোমার ফিরে যাওয়া একান্ত দরকার। এই কথাটা বলার জন্যই আমি এতখানি পথ দৌড়ে আসছি।

ফারফ্রীকে চুপচাপ থাকতে দেখে হেনচার্ড নিজের মনে চিন্তায় ডুবে গেল। এই সোজা কথাটা কেন ভেবে দেখেনি সে! মাত্র ঘণ্টাচারেক আগে যে ফারফ্রীকে সে কুস্তি লড়াইয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল প্রায় এখন এই নির্জন পথে রাত্রির অন্ধকারে তাকে একটা বিশেষ দিকে যেতে আহ্বান করছে—যেখানে হয়তো একজন আক্রমণকারী তার সঙ্গীসাথীদের হাজির করে রাখতে পারে। এমতাবস্থায় ফারফ্রীর পক্ষে নিজের পূর্বনির্দিষ্ট পথে যাওয়াটাই বেশী নিরাপদ যেখানে হয়তো আক্রমণের ভয় নেই।

ফারফ্রীর মনের এই সমস্ত চিন্তা যেন স্পষ্ট অনুভব করল হেনচার্ড।

আমাকে তো মেলষ্টকে যেতে হচ্ছে। ফারফ্রী বলল বিনা উত্তেজনায়। বলে ঘোড়ার লাগাম আলগা করে দিল।

হেনচার্ড অনুরোধের সুরে বলল—কিন্তু মেলষ্টকের কাজের থেকে এটা বোধহয় বেশী জরুরী ছিল। মানে তোমার স্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চল যেতে যেতে তোমাকে সব বলছি।

হেনচার্ডের অস্থিরতা এবং আকস্মিকতা লক্ষ্য করে ফারফ্রীর সন্দেহ আরও দৃঢ় হল এটা নিশ্চয়ই তাকে পাশের জঙ্গলে ডেকে নিয়ে যাওয়ার ছল। মানসিক দুর্বলতা বা বুদ্ধির ভুলে যেটা হেনচার্ড আগে করেনি এখন হয়তো সেটাই সম্পন্ন করতে চায়। দেরী না করে ঘোড়া চালিয়ে দিল ফারফ্রী।

পেছন পেছন ছুটতে লাগল হেনচার্ড। প্রাক্তন বন্ধুর চোখে ক্রূরতা আর সন্দেহ লক্ষ্য করে হতাশায় ভেঙে পড়েছে সে তখন। ধরা গলায় বলল—তুমি কি ভাবছ আমি বুঝতে পেরেছি—কিন্তু যা ভাবছ আমি তা নই ফারফ্রী! আমাকে বিশ্বাস কর—শুধু তোমার আর তোমার স্ত্রীর জন্যেই আমার এতদূর আসা। তার অবস্থা খুবই খারাপ—এ'র বেশী আর কিছু আমার জানা নেই। আর তারা চায় যে তুমি বাড়ী যাও। তোমার লোকেরা ভুল করে অন্যদিকে খুঁজতে গেছে। ফারফ্রী! আমাকে অবিশ্বাস কোর না। আমি দুরবস্থায় পড়তে পারি—কিন্তু আমার অন্তরে কোনো ফাঁকি নেই।

ফারফ্রী অবশ্যি তাকে পুরোপুরি অবিশ্বাসই করল। স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলেও যখন সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। হেনচার্ডের এ কাহিনীর থেকে বরং তার মিথ্যাভাষণই বেশি সম্ভব। হেনচার্ডের মুখ থেকে সে আগেও অনেক ব্যঙ্গ শুনেছে—এটা হয়তো নতুন একটা কৌশল। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে। নিমেষেই সামনের টিলার কাছে পৌঁছে গেল। তার ওদিকেই মেলষ্টকের সীমানা। আবেগের তাড়নায় অস্থির হেনচার্ড তখনও পেছনে ছুটছে দেখে তার অসদুদ্দেশ্য যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শকট এবং তার আহরী আস্তে আস্তে দিগন্তরেখায় হারিয়ে গেল। ফারফ্রীর মঙ্গলচিন্তায় হেনচার্ডের এত পরিশ্রম বৃথা চলে গেল। সে যতই অনুতপ্ত হোক না কেন পরলোকে তার জন্যে কোনও নির্মল আনন্দ অপেক্ষা করে ছিল না। চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও মানুষের শেষ অবলম্বন আত্ম-সম্মানটুকু যখন হারিয়ে যায় তখন শুধু নিজেকেই গালমন্দ করা ছাড়া আর পথ থাকে না। আত্মগ্লানিতে তখন তার অন্তরে এমন অন্ধকার নেমে এসেছে যার তুলনা কেবলমাত্র এই বৃক্ষাচ্ছাদিত বর্তমান নিশীথ রাত্রি।

এখন সে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চলেছে। এখানে তাকে অপেক্ষা করতে দেখলে ফারফ্রী পাছে অনাবশ্যক দেরী করে ফেলে বাড়ীফেরার সময়, সেটা ঠিক হবে না।

ক্যাস্টারব্রিজে ফিরে হেনচার্ড আবার গেল ফারফ্রীর বাড়ী খবর নিতে। দরজা খুলতেই অনেকগুলো উদ্বিগ্ন মুখ সিঁড়ি থেকে, বারান্দা থেকে আর দরদালান থেকে চেয়ে রইল তার দিকে।—সকলেই তারা ব্যর্থমনোরথ হয়ে বলল—না তিনি আসেন নি। যে চাকরটা ফারফ্রীকে খুঁজতে গিয়েছিল অনেক আগেই ফিরে এসেছে সে। তাই এখন একমাত্র ভরসা ছিল যদি হেনচার্ড খুঁজে আনতে পারে।

ওঁকে কি খুঁজে পাওয়া গেল না? জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

হ্যাঁ পেয়েছিলাম—কিন্তু—বলতে বলতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল হেনচার্ড—ওঁর আসতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে।

হুম—বলে ডাক্তার ওপরতলায় চলে গেলেন। অন্যান্যদের মধ্যে এলিজাবেথকে দেখে হেনচার্ড জিজ্ঞেস করল, কেমন আছে এখন?

খুবই খারাপ অবস্থা বাবা! ওর স্বামীকে একবার দেখার জন্যে বড়ই ছটফট করছে। বেচারীকে—লোকগুলো মেরেই ফেলেছে প্রায়।

কয়েক মুহূর্তের জন্য বক্তার সহানুভূতি লক্ষ্য করে হেনচার্ড যেন নতুন চিন্তার সূত্র খুঁজে পেল। আর বাক্যব্যয় না করে সে তার কুটীরের দিকে পা বাড়াল। মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানেই শেষ। যেন মৃত্যু শাঁসটা খেয়ে গেল—আর খোলস পড়ে থাকল ফারফ্রীর জন্যে। কিন্তু এলিজাবেথ—এই সর্বব্যাপী অন্ধকারে সেই যে সবেমাত্র আলোকবর্তিকা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যখন সে কথা বলছিল বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল তার মুখখানা, যেন ভালবাসা ঝরে পড়ছে। বর্তমান অবস্থায় হেনচার্ড শুধুমাত্র নিষ্পাপ এবং পবিত্র ভালবাসা ছাড়া আর কিছু চায় না। এলিজাবেথ তার নিজের কেউ নয় কিন্তু এখনই প্রথম তার খেয়াল হল যে ইচ্ছা করলে সে এলিজাবেথকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারে যদি অবশ্যি এলিজাবেথ তাকে ভালবাসতে রাজী থাকে।

হেনচার্ড যখন ঘরে ফিরল, তখন জোপ শুতে যাচ্ছে। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে, জোপ বলল, মিসেস ফারফ্রীর অসুখটা খুব সাংঘাতিক?

হেনচার্ড ছোট্ট করে উত্তর দিল—হ্যাঁ। সেই রাত্রির ঘটনায় জোপের কি ভূমিকা ছিল তার বিন্দুমাত্রও জানত না হেনচার্ড। মুখ তুলে সে দেখতে পেল জোপের মুখেও উদ্বেগের ছায়া।

হেনচার্ড যখন নিজের কামরার দরজা বন্ধ করছিল, জোপ বলল—এক ভদ্রলোক

আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—মনে হল যেন ভবঘুরে বা জাহাজের নাবিকের মত।

ও তাই নাকি! কে লোকটা?

বেশ অবস্থাপন্ন দেখলাম। মাথার চুল সব পেকে গেছে—আর মুখখানা বেশ বড়। কিন্তু নাম ধাম কিছু বলল না। কোনো সংবাদও বলতে বলে নি।

মরুক গে, আমারও দরকার নেই। বলে দরজা বন্ধ করে দিল হেনচার্ড।

হেনচার্ডের আন্দাজমতই মেলষ্টক থেকে ঘুরে আসতে ফারফ্রীর ঘণ্টা দুই লেগে গেল প্রায়। অন্য প্রয়োজন ছাড়াও তার বাড়ী ফিরে আসা বিশেষ জরুরী ছিল, বাডমাউথ থেকে দ্বিতীয় কোনো ডাক্তার ডাকার অনুমতি দেওয়ার জন্যে। অবশেষে ফারফ্রী যখন ফিরে এল—হেনচার্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা করার জন্যে মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

অনেক দেরী হয়ে গেলেও বাডমাউথে একজন লোক পাঠান হল। রাত গভীর হল। ভোরের দিকে একজন ডাক্তার এসে পৌছলেন। ডোনাল্ড এসে পড়তে লুসেটা অনেকটা সামলে নিয়েছিল। সে স্ত্রীর পাশ থেকে একেবারেই নড়ে নি প্রায়। ডোনাল্ড এসে ঢুকতেই লুসেটা ক্ষীণ গলায় কিছু বলতে চেয়েছিল—যে কথা না বলতে পারার যন্ত্রণায় অন্তরে জ্বলছিল সে এতক্ষণ—কিন্তু ফারফ্রী তাকে কিছু বলতে দেয়নি পাছে কথা বললে আরও খারাপ হয়। কথা বলবার মত সময় পরে অনেক পাওয়া যাবে—এই বলে আশ্বস্ত করল তাকে।

এখন পর্যন্ত স্কিমিংটন-রাইডের ব্যাপারে কিছুই জানত না ফারফ্রী। মিসেস ফারফ্রীর ভয়ানক অসুস্থতা এবং গর্ভপাতের সম্ভাবনার কথা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অসুস্থতার কারণটা কি বুঝতে পেরে তার প্রতি সহানুভূতি এবং অজানা এক আতঙ্কে শহরের কারও মুখে কথা ছিল না। আর লুসেটার আশেপাশে যারা ছিল তারাও কেউ সাহস করে সেই ঘটনার কথা ফারফ্রীকে জানিয়ে তার মনঃকষ্ট বৃদ্ধি করতে চায় নি।

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে তারা দু'জনে যতক্ষণ নিভৃত ছিল তার মধ্যে ফারফ্রীর স্ত্রী ফারফ্রীকে হেনচার্ডের সঙ্গে তার পুরনো সম্পর্কের ব্যাপারে কতখানি কি বলেছিল তা অনিশ্চিত। ফারফ্রীর নিজের মুখ থেকে অবশ্যি এটুকু শোনা যেত যে হেনচার্ডের সঙ্গে তার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার কথা কিছু কিছু সে জানে। কিন্তু লুসেটা ক্যাস্টারব্রিজে এসেছিল কি উদ্দেশ্য নিয়ে, হেনচার্ডের প্রতি তার পরবর্তী আকর্ষণ···কি কারণেই বা ভয় পেয়ে সে হেনচার্ডকে মন থেকে ত্যাগ করেছিল শেষ পর্যন্ত (যদিও অন্য এক পুরুষের প্রতি প্রথম দেখা হওয়ার সময়েই যে দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল সেটাই আসল

কারণ) এবং প্রথমজনকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয়জনকে বিয়ে করার নিগূঢ় যৌক্তিকতা—এসব কথা সে কতটা কি খুলে বলেছিল তা ফারফ্রী একাই জানত।

সেই রাত্রে ক্যাস্টারব্রিজের রাস্তায় যে চৌকিদার রাত্রে ঘন্টা পেটায়...সে ছাড়া আর একটি লোককে প্রায় একই সময় অন্তর ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল.... সে হেনচার্ড। বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সে উঠে এসেছিল, ঘুরে বেড়াচ্ছিল এদিক ওদিক—আর বারবারই খবর নিচ্ছিল রোগিনী কেমন আছে। লুসেটা সম্পর্কে যেমন খবর নিচ্ছিল তেমনি নিচ্ছিল ফারফ্রীর সম্পর্কেও। তার থেকে বেশী খবর নিচ্ছিল এলিজাবেথের বিষয়। বেঁচে থাকার অন্য সব অবলম্বন একে একে খসে পড়ায় এই সৎমেয়ের ব্যক্তিত্বকে ঘিরেই হেনচার্ডের বর্তমান জীবন আবর্তিত অথচ কিছুদিন আগেও সে এই মেয়েটিকে সহ্য করতে পারত না। লুসেটার খবর নিতে গিয়ে বারবার এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও ছিল এখন সুখের ব্যাপার।

শেষবারের মত খবর নিতে গেল হেনচার্ড রাত চারটের সময়—ভোরের আলো তখন ফিকে হয়ে দেখা দিচ্ছে। ডাণওভারের বিলটার ওপাশে চাঁদ ডুব যাচ্ছে প্রায়—চড়ুইপাখীগুলো সবে রাস্তায় নেমে বসেছে—সব বাড়ীর উঠোনেই মুরগীর খাঁচা থেকে কঁকর কঁকর আওয়াজ ভেসে আসছে। ফারফ্রীর বাড়ী থেকে কয়েক গজ তফাতে থাকতেই সে দেখল দরজাটা আস্তে খুলে গেল। দরজায় কাপড় জড়ানো ছিল যাতে টোকা দিলেও জোরে শব্দ না হয়। একটা ঝি সেই কাপড়টা খুলে নিচ্ছিল। হেনচার্ড এগিয়ে গেল। তাকে দেখে চড়ুইপাখিগুলো একটু নড়েও বসল না। এত ভোরে যে কোনও মানুষ তাদের স্বচ্ছন্দ চলাফেরা বিঘ্নিত করতে পারে এটা বোধহয় তারা বিশ্বাস করে নি।

হেনচার্ড জিজ্ঞেস করল—ওটা খুলে ফেললে কেন?

মেয়েলোকটা তাকে আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দু'এক মিনিট কোন কথা বলল না। তাকে চিনতে পেরে অবশেষে বলল—এখন যত জোরে খুশী শব্দ করলেও সে শব্দ আর ওঁনার কানে পৌঁছবে না।

॥ একচল্লিশ ॥

হেনচার্ড বাসায় ফিরে গেল। সকাল হয়ে গেছে। রোদ উঠেছে। আঁচ বাড়িয়ে হেনচার্ড আনমনাভাবে বসল আগুনের পাশে। কিছুক্ষণ পরেই সে শুনতে পেল

মৃদুপায়ে হাঁটতে হাঁটতে কে আসছে এই বাড়ীর দিকে। গলির মধ্যে ঢুকে খুব হাল্কাহাতে আঙুল দিয়ে টোকা দিল দরজায়। হেনচার্ডের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—সে বুঝতে পারল এলিজাবেথ এসেছে। মলিন ও বিষন্ন মুখে ভেতরে এসে ঢুকল এলিজাবেথ।

বাবা শুনেছ—মিসেস ফারফ্রী—মারা গেছে। হ্যাঁ সত্যি—এই ঘণ্টাখানেক হল।

জানি—বলল হেনচার্ড—এই তো একটু আগে আসছি সেখান থেকে। তুমি আবার কষ্ট করে সে কথা জানাতে এসেছ আমাকে! তুমিও নিশ্চয় রাত জেগে বসে থেকে খুব ক্লান্ত। সকালটা থাকবে এখানে? তাহলে ঐ পাশের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করো—সকালের খাবার তৈরী হলে আমি ডাকব এখন।

এই নিঃসঙ্গ মেয়েটির জীবনে হেনচার্ডের বর্তমান সদয় ব্যবহার কৃতজ্ঞতা জাগিয়ে তুলছিল। তাকে খুশী করার জন্যে এবং নিজে খুশী হওয়ার জন্যেও বটে হেনচার্ডের কথাটাকে আদেশ বলে মনে করল এলিজাবেথ। পাশের ঘরে বেঞ্চিকে কেটে তৈরী করা প্রায় কৌচের মত একটা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিল সে। ওপাশ থেকে হেনচার্ডের নড়াচড়া শুনতে পেলেও এলিজাবেথের মনে তখন লুসেটার কথা ঘোরাফেরা করছে। জীবনের এত পূর্ণতা এবং আসন্ন মাতৃত্বের চরম আনন্দের মধ্যে তার মৃত্যু ভয়ঙ্কর রকমের অপ্রত্যাশিত। ভাবতে ভাবতেই এলিজাবেথ ঘুমিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে বাইরের ঘরে প্রাতঃরাশ তৈরী করে ফেলল হেনচার্ড কিন্তু এলিজাবেথ ঘুমুচ্ছে দেখে ডাকল না। আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল সে অনেকক্ষণ। কেটলিতে জল ফুটছিল। গৃহিনীর মত যত্নে সে নজর রাখছিল সবদিকে যেন এলিজাবেথ এখানে আসাতে সে খুব সম্মানিত বোধ করছে। প্রকৃতপক্ষে এলিজাবেথ সম্পর্কে হেনচার্ডের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে হেনচার্ড, যেন আপন কন্যার মত এলিজাবেথ তার সর্বক্ষণের সাথী—সুখী হওয়ার মত আর কোন উপায় অবশিষ্ট ছিল না।

এমনি সময়ে আরেকবার দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনে বিরক্তি বোধ করল হেনচার্ড। উঠে দরজা খুলতে আদৌ ইচ্ছা হচ্ছিল না তবু খুলে দিল। একটি শক্তসমর্থ চেহারার লোক দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, চোখমুখ দেখেই মনে হয় বহিরাগত এবং অপরিচিত। এই লোকটিই 'পিটার্স ফিঙ্গার' সরাইখানায় রাস্তাঘাটের খবর নিয়েছিল। মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি মেলে হেনচার্ড তাকাল।

গুডমর্নিং গুডমর্নিং—আন্তরিকতা ঢেলে বলল আগন্তুক, আমি কি মিঃ হেনচার্ডের সঙ্গে কথা বলছি?

হ্যাঁ আমার নামই হেনচার্ড।

তাহলে আপনাকে বাড়ীতেই পাওয়া গেছে। দরকারী কথাবার্তার জন্যে সকাল-বেলাটাই ভাল আমার মতে। কি বলেন? আপনার একটু সময় হবে তো?

নিশ্চয় হবে। হেনচার্ড ভেতরে আসতে আহ্বান করল।

আসন গ্রহণ করে বলল আগন্তুক—আপনার হয়তো মনে পড়বে—অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ দেখে হেনচার্ড মাথা নাড়ল।

অবশ্যি না'ও মনে পড়তে পারে—আমার নাম নিউসন।

হেনচার্ডের মুখ-চোখ মড়ার মত স্থির হয়ে গেল যদিও অপর ব্যক্তির সেটা নজরে পড়ল না। একটু পরে হেনচার্ড বলল—হুঁ নামটা মনে আছে। মেঝের দিকে তার দৃষ্টি।

আমারও তাতে সন্দেহ নেই।—তবে কথা হল গত দিনপনের যাবৎ আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। হ্যাভেনপুলে জাহাজ থেকে নেমে আমি এই ক্যাস্টারব্রিজ হয়েই ফলমাউথে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম বছর কয়েক আগে আপনি ক্যাস্টারব্রিজে ছিলেন। ফিরে এলাম আবার—তারপর অনেক খুঁজে পেতে এই এখানে এসে হাজির হয়েছি। যাক গে, শুনুন—বিশ বছর আগেকার আমাদের সেই কেনাবেচার কথা মনে পড়ে? আজব ব্যাপার সত্যিই! তবে আমার বয়েস কম ছিল, আর মানুষটাও বোধহয় ভাল ছিলাম এখনকার থেকে।

আজব ব্যাপার! না তার চেয়েও সাংঘাতিক। আমি তো কিছুতেই মেনে নিতে পারি না এই আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল। আমার তখন মতিভ্রম হয়েছিল—মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক না থাকলে আবার মানুষ নাকি?

তখন আমাদের বয়েস কম ছিল, বুদ্ধি বিবেচনাও কম ছিল—নিউসন বলল—যাইহোক তর্ক করার জন্যে আমি আসি নি, আমি এসেছি পুরনো ভুল শোধরাতে। বেচারী সুসানের জন্যে দুঃখ হয়—তার অভিজ্ঞতাটাই নিদারুণ।

হুঁ তা বটে।

একেবারে ঘরোয়া স্নেহকাতর মেয়ে ছিল। যাকে বলে চালাক-চতুর সেরকম ছিল না মোটেই, একটু চতুর হলে ভাল হত।

হুঁ তা ছিল না।

আপনি বোধহয় ভালই জানেন সরলবুদ্ধিতেই সে ব্যাপারটাকে কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিল—এজন্যে তার অন্তরে পাপবোধ ছিল না এতটুকুও।

জানি, জানি। সে আমি নিজেই দেখেছি—হেনচার্ডের চোখ তখনও অন্যদিকে ফেরানো—ঐজন্যেই আমার ব্যথাটা বেশী লাগত। যদি সে বুঝতে পারত অন্যায়—তাহলে কক্ষণো আমাকে ছেড়ে যেত না। কক্ষনো না—তবে বুঝবেই বা কি করে?

এমন কি বিদ্যেবুদ্ধি ছিল তার ? নিজের নামটা কোনরকমে লিখতে পারত মাত্র।

তবে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর আমি কিন্তু তাকে ঠকাতে চাই নি—পুরনো সেই নাবিক বলল—বরং সত্যিসত্যি ভেবেছিলাম যে আমাকে পেয়ে বোধহয় সে সুখী হবে। সুখেই সে ছিল—কোনো ত্রুটিই রাখতাম না আমি। আপনার সন্তানটি মারা গেলে ও'র আর একটি মেয়ে হ'ল। ভালই চলছিল সবকিছু। কিন্তু তারপর একটা সময় এল—তখন আমরা আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছি। একজনের সঙ্গে সে তার কাহিনী গল্প করেছিল—সেই লোকটাই তাকে বুঝিয়েছিল যে আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমার দাবীর প্রতি তার বিশ্বাস দেখে টিটকিরি করেছিল। তারপর থেকে আর সুখে ছিল না সুসান। কেবল কান্নাকাটি করত—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত—আর বলত আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু বাধা ছিল আমাদের সন্তান। তখন একটা লোকের পরামর্শ মত আমি তাকে ফলমাউথে একা ফেলে রেখে জাহাজে পাড়ি দিলাম। আমরা আটলান্টিক পার হয়ে ওপারে গেলে প্রচণ্ড ঝড় উঠল একদিন। তারপর সকলের ধারণা হল—আমরা সবাই জলের তোড়ে ভেসে গেছি। আমি অবশ্যি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে গিয়ে ভেসে উঠলাম। তারপর ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। ভাবলাম এসে পড়েছি যখন এখানেই থেকে যাই কারণ আমি ফিরে গেলে সুসানেরই অশান্তি। বরং আমি মরে গেছি বলে জানলে সুসান হয়তো সন্তানকে নিয়ে তার স্বামীর কাছে চলে যাবে। তাতে বাচ্চাটার পক্ষেও মঙ্গল। মাসখানেক আগে আমি দেশে ফিরে শুনলাম যেমন ভেবেছিলাম ঠিক তাইই হয়েছে। আমার মেয়েকেও সে নিয়ে চলে গেছে আপনার কাছে। তারপর ফলমাউথের লোকেরাই বলল যে সুসান মারা গেছে। কিন্তু আমার এলিজাবেথ—তার কি হ'ল ?

সে'ও মারা গেছে—হেনচার্ড একরোখার মত বলল—একথাটা জেনেছ নিশ্চয়।

চমকে উঠে সেই নাবিক ঘরের মধ্যে দু'এক পা হাঁটল। তারপর মৃদুস্বরে বলল—মরে গেছে ! তাহলে আর আমার পয়সাকড়ি দিয়ে কি হবে !

হেনচার্ড কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়তে লাগল, যেন এ ব্যাপারটা নিউসনেরই চিন্তা করার কথা, হেনচার্ডের কিছু আসে যায় না।

কোথায় তাকে মাটি দেওয়া হয়েছে ? নিউসন জিজ্ঞেস করল।

তার মা'র পাশেই। একইরকম দৃঢ়তা হেনচার্ডের কণ্ঠস্বরে।

কবে মারা গেল ?

তা বছরখানেক, কি তার বেশী হবে। বিনা দ্বিধায় বলল অপরজন। নাবিক তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। হেনচার্ড একবারও মেঝের দিক থেকে মাথা তুলে তাকায়

নি। অবশেষে নিউসন বলল—আমার এখানে আসাটাই বৃথা হয়ে গেল। অতএব যেভাবে এসেছিলাম সেইভাবেই ফিরে যাই—আর বিরক্ত করব না আপনাকে।

হেনচার্ড শুনতে পাচ্ছিল, নিউসন পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে। দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলল, আস্তে করে দরজা খুলে আবার আস্তে করে বন্ধ করে দিল—একজন হতাশ লোকের পক্ষে ঠিক যেমনটি হয়ে থাকে—কিন্তু হেনচার্ড মাথা তুলে দেখল না। জানালা দিয়ে নিউসনের ছায়া সরে গেল—চলে গেল সে।

হেনচার্ড বুঝতে পারছিল না সে কতখানি সচেতন। উঠে দাঁড়িয়ে সে আশ্চর্য হয়ে গেল, এতক্ষণ কি বলেছে ভেবে। হঠাৎ আবেগের বশে করে ফেলেছে। সম্প্রতি এলিজাবেথের প্রতি তার যে টান জন্মেছে, একাকীত্ব-হরণের সেই নতুন আশায় হেনচার্ড ভাবত এলিজাবেথকে সে আপন কন্যা ভেবে গর্ববোধ করতে পারে—আর এলিজাবেথ নিজে তো সেইরকমই জানত। ইতিমধ্যে নিউসন অভাবনীয় রূপে এসে পড়ায় হেনচার্ডের ধারণা বরং দৃঢ়তর হল—এলিজাবেথকে আরও নিজস্ব করে নিতে লোভী হয়ে পড়ল সে। তাই হঠাৎ তাকে হারানোর আশঙ্কা দেখা দেওয়ায়, ফলাফল কি হতে পারে না ভেবে, শিশুর মত সে একের পর এক মিথ্যাকথা বলে গেল। হেনচার্ড ভেবেছিল, এখুনি আরও প্রশ্ন এসে ভিড় করবে—পাঁচ মিনিটেই তার মিথ্যা আচরণ প্রকাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু এখনি তেমন কোনো প্রশ্নের উদয় হল না। প্রশ্ন যে উঠবেই তাতে সন্দেহ নেই—নিউসনের চলে যাওয়াটা সাময়িকমাত্র—শহরে খোঁজখবর করলেই সে সব জানতে পারবে—তখন অভিশাপ দিতে দিতে হেনচার্ডের শেষ সম্বলটুকু ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

হেনচার্ড তাড়াতাড়ি টুপিটা পরে নিয়ে, নিউসনের পেছন পেছন বেরিয়ে পড়ল। একটু পরেই পেছন থেকে দেখা যাচ্ছিল তাকে। বুল-স্টেক পেরিয়ে, 'কিংস আর্মস' হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিউসন। হেনচার্ড নজর রাখছিল সবকিছু। সকালে যে গাড়ীটাতে নিউসন এসেছে—সেটা এখানে দাঁড়ায় আধ ঘণ্টার মত। উল্টোদিক থেকে আসা একটা গাড়ীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে আবার রওনা দেয়। যে গাড়ীটাতে নিউসন এসেছিল, সেটা আবার যাত্রার উদ্যোগ করছে। নিউসন উঠে বসল। তার জিনিসপত্র তোলা হয়ে গেছে। একটু পরেই গাড়ীটা তাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেনচার্ডের কথা সরলভাবে বিশ্বাস করেছিল নিউসন। সে বিশ্বাস যেমন সরল, তেমনই স্বর্গীয়। তরুণ নাবিক হিসেবে ঠিক একই বিশ্বাসের জন্যে সে সুসান হেনচার্ডকে গ্রহণ করেছিল, মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে। বিশ বছর পরেও সেই একই বিশ্বাস এই পর্যটককে নিয়ন্ত্রিত করছিল, তাই হেনচার্ডের কথা শুনে সেখানে দাঁড়িয়ে

থাকতে যেন লজ্জা লাগছিল তার।

কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের বশে এই কাহিনী সাজালেও কি হেনচার্ড এলিজাবেথকে নিজের বলে ধরে রাখতে পারবে? মনে মনে হেনচার্ড বলল—বোধহয় বেশীদিন না। নিউসন নিশ্চয়ই তার পাশাপাশি যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করবে—যাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্যাস্টারব্রিজের লোক হতে পারে। অতএব হেনচার্ডের চাতুরী ধরা পড়ে যাবে।

দূরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল হেনচার্ড। ভাবছিল নিউসন হয়তো হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসবে তার সন্তানকে ফিরে পাওয়ার দাবী নিয়ে। কিন্তু কেউ এল না। তাহলে বোধহয় সে নিজের অন্তরেই চাপা দিয়েছে, আর কারো সঙ্গে আলাপ করে নি।

নিউসনের দুঃখ! এমন কি দুঃখ হতে পারে তার হেনচার্ডের তুলনায়? নিউসন যতই ভালবাসুক তার সন্তানকে, এতদিনের বিচ্ছেদে তা মিলিয়ে গেছে কবে, অথচ হেনচার্ড যে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। ইত্যাদি নানা যুক্তি খাড়া করে হেনচার্ড এই পিতা এবং সন্তানের ছাড়াছাড়িকে মনেমনে মেনে নিচ্ছিল।

বাসায় ফিরতে ফিরতে হেনচার্ড ভাবছিল, এতক্ষণে বোধহয় এলিজাবেথ চলে গেছে। ফিরে দেখল—সে যায় নি, তক্ষুণি ভেতরের ঘর থেকে বেরুচ্ছে, চোখের পাতায় তখনো ঘুম জড়ানো, বেশ যেন তাজা দেখাচ্ছে তাকে।

হাসতে হাসতে বলল এলিজাবেথ—বাবা! আমি শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। তবু ভাল—মিসেস ফারফ্রীকে স্বপ্ন দেখি নি। এত ভাবছিলাম ঐ কথা, তবু দেখলাম না। আচ্ছা বাবা! এটা খুব আশ্চর্য না, আমরা বর্তমান ঘটনা নিয়ে যতই ভাবি না কেন, স্বপ্নে তা দেখি না।

তুমি ঘুমুতে পেয়েছ জেনে ভাল লাগল। বলে হেনচার্ড কিছুটা সংশয়মিশ্রিত স্বত্ববোধের সঙ্গে তার হাত ধরল। এলিজাবেথ তাতে একটু খুশীর চমক অনুভব করল।

দু'জন একসঙ্গে খেতে বসল। এলিজাবেথের মনে তখন লুসেটার চিন্তা এসে গেছে আবার। তাদের দুজনেরই বিষণ্ণতা যেন এলিজাবেথের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেক। কারণ এলিজাবেথকে সুন্দর দেখানোর গোপন কারণটাই ছিল কোমল আত্মস্বভাব।

সম্মুখে সাজানো খাদ্যবস্তু দেখে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল এলিজাবেথ, বলল—বাবা! তুমি নিজের হাতে এতক্ষণ কষ্ট করে এই সব তৈরী করেছ, আর আমি কিনা ঘুমুচ্ছিলাম।

সে তো আমাকে রোজই করতে হয়—হেনচার্ড উত্তর দিল—তুমি চলে গেছ, সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, অতএব নিজের হাতে করা ছাড়া উপায় কি?

তোমার খুব একা লাগে বাবা, তাই না?

আহা, সে কথা আর তোমাকে বোঝাব কি করে! আমার নিজেরই দোষ! কেবলমাত্র তুমিই ছিলে কিছুদিনের জন্যে, কিন্তু তা'ও তো আর আসবে না তুমি।

বাবা! ওকথা কেন বলছ! তুমি চাইলে, আমি নিশ্চয়ই আসব।

হেনচার্ডের দৃষ্টিতে সন্দেহ প্রকাশ পাচ্ছিল। কিছুক্ষণ আগেও সে ভাবছিল, এলিজাবেথ হয়তো আবার তার মেয়ের মত তার সঙ্গে থাকতে পারে, কিন্তু এখন আর সে কথা তাকে বলা সম্ভব নয়। নিউসন যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে, তখন তার এই প্রতারণার সম্পর্কে এলিজাবেথ যা ভাববে, সেটা তার থেকে তফাতে বসেই সহ্য করা ভাল।

খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও তার সৎমেয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকল, যতক্ষণ না হেনচার্ডের রোজকার কাজে যাওয়ার সময় হয়। তারপরও উঠে চলে যাওয়ার সময় বলে গেল আবার আসবে।

ঠিক এই মুহূর্তে ও'র টানটাও যেন বৃদ্ধি পেয়েছে আমার দিকে, যেমন হয়েছে আমার বেলায়, তাহলে কি আমি বললে পরে ও এই ভাঙাচোরা ঘরে এসে থাকবে আমার সঙ্গে? কি জানি, সন্ধ্যের আগেই যদি নিউসন এসে পড়ে তো, তখন আবার ঘেন্না করতে শুরু করবে আমায়।

সারাদিন হেনচার্ড যেখানে যেখানে গেল, ঠিক এই চিন্তাটাই তার মনে ঘুরে ফিরে আসছিল বারবার। এখন আর তার সেই হঠকারী, বিদ্রোহী শ্লেষভরা মন নেই—এমন এক অন্ধকার ভার হয়ে চেপে বসে আছে যে বেঁচে থাকাটা আনন্দদায়ক দূরের কথা, অসহ্য বলে মনে হয়। তার কথা গর্ব করে বলার মত কেউ থাকবে না—এলিজাবেথও একটু পরে শুধু অপরিচিতাই নয়, তার থেকেও বিরূপ কিছুতে পরিণত হবে। সুসান, ফারফ্রী, লুসেটা, এলিজাবেথ—একের পর এক সকলেই তাকে ছেড়ে গেছে—তার নিজের দোষেই হোক, বা দুর্ভাগ্যের জন্যে। এদের ছাড়া হেনচার্ডের বেঁচে থাকার মত অন্য অবলম্বন বা ইচ্ছা ছিল না। সংগীত শিক্ষাকে যদি সে কাজে লাগাতে পারত, তবে হয়তো এ দুঃখ সয়ে যেতো। হেনচার্ডের জীবনে সংগীতের প্রভাব ছিল খুব বেশী—গভীর সুর তাকে সম্পূর্ণ অন্যলোকে পৌঁছে দিত। কিন্তু মন্দ ভাগ্যের কারণেই সে এই স্বর্গীয় আনন্দকে প্রয়োজনের সময় অনুভব করতে পারত না।

সম্মুখে বিস্তৃত সবটাই সে দেখছিল অন্ধকার—আশাব্যঞ্জক কিছুই তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক ধর্মেই তাকে তখনো তিরিশ-চল্লিশ বছর বাঁচতে হবে—তাকে দেখে টিটকিরি দেবে সবাই, বড় জোর হাহুতাশ করবে।

এই চিন্তাটাই দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক।

ক্যাস্টারব্রিজের পূর্বদিকটা মাঠ আর জলাজায়গা। মাঠের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো খাল আর নালায় জল বয়ে যায় তরতর করে। শান্ত রাত্রিতে কোনো পথিক এদিকে বেড়াতে এসে, যদি দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মিনিট—তবে অন্ধকারে অর্কেস্ট্রা শোনার মত নানা ধ্বনির ঐকতান শোনা যায়—দূর, নিকট, মাঠের নানা প্রান্ত থেকে ভেসে আসে সে শব্দসমাহার।..............কিন্তু সন্ধ্যের পরে এদিকে লোকজন বড় একটা আসে না—কারণ রাস্তাটা এগিয়ে গিয়ে ব্ল্যাকওয়াটার নামে নদীতে শেষ হয়েছে—আর রাস্তাটা বিপজ্জনকও বটে।

হেনচার্ড শহর থেকে বেরিয়ে, পাথরের সেতুটা পার হয়ে, এই নির্জন পথে পা বাড়াল। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখছিল পশ্চিম-আকাশে তখনও নিভু-নিভু আলোয় কতকগুলো ছায়া এসে পড়েছে নদীর জলে। যেখানটায় নদী খুব গভীর, সেখানে এসে দাঁড়াল হেনচার্ড। সামনে পিছনে তাকিয়ে একটি প্রাণীকেও দেখতে পেল না। কোট আর টুপি খুলে, নদীর কিনারে এসে দাঁড়াল, সামনে দুটি হাত বন্ধ করে ধরে।

সামনেই জলের দিকে তাকাতে তাকাতে হেনচার্ড দেখতে পেল, কিছু একটা যেন ভাসছে। শতাব্দীর জল বয়ে যেতে যেতে, সেখানে যেন একটা দহের মত সৃষ্টি হয়েছে—এখানেই হেনচার্ড নিজের অন্তিম শয্যা রচনা করবে বলে ভেবেছিল। কিনারের ছায়া এসে পড়ায় প্রথমে সে বস্তুটাকে চিনতে পারছিল না—কিন্তু আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে উঠল একটা মানুষের শরীর—স্পষ্ট এবং শক্ত—ভাসছে জলে।

গোল হয়ে স্রোতটা পাক খাচ্ছিল সেই দহের জলে—কিছুক্ষণ পরে বস্তুটা ভাসতে ভাসতে তার চোখের সামনে এসে পড়ল—আতঙ্কে চোখ মেলে দেখল হেনচার্ড—ওটা সে নিজেই। শুধু যে তার চেহারার সঙ্গে মিল আছে তাই নয়—হুবহু তার মত—যেন সে'ই মরে গিয়ে দহের জলে ভাসছে।

দুঃখী মানুষটির অন্তরে অতিপ্রাকৃত একটা অনুভূতি কাজ করত ভয়ানকভাবে। সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু একটা দৃশ্য দেখার মত ভয়ে সিঁটিয়ে গেল সে। দু'হাতে চোখ ঢেকে মাথা নীচু করল। জলের দিকে ফের না তাকিয়ে কোনরকমে কোট আর টুপিটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল সেখান থেকে।

খানিকক্ষণ পরেই সে দেখতে পেল নিজের বাসার সামনে এসে গেছে। এলিজাবেথকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল হেনচার্ড। এলিজাবেথ এগিয়ে এল, কথা বলল, আগের মতই 'বাবা' বলে ডাকল। নিউসন তাহলে ফিরে

আসে নি এখনও পর্য্যন্ত।

তোমাকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল সকালবেলা—বলল এলিজাবেথ—তাই আবার দেখতে এলাম। আমার নিজেরও খুব দুঃখ লাগছে। সব কিছুই, সমস্ত মানুষই যেন তোমার বিরুদ্ধে বলে মনে হচ্ছে—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পারছি।

এই মেয়েটি সব কিছু এমনভাবে ভুলিয়ে দিতে পারে! তবু যাবতীয় যন্ত্রণা সে হরণ করতে পারে নি।

হেনচার্ড তাকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা এলিজাবেথ! তন্ত্র-মন্ত্র কি আজো খাটে. বলতে পারো? আমি বেশী পড়াশুনো শিখি নি। অনেক কিছু জানি না, অথচ জানতে ইচ্ছা করে। সারাজীবনই এই শেখার চেষ্টা করে গেলাম। কিন্তু যত বোঝার চেষ্টা করেছি, ততই যেন আরও বোকা হয়ে গেছি।

তন্ত্রমন্ত্র আজকাল আর আছে বলে বিশ্বাস হয় না। উত্তর দিল এলিজাবেথ।

মানে ধরো, খুব তীব্র ইচ্ছার পথেও কখনো হঠাৎ কিছু বাধা এসে উপস্থিত হয় না? সরাসরি বোধহয় তেমন কিছু ঘটে না। কিন্তু—তুমি যাবে আমার সঙ্গে—এই একটুখানি, তাহলে যা বোঝাতে চাচ্ছি, তোমাকে দেখাতে পারতাম।

এলিজাবেথ রাজী হল। হেনচার্ড তাকে নিয়ে চলল সেই দহের দিকে। তার হাঁটাচলায় কি এক অস্থিরতা—যেন এক অদৃশ্য ছায়া তাকে ঘিরে আছে আর কষ্ট দিচ্ছে। এলিজাবেথ হয়তো লুসেটা সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে পারত—কিন্তু হেনচার্ডকে বিরক্ত করতে সাহস হ'ল না। দহের কাছে পৌঁছে হেনচার্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। এলিজাবেথকে বলল এগিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে তাকাতে তারপর কি দেখল তাকে বলতে।

এলিজাবেথ এগিয়ে গিয়ে দেখে এসে বলল—কিচ্ছু না তো।

আবার যাও—বলল হেনচার্ড—ভাল করে তাকিয়ে দেখো।

দ্বিতীয়বার গেল এলিজাবেথ। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, কিছু একটা যেন গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ভাসছে বলে মনে হল। কিন্তু সেটা যে কি তা বুঝতে পারে নি হয়তো পুরনো জামা কাপড় হতে পারে।

আমার বলে মনে হচ্ছিল কি? হেনচার্ড জিজ্ঞাসা করল।

হতে পারে, তবে তাই বা কি করে হয়! বাবা চল, আমরা চলে যাই।

আবার দেখে এসো—তারপর আমরা চলে যাব।

আবার গেল এলিজাবেথ। হেনচার্ড দেখছিল। মাথা একেবারে নিচু করে করে জলের কাছে নিয়ে গেল সে—তারপর কিছু একটা দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে এল তার পাশে।

এবার কি মনে হল? বলল হেনচার্ড।

চলো বাড়ী যাই।

না কি ভাসতে দেখলে, বলো সেটা।

সেই খড়ের মূর্তিটা—তাড়াতাড়ি উত্তর দিল এলিজাবেথ—ওরা নিশ্চয় ধরা পড়ার ভয়ে মূর্তিটা নদীর জলে ফেলে দিয়েছিল—সেটাই ভাসতে ভাসতে ঐ দহে গিয়ে আটকেছে।

ও! তাই হবে। ওটা আমার মূর্তি। কিন্তু একটা কেন শুধু? আর একটা কোথায় গেল? ঐ কেলেঙ্কারীর জন্যেই একজন মরে গেল—কিন্তু আমি বেঁচে রইলাম এখনও!

আস্তে আস্তে তারা শহরের দিকে ফিরতে লাগল। এলিজাবেথ এই কথা ক'টাই ভাবছিল বারবার—আমি বেঁচে রইলাম এখনও—ভাবতে ভাবতে অর্থটা বুঝতে পেরে সে বলল—বাবা! আমি তোমাকে এভাবে একা রেখে যাব না। কেঁদে ফেলল সে—বরং আমি তোমার কাছে থাকি আগের মত সেবা যত্ন করি। তুমি গরীব হয়ে গেছ—তাতে কি? সকালবেলাতেই আমি চলে আসতাম কিন্তু তুমি তো কিছু বললে না।

তুমি থাকবে আমার কাছে? হেনচার্ড তিক্ত অনুভূতিতে ভেঙে পড়ল—আমার সঙ্গে ঠাট্টা কোর না এলিজাবেথ। ইচ্ছে করো তো থাকতে পারো।

হ্যাঁ আমি থাকব। এলিজাবেথ বলল।

আগেকার সে সব দুর্ব্যবহার তুমি ভুলবে কি করে? কক্ষনো ভুলতে পারবে না।

কবে সে সব ভুলে গেছি। ও'কথা আর তুলো না।

এইভাবে তাকে আশ্বস্ত করল এলিজাবেথ। তারপরে একত্রে থাকার পরিকল্পনা করে তারা দু'জনেই বাড়ী চলে গেল। অনেকদিন পরে হেনচার্ড অযত্নে বর্দ্ধিত দাড়ি-গোঁফ কামাল, পরিষ্কার জামা পরল, মাথা আঁচড়াল ভাল করে। তারপর থেকে আগের মত মানুষ হয়ে উঠল আবার।

এলিজাবেথ যেমন বলেছিল পরের দিন সকালবেলা সেই সত্যই প্রকাশ পেল। একটা রাখাল আবিষ্কার করল সেই কুশপুত্তলিকা। লুসেটার মূর্তিটাও সেই নদীতেই পাওয়া গেল আর একটু এগিয়ে। কিন্তু তা নিয়ে বেশী জানাজানি হল না—গোপনে মূর্তিদুটো নষ্ট করে ফেলা হল।

রহস্যটার যতই বাস্তব সমাধান হয়ে যাক না কেন, হেনচার্ড কিন্তু মন থেকে সেই হঠাৎ ভূত-দেখার কথা ভুলতে পারে না। এলিজাবেথ তাকে প্রায়ই বলতে শুনত—আমার মত হতচ্ছাড়া নাস্তিক আর কে আছে—তবু যেন মনে হয় কোন অদৃশ্য শক্তির হাতে বাঁধা পড়ে আছি।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

কালের অগ্রগতিতে সেই ঘটনা যতই পুরনো হয়ে গেল ততই হেনচার্ডের সেই আবেগজাত ধারণা মিলিয়ে যেতে লাগল যে সে কোনও অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত। বরং নিউসনের ছায়াই তার মনে ঘোরাফেরা করত বারবার। ভাবত সে ফিরে আসবে নিশ্চিত।

কিন্তু নিউসন আর এল না। গীর্জার প্রাঙ্গনে লুসেটার শয্যা রচনা করে ক্যাস্টারব্রিজের লোক তাদের কর্তব্য সম্পাদন করল। তারপর আর তাকে মনে রাখার দরকার হয় নি। এলিজাবেথ কিন্তু নিজেকে হেনচার্ডের মেয়ে বলে বিশ্বাস করে যাচ্ছিল—আর এখন তো এক বাড়ীতেই থাকছিল তারা। শেষমেশ নিউসনের ফিরে আসার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না বোধহয়।

শোকাহত ফারফ্রী যথা সময়ে লুসেটার অসুস্থতা এবং মৃত্যুর অনিবার্য্য কারণটা কি তা জানতে পেল। তার প্রথম প্রতিক্রিয়াই হল এই চক্রান্তকারীদের শাস্তি দেওয়া দরকার—সেটা আইনের শাসন বজায় রাখতে অপরিহার্য্য। ফারফ্রী ঠিক করল লুসেটার অন্ত্যেষ্টির কাজকর্ম শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এখন সেই সময় এসে পড়াতে সে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। ব্যাপারটার পরিণতি যতই দুঃখাবহ হোক না কেন সাধারণ লোকগুলো হাস্যপরিহাসের জন্যে যে কাণ্ডের আয়োজন করেছিল, তার ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চয়ই অত ভেবে দেখে নি। শহরের যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি—প্রশাসনের যারা মাথা—তাদের নিয়ে হাসি-মস্করা করতে সবাই ভালবাসে। ফারফ্রী বিবেচনা করে দেখল, এই মজার জন্যেই লোকগুলো এমন কাণ্ড করছে—ফারফ্রী কিন্তু জোপের উস্কানি সম্পর্কে জানত না কিছুই। তাছাড়া, লুসেটা মৃত্যুর আগে সব কিছুই তাকে খুলে বলেছিল—কাজেই সেই ইতিহাস নিয়ে আরও ঘাঁটা-ঘাঁটি লুসেটার পক্ষে, হেনচার্ডের পক্ষে, বা তার নিজের দিক দিয়েও কোনোমতে বাঞ্ছনীয় ছিল না। মৃতার স্মৃতির প্রতি সত্যিকার সম্মান দেখাতে হলে, ব্যাপারটাকে অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা বলে মেনে নেওয়াই সঙ্গত মনে করল ফারফ্রী—এটাই যথার্থ দর্শন।

হেনচার্ড আর ফারফ্রী পরস্পরকে আবার মানিয়ে নিয়েছিল। ফারফ্রীর নেতৃত্বে টাউন কাউন্সিলের চেষ্টায় হেনচার্ডকে নতুন কারবার শুরু করার মত একটা বীজ আর চারাগাছের দোকান করে দেওয়া হল। হেনচার্ডও এলিজাবেথের মুখ চেয়ে

নিজের অহঙ্কার দমন করে এই সাহায্য গ্রহণ করল। শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে চিন্তা হলে হেনচার্ড কখনই এই উপকার গ্রহণ করত না। কিন্তু মেয়েটির প্রতি মমতাই এখন তার বেঁচে থাকার মূল আকর্ষণ—তাই তার জন্যেই নিজের অহঙ্কারকে বিনয়ের পোষাক দিয়ে মুড়তে হল।

প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় হেনচার্ড এলিজাবেথের মনের সুপ্ত ইচ্ছাটাকে আগে থেকে আঁচ করার চেষ্টা করত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে নিউসন যে কখনও ফিরে এসে তার কন্যাকে দাবী করবে আবার, এমন ধারণা করার কোনো যুক্তি ছিল না। লোকটা ভবঘুরে—তাছাড়া বিদেশী—বহুবছর ধরে মেয়েকে দেখেনি—কাজেই মেয়ের প্রতি তার আকর্ষণটা ক্ষীণ হওয়াই সম্ভব। নিজের বিবেককে প্রবোধ দেওয়ার জন্যে হেনচার্ড ভাবত বারবার, যে মিথ্যেকথা সে বলেছিল সেদিন, সেটাকে ইচ্ছাকৃত না বলে বরং আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বলে মনে করা উচিত। তাছাড়া একথাও ঠিক যে কোনো নিউসনই এলিজাবেথকে তার মত ভালবাসতে পারে না বা হাসিমুখে জীবন থাকতে সে যতটা করতে রাজী তা'ও কেউ করবে না।

এই ভাবেই নতুন দোকানে তাদের জীবন কেটে যাচ্ছিল। বছরের বাকি দিনগুলোতে বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত করার মত কিছু ঘটল না। বাইরে বিশেষ একটা যাওয়ার দরকার হত না—হাটের দিন তো নয়ই—তাই ডোনাল্ড ফারফ্রীর সঙ্গে কালে-ভদ্রেও দেখা হত কি না সন্দেহ। তবে ফারফ্রী তার সাধারণ চালচলন বজায় রেখেছিল—অন্য ব্যবসাদারদের সঙ্গে যান্ত্রিক হাসি বা দরদস্তুর—সবই স্বাভাবিক হয়ে আসছিল যেমন সব শোকাহত ব্যক্তিদের বেলাতেই হয়ে থাকে কিছুদিন গেলে।

সময় কঠিন সূত্রধর—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফারফ্রী বুঝতে পারল, লুসেটা কি ছিল আর কি ছিল না। বিশ্বস্ততা এবং প্রেম কোনো কোনো মানুষের অন্তরে এমন দুঃখের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে যে প্রিয়জনের বিরহে তাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন মনে হয়—কিন্তু ফারফ্রী তেমন মানুষ ছিল না। তার চরিত্রের চাঞ্চল্য, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং দ্রুত নিষ্পত্তি করার স্বভাবের জন্য এই মৃত্যু এবং শূন্যতার জগৎ থেকে বেরিয়ে এল ফারফ্রী—সে বরং ভাবতে লাগল যে লুসেটার মৃত্যুতে অন্য এক করুণতর পরিণতির হাত থেকে সে রেহাই পেয়ে গেছে। লুসেটার প্রাক্তন কাহিনী একদিন না একদিন নিশ্চিতই প্রকাশ হয়ে পড়ত—তখন তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করার কোনো সুখের সম্ভাবনা থাকত কি?

কিন্তু তবুও লুসেটার স্মৃতি তার মনে জাগরূক ছিল সর্বদা। লুসেটার দুর্বলতাগুলো মনে পড়লে মৃদু সমালোচনা করত সে মনে মনে বরং তার সুখের স্মৃতিটাই [illegible]

অপরাধকে ঢেকে রাখত।

বছর খানেকের মধ্যেই হেনচার্ডের ছোট্ট একটুখানি বীজের দোকানে খুব বেচা-কেনা হতে লাগল। শহরের একপ্রান্তে এই দোকান নিয়ে বাবা আর মেয়ের দিন কাটছিল বেশ সুখে। এই সময়টাতে এলিজাবেথকে দেখে মনে হত, বাইরেটা তার খুব শান্ত হলেও, অন্তরে বিশেষ কর্মব্যস্ততা চলছে। সপ্তাহে দু'তিন দিন সে গাঁয়ের মধ্যে বেড়াতে যায় অনেকদূর—প্রায়ই বাডমাউথের দিকে। হেনচার্ডের কেমন যেন মনে হয়, কোন কোন দিন এইরকম বেড়িয়ে আসার পরে এলিজাবেথকে স্নেহশীলা দেখানোর থেকে বরং আত্মমগ্ন, সংযত দেখায়। হেনচার্ড কষ্ট পায় মনে মনে। অন্যান্য দুঃখের সঙ্গে এই আক্ষেপ যুক্ত হয় একেকদিন, যে তারই বকাবকির জন্যে এলিজাবেথের আর সে উষ্ণতা নেই।

এখন এলিজাবেথ অনেকটা তার নিজের মতেই চলে। চলা, ফেরা, বেচা, কেনা সব কিছুতে তার কথাই যেন শেষ কথা।

হেনচার্ড একদিন খুব বিনীতভাবে বললে—এলিজাবেথ! তোমার দস্তানাটা নতুন নাকি?

হ্যাঁ, কিনলাম এটা। এলিজাবেথ উত্তর দিল।

পাশের টেবিলেই রাখা দস্তানাটাকে আবার দেখল হেনচার্ড। ওপরের পশমগুলো খুব চকচকে বাদামী রঙের। হেনচার্ড এ সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ না হলেও বুঝতে পারল, এলিজাবেথের পক্ষে জিনিসটা খুবই দামী।

দামটা বোধহয় খুব বেশী, তাই না? আন্দাজ করল হেনচার্ড।

আমার হিসেবমত বেশীই—শান্তভাবে উত্তর দিল এলিজাবেথ—দেখতে বেশী ভাল না কিন্তু।

নাঃ, তা নয়। খাঁচায়-পোরা সিংহের মত উত্তর দিল হেনচার্ড—তবু ভাবছিল এলিজাবেথ যেন একটুও ক্ষুন্ন না হয়।

আরও কিছুদিন পরে, বসন্তকাল এসে পড়লে, হেনচার্ড একদিন এলিজাবেথের শোয়ার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। হেনচার্ডের মনে পড়ে গেল, আরও একদিন সে এইভাবে এলিজাবেথের ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখেছিল, যেদিন তার অপছন্দ আর রূঢ় ব্যবহারের জন্যে এলিজাবেথ কর্ণ ষ্ট্রীটের সেই বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এখনকার ঘরটা সে তুলনায় অনেক ছোট, কিন্তু হেনচার্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, সারাটা ঘর বইয়ে ঠাসা। আসবাবপত্রের তুলনায় বইয়ের সংখ্যা এবং গুরুত্ব অনেক বেশী। অনেকগুলোই হয়তো সম্প্রতি কেনা হয়েছে। এলিজাবেথ স্বাধীনমতে সব কেনাকাটা করলেও সে যে এইভাবে তার আন্তরিক বাসনা

চরিতার্থ করে একথা হেনচার্ডের জানা ছিল না। হেনচার্ড ভাবত সামান্য আয়ের তুলনায় এলিজাবেথ বড্ড বেশী খরচা করে। কিন্তু এখন এইসব দেখে অনুশোচনা হল, ভাবল একদিন এই নিয়ে কথা বলবে এলিজাবেথের সঙ্গে। কিন্তু সে সুযোগ আসার আগেই এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেল যে ঘটনার গতি বইতে শুরু করল অন্যখাতে।

বীজের ব্যবসায় তেজী সময়টা কেটে গেছে। বাজার এখন মন্দা। ফসল-কাটার সময় এসে পড়েছে। তাই ক্যাস্টারব্রিজের রাস্তায় রাস্তায় এখন রঙবেরঙের গাড়ীর ভিড়—আর কাস্তে, হেঁসো জাতীয় নানা অস্ত্রের ছড়াছড়ি। হেনচার্ডের এটা স্বভাববিরুদ্ধ হলেও, একদিন শনিবারের বিকেলবেলা সে বাজারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ—এক অদ্ভুৎ অনুভূতি হচ্ছিল তার—যে এখানেই একদা সে সিংহের মত বিচরণ করেছে। খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে ফারফ্রী— 'কর্ণ এক্সচেঞ্জে'র দরজার সামনেই—অদূরেই কোনো একটা জিনিস একমনে লক্ষ্য করে দেখছে।

হেনচার্ডও তাকাল সেইদিকে। দেখল, লক্ষ্যবস্তুটা কোনও খামারমালিক বা তার নমুনাশস্য নয়, সে তারই সৎ-কন্যা। এলিজাবেথ তখন সবে একটা দোকান থেকে বেরুচ্ছে। এলিজাবেথের কিন্তু এদিকে নজর ছিল না। অন্য মেয়েদের তুলনায় এটা তার দুর্ভাগ্য। সাধারণতঃ তরুণী মেয়েদের বেলায়, কাছাকাছি কোথাও গুণমুগ্ধ পুরুষমানুষ থাকলেই, দেবী জুনোর বাহনের মত চোখ মেলে পেখম তুলে ধরে তারা।

হেনচার্ড চলে গেল, ভাবল, ঠিক এই মুহূর্তে এলিজাবেথের দিকে ফারফ্রীর অমনভাবে তাকিয়ে থাকার মধ্যে বোধহয় তেমন তাৎপর্য্যপূর্ণ কিছু নেই। তবু একথা তার মনে ছিল যে, এই লোকটিই একদা তার মেয়ের জন্যে আগ্রহ দেখিয়েছিল। সে কি একটা সাময়িক টান? এই কথা মনে পড়তেই, হেনচার্ডের আপন খেয়াল জেগে উঠল—যে খেয়াল তাকে সেই শুরু থেকে চালিয়ে এনে আজকে এই পরিস্থিতিতে দাঁড় করিয়েছে। কর্মঠ উন্নতিকামী ডোনাল্ডের সাথে এলিজাবেথের মিলন যে তার পক্ষে সুখের হবে, এ কথা না ভেবে, হেনচার্ড এই সম্ভাবনাকে ঘৃণা করতে লাগল।

একসময় হয়তো এমন বিরোধিতা কাজেকর্মে প্রকাশ হয়ে পড়ত সহজেই—কিন্তু এখন হেনচার্ড আর সেই আগের হেনচার্ড নেই। অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতই এ ব্যাপারেও এলিজাবেথের ইচ্ছাকে প্রশ্নাতীত বলে মেনে নিতে শিক্ষা দিয়েছিল সে নিজেকে। হেনচার্ড ভয় পেত পাছে কোনো বিরুদ্ধ কথা বলে সে বহু যত্নে ফেরৎ পাওয়া এলিজাবেথের শ্রদ্ধার জগৎ থেকে উৎপাটিত হয়ে যায়—তার থেকে বরং এই

অনুভূতি বজায় রেখে দূরে সরে যাওয়াই ভাল—অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে কাছে থাকার থেকে।

কিন্তু এই ছাড়াছাড়ির চিন্তাতেই যেন তার গায়ে জ্বর এসে যেত। সন্ধ্যেবেলা রহস্যমাখা অবিচলতার সঙ্গে সে বলল—

এলিজাবেথ! আজ তোমার সঙ্গে মিঃ ফারফ্রীর দেখা হয়েছে নাকি?

প্রশ্নটা শুনে এলিজাবেথ চমকে উঠল, কিছু বুঝতে না পেরেই উত্তর দিল—না তো।

ও, আচ্ছা আচ্ছা না, মানে, আমরা দুজনেই যখন বাইরে গিয়েছিলাম তখন ও'কে রাস্তায় দেখলাম কিনা তাই।—হেনচার্ড ভাবছিল, এলিজাবেথের এই চমকে ওঠাটা সন্দেহ করার পক্ষে যথেষ্ট কিনা। আজকাল সে যে অনেক দূর দূর বেড়াতে যায়, অথবা ঘর ভর্তি তার নতুন বই—এসবের সঙ্গে ঐ যুবকটির কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। এলিজাবেথ আর কিছু বলল না। চুপ করে থাকলে পাছে এলিজাবেথের মনে অন্য কোনো ধারণার সৃষ্টি হয়, তাই হেনচার্ড অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল কথা।

মূলতঃ হেনচার্ড ছিল এমন ধাতুতে তৈরী, যে ভালই হোক আর মন্দই হোক, কোনো কাজই তার পক্ষে চুপিচুপি করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভালবাসার এমনই নীরব করে দেওয়ার শক্তি রয়েছে—যে এলিজাবেথের স্নেহের কাছে ধরা দেওয়ার পর থেকে হেনচার্ডের স্বভাবটাই গেছে পাল্টে। মাঝে মাঝে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ভাবে এলিজাবেথের অমুক কাজের বা অমুক কথার কী অর্থ থাকতে পারে—কিন্তু আগে, এসব প্রশ্নের সমাধান করে দিত সে এককথায়। এরপর থেকে হেনচার্ড এলিজাবেথের চলাফেরার দিকে আরও মন দিয়ে নজর রাখতে লাগল—ফারফ্রীর জন্যে সে এই স্নেহ-সম্পর্কের থেকে বঞ্চিত হোক এটা কখনই তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

এলিজাবেথ স্বভাবতঃই কিছুটা চুপচাপ থাকে, এছাড়া তার মধ্যে আর কোনো লুকোচুরি ছিল না। মাঝেমাঝে ডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে কথাবার্তা বলত। বাডমাউথের দিকে বেড়াতে যাওয়ার অন্য যে কারণই থাকুক না কেন, মাঝেমাঝেই ফেরার পথে তার সঙ্গে ফারফ্রীর দেখা হয়ে যেত। ফারফ্রী হয়তো কর্ণস্ট্রীট থেকে এসে দাঁড়াত, বলত, বীজের খোসা ইত্যাদি উড়িয়ে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছে—ইত্যাদি। একদিন হেনচার্ড সেটা লক্ষ্য করল, রিং এর পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠল তীব্র ক্রোধের চিহ্ন।

ও'কেও আমার থেকে কেড়ে নেবে! মনে মনে বলল হেনচার্ড—সে অধিকার ও'র আছে। যাক্ আমি কিছু বলব না।

প্রকৃতপক্ষে এই দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে দেখা হওয়াটা হেনচার্ডের মনঃকষ্ট সৃষ্টি করার মত কোনো ব্যাপার ছিল না। সেকথা হেনচার্ড বুঝতে পারত, যদি নিম্নোক্ত কথোপকথন শুনতে পেত সে—

ফারফ্রী—মিস্ হেনচার্ড! এই রাস্তায় বেড়াতে তোমার ভাল লাগে বোধহয়—তাই না? (থেমে থেমে আন্দোলিত স্বরে, মধুমাখা দৃষ্টিতে এলিজাবেথকে দেখতে দেখতে বলল ফারফ্রী)।

এলিজাবেথ—হ্যাঁ, আজকাল আমি এই দিকটাতেই বেড়াই, বিশেষ কোনও কারণ নেই।

ফারফ্রী—কিন্তু সেটা আর কারও পক্ষে কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এলিজাবেথ (লজ্জায় লাল হয়ে)—তেমন কিছু তো জানি না। আমি যাই, রোজই একবার সমুদ্দুর দেখতে ইচ্ছা হয়, তাই।

ফারফ্রী—গোপন কোনো ব্যাপার নাকি?

এলিজাবেথ (অনিচ্ছুকভাবে)—হ্যাঁ।

ফারফ্রী (তার দেশীয় গীতির বেদনা মিশিয়ে)—ও! কিন্তু গোপন কিছুতে ভাল হয় কিনা সন্দেহ! এক গোপনীয়তা আমার জীবনে অন্ধকার ছায়া ফেলেছে—তুমিও জান সেটা কি।

এলিজাবেথ স্বীকার করল সে জানে, কিন্তু সমুদ্র কেন তাকে আকর্ষণ করে সে কথা কিছু বলল না। নিজেও সে পুরোপুরি বুঝতে পারত না। কারণটা বোধহয় এই যে, শৈশবের স্মৃতি ছাড়াও সে যে এক নাবিকের সন্তান, একথা সে জানত না।

এলিজাবেথ লজ্জিত ভাবে বলল—আপনার নতুন বইগুলোর জন্যে ধন্যবাদ, মিঃ ফারফ্রী! অতগুলো বোধহয় আমার নেওয়া ঠিক নয়।

ও! ঠিক নয় কেন? তোমার নিজের যত না পেতে ভাল লাগে তার থেকে তোমার জন্যে আনতে ভাল লাগে আমার।

সে হয় না।

হাঁটতে হাঁটতে তারা শহরের কাছে পৌঁছে গেল। সেখান থেকে দুজনের রাস্তা পৃথক হয়ে গেল।

হেনচার্ড প্রতিজ্ঞা করেছিল এদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে বা তাদের স্বচ্ছন্দ গতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এলিজাবেথকে হারান'ই যদি তার কপালে থাকে তো সেটাই মেনে নেবে। তাদের দুজনের মধ্যে যদি বিয়ে হয়, তো সেখানে সে

নিজের করণীয় কিছু দেখছিল না। ফারফ্রী বড়জোর তাকে বিদ্রুপের সঙ্গে গ্রহণ করবে—শুধু তার অতীত ব্যবহারের জন্যেই নয়, বর্তমান দারিদ্রের জন্যেও বটে। অতএব এলিজাবেথের স্নেহ ভালবাসাও সে হারাবে এবং শেষজীবনটা কাটবে তার নির্বান্ধব একাকীত্বের মধ্যে।

এই রকম একটা সম্ভাবনার কথা মনে রেখে সে সতর্ক নজর না রেখে পারছিল না। প্রকৃতপক্ষে, এলিজাবেথের প্রতি নজর রাখার কিছুটা দায়িত্বও রয়েছে। সপ্তাহের কোন কোন দিনে তাদের দুজনের দেখা হওয়াটা যেন আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অবশেষে হাতে হাতে প্রমাণ পেয়ে গেল হেনচার্ড। একদিন একটা দেওয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করল তাদের দুজনের মিলন-দৃশ্য। ফারফ্রী এলিজাবেথকে 'প্রিয়তমে এলিজাবেথ' বলে সম্বোধন করল, তারপর চুমু খেল—আর মেয়েটি চট করে পিছন ফিরে দেখে নিল কারও চোখে পড়ে গেছে কিনা।

তারপর তারা চলে গেলে, হেনচার্ড ভগ্নহৃদয়ে শহরে ফিরে এল। তাদের দু'জনের মিলনের সম্ভাবনায় আসল সমস্যাটা উঁকি দিচ্ছিল এইবার। ফারফ্রী এবং এলিজাবেথ দু'জনেই এলিজাবেথকে হেনচার্ডের মেয়ে বলে জানে। সেকথা হেনচার্ড নিজেই যখন বিশ্বাস করত, তখন দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছে। কাজেই ফারফ্রী তাকে শ্বশুর হিসাবে মানিয়ে নিতে আপত্তি হয়তো করবে না, কিন্তু একদিন প্রতারণা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন ফারফ্রীর প্রভাবেই এই মেয়েটি ধীরে ধীরে তার থেকে দূরে সরে যাবে—তারপর তাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে।

ঐ ছেলেটি ছাড়া অন্য কোনও পুরুষকে যদি এলিজাবেথ তার হৃদয় দান করত, তবে হেনচার্ডের অসুখী হওয়ার কারণ ছিল না কারণ তখন এই প্রতারণা বা ধরা পড়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠত না।

মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বাইরের ঘর আছে। সেখানে যত রকমের অবাঞ্ছিত অশোভন এবং অনিচ্ছাকৃত চিন্তা মাঝেমাঝে ঘোরাফেরা করে, তারপর জোর করে তাদের দূর করে দিতে হয়। হেনচার্ডের মাথায় এমনি একটা চিন্তা খেলে গেল।

আচ্ছা এখন যদি সে ফারফ্রীকে জানিয়ে দেয় যে তার বাগদত্তা আদৌ মাইকেল হেনচার্ডের সন্তান নয়—আইনতঃ বলতে গেলে জারজ—তাহলে এই প্রতিষ্ঠাকামী নেতৃস্থানীয় নাগরিক ভদ্রলোকটি কেমন ভাবে নেবে, নিজেকেই বা কতখানি সংশোধন করবে? হয়তো এলিজাবেথকে তখন সে ত্যাগ করতে পারে, তাহলে আবার মেয়েটি তার সৎ-পিতার কন্যা হয়ে থাকবে।

ভয়ে কেঁপে উঠল হেনচার্ড, মুখে বলল—হায় ভগবান! এমন যেন না হয়। কেন

এইসব কুচিন্তা আসে! এত চেষ্টা করি তা'ও শয়তানকে আমি তাড়াতে পারি না মন থেকে?

॥ তেতাল্লিশ ॥

হেনচার্ড যেটা আগেই টের পেয়েছিল, আর কিছুদিন গেলে সেদিকে চোখ পড়ল সবার। এত মেয়ে থাকতে দেউলিয়া হেনচার্ডের সৎ-মেয়েটার সাথে মিঃ ফারফ্রী ঘোরাফেরা করে—এ ব্যাপারটা শহরের সর্বত্র আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। হৃদয়ের যোগ বোঝাতে অতিব্যবহৃত সেই শব্দটিও উল্লেখিত হতে লাগল এদের সম্পর্ক বিষয়ে আর ক্যাস্টারব্রিজের ডাকসাইটে সুন্দরীদের মধ্যে উনিশজনের আশা-ভরসায় ছাই পড়ল। প্রতিটা সুন্দরীই ভাবত এই উঠতি বণিক-কাউন্সিলরকে একমাত্র সেই সুখী করতে পারে। কিন্তু এখন তারা হতাশ হয়ে ফারফ্রী যে গীর্জায় যেত সেখানে যাওয়া ছেড়ে দিল, ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল, মাঝেমাঝে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তাকে নেমন্তন্ন করা বন্ধ করে দিল—সোজা কথায় বলতে গেলে, তারা তাদের স্বাভাবিক আচরণ ফিরে পেল।

কিন্তু ফারফ্রীর এই পছন্দ বোধহয় অবিমিশ্র সুখের কারণ হল একমাত্র তার দার্শনিক গুণমুগ্ধদের কাছে যাদের মধ্যে লংওয়েজ, ক্রিষ্টোফার কোণী, বিলি উইলিস আর মিঃ বাজফোর্ড এর নাম করা যেতে পারে। বছরকয়েক আগে, 'থ্রী মেরিনার্সে' এই যুবক এবং যুবতীর প্রথম পরিচয়ের সাদামাটা দিনগুলিতে ক্যাস্টারব্রিজের মঞ্চে তাদের প্রথম আবির্ভাবের সময় থেকেই, এদের সম্পর্কে আগ্রহী এই বন্ধুরা। একদিন সন্ধ্যেবেলার আসরে মিসেস ষ্টানিজ যখন বিস্ময় প্রকাশ করল যে মিঃ ফারফ্রীর মত 'শহরের মাথা' একজন ভদ্রলোক অমন একটি মেয়েকে কি বলে পছন্দ করল, কোণী তীব্র আপত্তি জানাল একথায়।

না, না এতে অবাক হওয়ার কি আছে! আমার তো মনে হয়—মেয়েটিই ওকে বাধ্য করেছে ভালবাসতে। অত্যন্ত গুণী মেয়ে। ও'র প্রথম বৌটা আদপেই ও'র যোগ্য ছিল না। বরং এখনই ও'র পক্ষে ভাল হবে। তাছাড়া, যে বৌ মরে গেছে তার জন্যে শ্বেতপাথরের স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে দিয়েছে, যথেষ্ট কান্নাকাটি করেছে—আবার কি! এখন তো বলতেই পারে—এই মেয়েটিকেই আমি প্রথমে চিনতাম, জীবন-সঙ্গিনী হওয়ার পক্ষে এই উপযুক্ত—এ ছাড়া আর কোনো বিশ্বস্ত মহিলাকে-

আমি দেখছি না।

এই ধরণের আলাপ-আলোচনা হতে লাগল মেরিনার্স-এ, তাই বলে এমন বাড়াবাড়ি কিছু বলাটা ঠিক হবে না যে বিরাট একটা হৈচৈ পড়ে গেল। সেটা বলতে পারলে অবশ্যি বেচারী নায়িকাকে অনেকখানি গুরুত্ব দেওয়া যেত। তবে সত্যিকথাটা হল এই যে, ক্যাস্টারব্রিজ শহর (সেই উনিশজন সুন্দরী সহ) সংবাদটা শুনে যেন নড়েচড়ে উঠল, মাথা উঁচু করে দেখল, তারপর আবার কাজেকর্মে হাত দিল। পানীয় তৈরী করা, সন্তান পালন আর মৃতদের গোর দেওয়া কিছুই বাদ গেল না। ফারফ্রী নিজের সংসার নিয়ে কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না।

এলিজাবেথ নিজে বা ফারফ্রী, দুজনের কেউই হেনচার্ডকে ঘুণাক্ষরে কিছু জানায় নি। এই গোপনীয়তা লক্ষ্য করে হেনচার্ড ভাবল তার অতীতের মতামত চিন্তা করে এরা কিছু জানাতে ভয় পাচ্ছে, মূর্তিমান এক বাধা বলে মনে করছে, যাকে সরিয়ে দিতে পারলে তারা বাঁচে। সমাজ-সংসার বিষয়ে হেনচার্ডের বিরক্তি চরমে পৌঁছেছিল। এখন এই চিন্তা এমন গভীরভাবে চেপে বসল তার মনে, যে দিনে দিনে মানুষের সামনে, বিশেষ করে এলিজাবেথের সামনে উপস্থিত হওয়ার প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা তার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। হেনচার্ডের শরীর ভেঙে পড়ল, বিষণ্নমনে কি যেন ভাবে সর্বদা। ইচ্ছে হয় যেন কোথাও পালিয়ে যায়। জীবনে আর কোনদিন, যারা তাকে চায় না, তাদেরকে যেন মুখ দেখাতে না হয়।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে তার এ ধারনা ভুল। এলিজাবেথের বিয়ের জন্যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাওয়ার আদৌ কোনও প্রয়োজন নেই—তাহলে?

হেনচার্ডের মনে বিকল্প একটা চিন্তা দেখা দিল। এমন যদি হয় যে, বাড়ীর পেছন দিককার একখানা ঘরে সে নখদন্তহীন সিংহের মত কোনরকমে দিনযাপন করে—যে বাড়ীর গৃহকর্ত্রী হবে এলিজাবেথ—নিরপরাধ এই বৃদ্ধকে দেখে স্নেহের হাসি হাসবে এক-আধবার—আর তার স্বামী ভালমানুষের ছেলে হয়ে মেনে নেবে সবকিছু। এত নিচু হওয়ার কথা ভাবতে হেনচার্ডের আত্মাভিমানে লাগছিল খুব —তথাপি, মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে সে সবতাতেই রাজী, এমনকি ফারফ্রীর দুর্ব্যবহার, প্রভুর মত আচরণ বা তিরস্কার—সবটাই মেনে নিতে পারে। ব্যক্তিগত মান-অপমানের তুলনায়, এলিজাবেথ যে বাড়ীতে বাস করবে সেখানে থাকতে পারাটাই দুর্লভ সুযোগ বলে মনে করা যেতে পারে।

এমনটা ঘটুক বা না ঘটুক, আপাততঃ এলিজাবেথ আর ফারফ্রীর প্রেমের ব্যাপারে সে আগ্রহ বোধ করতে লাগল।

আগের মতই, এলিজাবেথ প্রায়ই বাডমাউথের রাস্তায় বেড়াতে বেরোয়।

ফারফ্রীর পক্ষেও হঠাৎ করে সেখানে দেখা করাটা বেশ সুবিধাজনক। মাইল-দুয়েক হেঁটে গেলে, বড় রাস্তা থেকে সিকিমাইলটাক আগে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের কেল্লা 'মাই ডন' দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড তার আকৃতি, বিশাল প্রাচীর। রাস্তা থেকে তাকিয়ে দেখলে, ঐ প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কোন লোককে অস্পষ্ট বিন্দুর মত দেখায়। হেনচার্ড আজকাল মাঝেমাঝে এখানে চলে আসে। চোখে দূরবীণ লাগিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, দু-তিনমাইলের মধ্যে খুঁজে ফেরে, ফারফ্রী এবং তার যাদুকরীর প্রেম কতদূর এগুলো।

হেনচার্ড একদিন লক্ষ্য করল, বাডমাউথের রাস্তা বেয়ে একটি পুরুষ চেহারা এগিয়ে এল, দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখে দূরবীণ লাগিয়ে হেনচার্ড ভাবল অন্যদিনের মত ফারফ্রীর আকৃতিই ফুটে উঠবে, কিন্তু দেখা গেল লোকটি এলিজাবেথের প্রেমিক নয়, অন্য কেউ।

লোকটার পোষাক-আষাক জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত। সেইমাত্র তার মুখটা দেখতে পেল হেনচার্ড, মনে হল জীবনের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল—লোকটা নিউসন।

দূরবীণটা নামিয়ে, হেনচার্ড কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল। নিউসন অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করছিল হেনচার্ডও, যদি অবশ্য প্রস্তরীভূত হয়ে যাওয়াকে অপেক্ষা করা বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু এলিজাবেথকে আসতে দেখা গেল না। হয়তো কোনও কারণে অভ্যাসমত বেড়াতে বেরোয় নি সেদিন। হয়তো বা বৈচিত্র্যের জন্যে সে আর ফারফ্রী আজ অন্য রাস্তায় চলে গেছে। কিন্তু তাতে আর কি সুরাহা হবে? কাল হয়তো এলিজাবেথ এদিকেই আসবে—নিউসন যদি একান্তে তার সঙ্গে দেখা করার মৎলব করে থাকে, আর সত্য ঘটনা যদি ব্যক্ত করে দিতে চায়, তো সুযোগ খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে না।

তখন নিউসন শুধু তার পিতৃত্বের কথা বলেই ক্ষান্ত থাকবে না। একদিন কি কৌশলে মিথ্যা বঞ্চনার দ্বারা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা'ও বলে দেবে সব। এলিজাবেথ তার সৎ-পিতাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে তারপর। শঠ-প্রবঞ্চক বলে ধারণা করবে সহজেই—আর নিউসনের স্থান হবে তার অন্তরে পিতৃত্বের আসনে।

এদিকে নিউসন অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করে এলিজাবেথের দেখা না পেয়ে চলে গেল। হতভাগ্যের মত ফিরে এল হেনচার্ড। নিজের বাসায় ফিরে দেখল, এলিজাবেথ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

খুব সাদামনে এলিজাবেথ বলল—বাবা! একটা অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি আমি—কারও সই করা নেই। একটা লোক আজ দুপুরবেলা বাডমাউথ রোডে নয়তো সন্ধ্যেবেলা মিঃ ফারফ্রীর বাসায় আমাকে দেখা করতে বলেছে। লিখেছে, কিছুদিন

আগে নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, কিন্তু কেউ তাকে ঠকিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। কে যে লোকটা, কিছুতেই বুঝতে পারছি না বাবা! আমার কিন্তু মনে হয় ডোনাল্ড হতে পারে—আর ঐ যে কারও আপত্তির কথা লিখেছে—সে ও'র কোনো বন্ধুবান্ধব হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই যেতে ইচ্ছা করছিল না—যাব বাবা?

হেনচার্ড ভারীগলায় বলল—হ্যাঁ, যাও।

ক্যাস্টারব্রিজে হেনচার্ড আর থাকবে কি না, সে প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল, যে মুহূর্তে নিউসন এ দৃশ্যে প্রবেশ করল। হেনচার্ড নিজের মনঃপূত নয় এমন কোন শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। নীরবে বরং সে যন্ত্রণা ভোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল, আর পরবর্তী পদক্ষেপও ভেবে নিয়েছিল মনে মনে।

যে মেয়েটিকে সে জগৎসংসারে তার সর্বস্ব বলে জ্ঞান করত, তাকেই অবলীলাক্রমে, যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে বলে দিতে পারল—এলিজাবেথ! আমি ক্যাস্টারব্রিজ থেকে চলে যাচ্ছি। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল এলিজাবেথ। বলল—ক্যাস্টারব্রিজ থেকে? আমাকে ছেড়ে?

হ্যাঁ, এই ছোট্ট দোকান চালাতে দুজন লাগে না। তুমি একাই পারবে। লোকে কি বলবে না বলবে—আমি তার পরোয়া করি নে। গাঁয়ের দিকে চলে যাব। একা একা থাকব। আর তুমি থাকবে তোমার মত।

এলিজাবেথ মুখ নামিয়ে নিল, নিঃশব্দে চোখের জল পড়তে লাগল। মনে মনে ভাবল, হেনচার্ডের এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই, ফারফ্রীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার সম্ভাব্য ফলশ্রুতি। আবেগ দমন করে, ফারফ্রীর সম্মান বজায় রেখেই সে বলল—আমি ভেবেছিলাম আর কিছুদিন পরে মিঃ ফারফ্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, কিন্তু তোমার যে তাতে মত নেই, সেটা আমি বুঝতে পারি নি।

তুমি যা করতে চাও, তাতেই আমার মত আছে, ঈজি!—হেনচার্ড বলল ধরাগলায়—আর আমার মত না থাকলেই বা কি! আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমার এখানে থাকাটা ভবিষ্যতে অসুবিধের কারণ হতে পারে। ছোট করে বলতে গেলে—আমার চলে যাওয়াটাই সবদিক দিয়ে ভাল।

এলিজাবেথের প্রতি যতই ভালবাসার টান থাকুক না কেন, হেনচার্ডের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কারণ হেনচার্ডের দৃঢ় বিশ্বাস একদিন যখন এলিজাবেথ তাকে নিজের পিতা নয় বলে জানবে, এবং সে পরিচয় গোপন রাখার জন্যে হেনচার্ড যা করেছে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়বে—সেদিন নিশ্চিতই এলিজাবেথের মনে বিক্ষোভ দেখা দেবে—এ যুক্তিকে খণ্ডন করার মত কিছুই দেখতে

পাচ্ছিল না হেনচার্ড।

অবশেষে এলিজাবেথ বলল—তাহলে তো তুমি আমার বিয়েতে থাকতে পারবে না. সেটা কি ঠিক হবে?

আমি থাকতে চাই না, আমি থাকতে চাই না—বেশ জোরেজোরে বলল হেনচার্ড। তারপর গলা নামিয়ে বলল—কিন্তু ভবিষ্যতে কখনও কখনও আমাকে মনে করার চেষ্টা কোর। করবে তো ঈজি? শহরের সব থেকে ধনবান ব্যাক্তির বৌ যেদিন হবে, সেদিন আমার কথা একটু ভেব, আর আমার দোষ অপরাধ সব যেদিন জানতে পাবে সেদিন যেন ভুলে যেও না, দেরী করে হলেও তোমাকে আমি স্নেহ করতাম।

ডোনাল্ডের জন্যেই তুমি চলে যাচ্ছ—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এলিজাবেথ।

আমি তো তাকে বিয়ে করতে বারণ করছি না—বলল হেনচার্ড—কথা দাও আমায় ভুলে যাবে না, যেদিন—কথাটি শেষ হ'ল না—হেনচার্ড বলতে চাইছিল যেদিন নিউসন আসবে।

আবেগ আর উত্তেজনার মধ্যে এলিজাবেথ যন্ত্রের মত মাথা নাড়ল। সেদিনই সন্ধ্যেবেলা হেনচার্ড শহর ছেড়ে চলে গেল. যে শহরের উন্নতি আর ভালোর জন্যে বহু বছর যাবৎ সে'ই ছিল মূল প্রেরণাদাতা। দিনের বেলা সে একটা যন্ত্রপাতির বাক্স কিনে নিয়েছিল, পুরনো কাস্তে আর নিড়ানিতে ধার দিয়েছিল ভাল করে। যুবকবয়সে যে সব পোষাক পরত সেই মোজা, পাৎলুন পরে নিজেকে পরখ করে নিয়েছিল। পুরনো জরাজীর্ণ সেই স্যুট আর রেশমী টুপি ত্যাগ করল চিরকালের মত। ক্যাস্টারব্রিজে তার পুরনো পরিচয়ের চিহ্ন ঘুচে গেল একেবারে।

এমনই নিঃশব্দে আর একাএকা চলে গেল হেনচার্ড, যে তার পরিচিত কেউ জানতে পেল না এই চলে যাওয়ার কথা। এলিজাবেথ সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল দ্বিতীয় সাঁকোটা পর্যন্ত—তখনও ফারফ্রীর বাসাতে সেই অপরিচিত আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করার সময় হয়নি। একেবারে ছেড়ে দেওয়ার আগে সে হেনচার্ডকে দাঁড় করাল অল্পেক মিনিটের জন্যে, তারপর অপার বিস্ময় আর বিষাদের মধ্যে বিদায় জানাল তাকে। দূরে মাঠের ওপারে তার চেহারা মিলিয়ে যেতে দেখল এলিজাবেথ। হলুদ রঙের যন্ত্রের বাক্সটা তার পিঠে উঠছে আর পড়ছে প্রতি পদক্ষেপে। হাঁটুর কাছে তার প্যাণ্টের ভাঁজ দেখা যাচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে যতক্ষণ না একেবারে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। এলিজাবেথ অবশ্য জানত না, যে হেনচার্ডের এই চলে যাওয়া, পঁচিশবছর আগে যেদিন সে প্রথম ক্যাস্টারব্রিজে প্রবেশ করে, ঠিক সেদিনেরই মত—শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে, নিশ্চিত বয়োবৃদ্ধির কারণে তার চলা

এখন মন্থর—হতাশা তাকে দুর্বল করে ফেলেছে আর কাঁধ নুয়ে পড়েছে ভারে, দৃশ্যতঃ, যন্ত্রপাতির বাক্সটার ওজনে।

চলতে চলতে হেনচার্ড প্রথম মাইলষ্টোনটার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা টিলার প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত সে উঠে এসেছে। মাইলষ্টোনটার ওপর বাক্সটা রেখে, তাতে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। ঝড়-তোলার মত দীর্ঘশ্বাস ফেলল একবার। কান্নার থেকে সে অনেক খারাপ—এতই শুকনো আর কঠিন।

ওকে যদি শুধু সঙ্গে আনতে পারতাম—শুধু এইটুকু—হেনচার্ড বলতে লাগল—নইলে কঠোর পরিশ্রম আমার কাছে কিছু নয়! কিন্তু সে যে হবার নয়! আমাকে একা একাই যেতে হবে—বিতাড়িত ভবঘুরের মত—তবে শাস্তি আমার যত কঠিনই হোক, সইতে পারব না এমন নয়।

মনের ক্ষোভ দমন করে সে বাক্সটা কাঁধে তুলে নিল আবার। হাঁটতে শুরু করল।

এলিজাবেথ ততক্ষণে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাকে বিদায় জানিয়ে নিজের ভারসাম্য ফিরে পেয়ে, ক্যাস্টারব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। লোকবসতির কাছাকাছি পৌঁছান'র আগেই ডোনাল্ড ফারফ্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেদিন যে এই প্রথম দেখা হল দু'জনের—তা নয়। বিনা আড়ম্বরে তারা পরস্পরের হাত ধরল, ফারফ্রী উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করল—উনি চলে গেছেন?—বলেছ তাঁকে সব কথা?—মানে ঐ ব্যাপারটা—আমাদের কথা না।

হ্যাঁ গেছেন, আমি যতটা জানি সব বলেছি। তোমার বন্ধুটি কে, ডোনাল্ড?

দাঁড়াও না, সবই জানতে পারবে একটু পরে। মিঃ হেনচার্ডও শুনতে পাবেন যদি বেশীদূর না গিয়ে থাকেন।

অনেকদূর চলে যাবেন—এ তল্লাটেই তাঁর থাকার ইচ্ছা নয়।

এলিজাবেথ তার প্রেমিকের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। মোড়টা ঘুরে তারা কর্ণ ষ্ট্রীটে এসে পড়ল। কিন্তু সোজা নিজের বাসার দিকে না গিয়ে, তারা এসে ঢুকল ফারফ্রীর বাড়ীতে।

নীচের তলায় বৈঠকখানা ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকল ফারফ্রী, বলল—ঐ যে ওখানে বসে আছেন তিনি তোমার জন্যে। এলিজাবেথ প্রবেশ করল। লম্বা হাতল-ওয়ালা চেয়ারটাতে বসে ছিল সেই ভদ্রলোক, যে এখান থেকে দু'এক বছর আগে এক স্মরণীয় সকালবেলায় হেনচার্ডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আধার আধঘন্টার মধ্যেই তাকে গাড়ী করে ফিরে যেতেও দেখেছিল হেনচার্ড। এই সেই রিচার্ড নিউসন। দীর্ঘ ছ-সাত বছরের ব্যবধানে, যাকে মৃত বলে ধারণা করেছিল

সবাই, সেই চঞ্চলমতি পিতার সঙ্গে কন্যার মিলনদৃশ্যের দীর্ঘ ব্যাখ্যা না দেওয়াই ভাল পিতৃত্বের প্রশ্ন ছাড়াও ব্যাপারটা মনে দাগ-কাটার মত। হেনচার্ডের চলে যাওয়ার সংবাদ বর্ণিত হল। সত্যকাহিনী যখন একে একে উন্মোচিত হতে লাগল, নিউসনের প্রতি এলিজাবেথের আস্থা জন্মানোটা যত দুরূহ হবে ভাবা গিয়েছিল, আসলে তা হল না। হেনচার্ডের নিজের আচরণই ঘটনাগুলোকে সত্য বলে প্রমাণ করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। তাছাড়া নিউসনের তত্ত্বাবধানেই এলিজাবেথ বড় হয়েছে, কাজেই হেনচার্ড যদি প্রকৃতই তার পিতা হ'ত, তাহলেও তার চলে যাওয়ার বেদনা একটু পুরনো হয়ে এলেই, এলিজাবেথের শৈশবের স্মৃতি তার পিতৃত্বের দাবীকে অনায়াসে নস্যাৎ করে দিতে পারত।

এলিজাবেথের এত সুন্দর বিকাশ হয়েছে দেখে, নিউসন আনন্দ প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। বারবার চুমু খেল সে এলিজাবেথকে।

কষ্ট করে আর যেতে হল না তোমায় আমার সঙ্গে দেখা করতে হাঃ হাঃ—নিউসন বলতে লাগল—আসলে মিঃ ফারফ্রীই এখানে ডেকে নিয়ে এলেন, বললেন, আমার বাসায় চলুন ক্যাপ্টেন নিউসন, আমিই তাকে ডাকিয়ে আনার ব্যবস্থা করব। আমি বললাম, তাই নাকি ? বেশ সেই ভাল, তাই চলে এলাম এখানে।

দরজা বন্ধ করে বলল ফারফ্রী—যাক্ মিঃ হেনচার্ড তো চলে গেছেন। স্বেচ্ছায়ই গেছেন তিনি, আর এলিজাবেথের কাছে যা শুনলাম, খুবই সদ্ব্যবহার করেছেন ও'র সাথে। আমি কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিলাম—কিন্তু যা হওয়া উচিত ছিল, তাই হয়েছে, এখন আর আমাদের কোনো অসুবিধা থাকল না।

আমিও এইকথাই ভাবছিলাম—তাদের মুখের দিকে একে একে তাকিয়ে বলল নিউসন—ও'র অজান্তে ও'র দিকে তাকিয়ে কতবার ভেবেছি আমি, চিন্তার কিছু নেই, একদিন নিশ্চয়ই সুদিনের মুখ দেখব। এখন তো দেখতে পাচ্ছি, তোমরা ভালই আছ—আর আমার চাওয়ার নেই কিছু।

ক্যাপ্টেন নিউসন ! আপনাকে রোজই এখানে দেখতে পেলে খুশী হব—বলল ফারফ্রী—তাছাড়া আমি ভাবছিলাম, বিয়ের ব্যাপারটা আমার এই বাড়ীতেই সেরে নেওয়া যেতে পারে। জায়গাও অনেক আছে—আপনি তো সাময়িক আস্তানায় উঠেছেন—তাতে ঝঞ্ঝাট অনেক কম হবে খরচও বাঁচবে। আর বিয়ের পরে বাড়ীর খোঁজে বেশী দৌড়ঝাঁপ না করাটা যে কোন দম্পতির পক্ষেই ভাল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার পূর্ণ সম্মতি আছে—ক্যাপ্টেন নিউসন বলল—তুমি যখন বলছ, এখানে অসুবিধা হবে না। বেচারী হেনচার্ডও চলে গেছে— না হলে আমি রাজী হতাম না, বা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতাম না, তার পারিবারিক জীবনে আমি

আগেই অনধিকার-প্রবেশ করে বসে আছি। আচ্ছা, একবার ঐ তরুণী মহিলার মতামতটাও শুনে দেখা যাক। এলিজাবেথ, লক্ষ্মীটি! শোনো, আমরা কি আলাপ করছি, ওভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, না শোনার ভান কোর না।

ডোনাল্ড আর তুমিই ঠিক করে ফ্যালো। বিড়বিড় করে বলল এলিজাবেথ। তখনও সে দূরে রাস্তায় কোনও একটা ছোট্ট বস্তুর দিকে তাকিয়েছিল একদৃষ্টিতে।

ঠিক আছে, তাহলে—বিষয়টাতে পুরোপুরি প্রবেশ করার ভঙ্গিতে, ফারফ্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল নিউসন—ওই ভাবেই স্থির করা যাক, মিঃ ফারফ্রী! তুমি যখন এতই করছ, নিজের বাড়ীঘর ছেড়ে দিচ্ছ, আমি না হয় পানীয়ের ব্যবস্থাটা করব। 'রাম' হোক বা যেটা পছন্দ হয়—ডজনখানেক জার আনলেই হবে বোধহয়। বেশিরভাগই তো আসবে মেয়েরা—ওরা অত পানীয় পছন্দ করে না। অবিশ্যি তুমিই সেটা ভাল বুঝবে। অনেক ব্যাটাছেলেকে বা জাহাজের বন্ধুদের আমি মদ খাইয়েছি। কিন্তু মেয়েরা কে কেমন খায় বিশেষতঃ এমন অনুষ্ঠানে কতখানি খেতে পারে, আমার আদৌ ধারণা নেই।

না, না, খুব বেশী দরকার হবে না—ফারফ্রী কিছুটা ভয়মিশ্রিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলল—ও'সব আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন।

আলোচনা আরও কিছুটা এগুলে, নিউসন চেয়ারে হেলান দিয়ে, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আপনমনে হাসতে হাসতে বলল—মিঃ ফারফ্রী, তোমাকে তো কখনও বলি নি বোধহয়, না কি বলেছি, সেবারে হেনচার্ড আমাকে কি বলে ভাগিয়েছিল জানো?

ফারফ্রী মাথা নাড়ল, সে ঘটনা তার জানা নেই।

ও! আমি ভেবেছিলাম বলব না কাউকে। লোকটার বদনাম করাটা ঠিক হবে না ভেবেছিলাম। তবে এখন যখন সে চলে গেছে—বলা যেতে পারে। তোমার সঙ্গে গত সপ্তাহে যখন দেখা হয়, তার নয় দশ মাস আগে আমি একবার ক্যাস্টারব্রিজে এসেছিলাম। তারও আগে আরো দু'বার এসেছি। প্রথমবার এই শহরের ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম পশ্চিমের দিকে। তখন জানতাম না এলিজাবেথ এখানেই আছে। তারপর কোথা থেকে যেন শুনলাম—এখন ভুলে যাচ্ছি, কার কাছে শুনেছিলাম—যে হেনচার্ড নামে একজন নাকি এখানকার মেয়র ছিল। তাই শুনে ফের এলাম, একদিন সকালবেলা দেখা করলাম তার সঙ্গে। বদমাইসটা কি বল্লে জানো, বল্লে, এলিজাবেথ নাকি অনেকদিন আগেই মারা গেছে।

এলিজাবেথ এখন শুনতে লাগল মনোযোগ দিয়ে।

লোকটা যে গুল মারছে একথা আমার একবারও মনে হয় নি—নিউসন বলতে লাগল—বিশ্বাস করো, শুনে আমার এমনই মনের অবস্থা হ'ল যে, আমি তখুনি সেই

গাড়ীতে ফিরে গেলাম—আধ ঘণ্টাও দাঁড়াতে ইচ্ছা করল না আমার। হায় হায়—খুব মজা হয়েছিল সেবার, লোকটাকে বাহবা দিই আমি।

এই ঘটনা শুনে এলিজাবেথ আশ্চর্য হয়ে গেল, চীৎকার করে উঠল—মজা? একে বলে মজা? এতদিন ধরে তোমাকে তফাৎ করে রেখেছিল এই ঘটনা—বাবা! নইলে তো তোমার সঙ্গে কত আগেই দেখা হোত!

তার বাবা কথাটা মেনে নিল।

ও'রকম করাটা কখনই উচিত হয়নি—বলল ফারফ্রী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ, বলল—আমি কথা দিয়েছিলাম, ওঁকে ভুলব না, কিন্তু এখন দেখছি ভুলে যাওয়াই উচিত।

নিউসন বহু বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মিশেছে, বহু বিচিত্র নীতিবোধের পরিচয় পেয়েছে, তাই হেনচার্ডের অপরাধের ভয়াবহতা সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারল না। কিন্তু এজন্যে সে'ই দুঃখভোগ করেছে সবথেকে বেশী। অনুপস্থিত সেই অপরাধীর ওপর আক্রমণটা গুরুতর আকার ধারণ করছে দেখে, সে বরং হেনচার্ডের পক্ষই অবলম্বন করল।

আসলে সে পাঁচটিও কথা বলে নি—নিউসন বোঝাতে লাগল—কি করেই বা বুঝবে, যে বোকার মত আমি সব বিশ্বাস করে নেব? বেচারী! দোষ তার যতটা আমারও কিছু কম নয়।

এলিজাবেথের চিন্তা-ভাবনা আলোড়িত হচ্ছিল, দৃঢ়ভাবে সে বলল—না, বাবা! উনি তোমার সম্পর্কে ভালই জানতেন, কত সহজে তুমি সব বিশ্বাস করে নাও। মাকেও ঐ কথা বলতে শুনেছি অনেকবার। ইচ্ছে করেই তোমার ক্ষতি করার জন্যেই ওকথা বলেছিলেন উনি। গত পাঁচটি বছর ধরে প্রবঞ্চনার পর মিথ্যে আমার বাবা হয়ে থেকে এ কাজ করা ওঁর কখনই উচিত হয় নি।

আলাপ-আলোচনা এইভাবেই চলছিল। অনুপস্থিত ব্যক্তিটির মিথ্যাচার এলিজাবেথের চোখে প্রশমিত করে দেওয়ার চেষ্টা করল না কেউ। হেনচার্ড নিজেও উপস্থিত থাকলে, সে চেষ্টা করত কিনা সন্দেহ। নিজের সুনাম বা সুখকে এতই তুচ্ছজ্ঞান করত হেনচার্ড।

যাক গে, যাক গে—ওসব কথা থাক, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে—ভদ্রলোকের মত বলল নিউসন—এখন বিয়ের কথায় আসা যাক আবার।

।। চুয়াল্লিশ ।।

আলোচ্য ব্যক্তিটি এতক্ষণ একা একা হেঁটে চলেছিল পূবের দিকে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল বিশ্রামের জায়গার খোঁজে। মেয়েটিকে ছেড়ে এসে সে অন্তরে এত অসহায় বোধ করছিল যে, কোনো সরাইখানা বা গৃহস্থ বাড়ীতে ঢুকতে ইচ্ছা হল না। একটা মাঠের মধ্যে গমের গাদার নিচে শুয়ে পড়ল, খাওয়াদাওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করল না। হৃদয়ের দুঃসহ ভার তাকে গভীর নিদ্রার জগতে পৌঁছে দিল।

পরদিন খুব ভোর বেলা, শরৎকালের উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ চোখের পাতায় পড়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল তার। বোঁচকা খুলে, রাত্রির খাবার বলে যা এনেছিল, সেটাই খেয়ে নিল সকালবেলা। সেজন্য পুরো কিটব্যাগের জিনিসপত্র সব উপুড় করে ঢেলে ফেলল। যা কিছু সে এনেছিল, সবই তার নিজের পিঠেই বহন করতে হবে। তবু নিজের যন্ত্রপাতি ছাড়াও সে এলিজাবেথের ফেলে-দেওয়া কিছু জিনিস, যেমন দস্তানা দুটো বা তার হাতের লেখা একটুকরো কাগজ ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল ব্যাগের মধ্যে। আর তার পকেটে ছিল—এলিজাবেথের একগাছি কুঞ্চিত কেশ। এইগুলো সব দেখে নিয়ে বন্ধ করে আবার চলতে শুরু করল হেনচার্ড।

পরপর পাঁচদিন ধরে দীর্ঘপথ হাঁটল হেনচার্ড। তার হলুদ রঙের বাক্সটার দিকে মাঝে মাঝে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল জনমজুররা। মাথায় তার পর্য্যটকের টুপি। অবনত মুখে কত পত্র পল্লবের ছায়া মিছিলের মত দেখা দিয়ে যায়। এতদিনে বোঝা গেল তার গন্তব্যস্থল হল—'ওয়েডন প্রায়স'—সেখানে পৌঁছল সে ষষ্ঠদিনের বিকেলবেলা।

যে পরিচিত পাহাড়টার চূড়ায় এত পুরুষ ধরে বাৎসরিক মেলা বসত, এখন সেখানে জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই। বলতে গেলে অন্য কিছুও চোখে পড়ে না। গোটাকয়েক ভেড়া চরে বেড়াচ্ছিল। তারাও হেনচার্ডকে সেখানে এসে থামতে দেখে দৌড়ে পালাল। ঘাসের ওপরে বাক্সটা নামিয়ে রাখল হেনচার্ড। তারপর বিষণ্ণ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাকাল চারিদিকে। পঁচিশ বছর আগে যে পথ দিয়ে সে এবং তার বৌ হেঁটে এসেছিল, দেখতে পেল সেই পথ।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ দিক দিয়েই এসেছিলাম—ঠিক ঠিক সবকিছু মনে করে বলল

হেনচার্ড—তার কোলে ছিল বাচ্চাটা, আর আমি গানের কাগজটা পড়ছিলাম। মোড়টা ঘুরে এখানে এসে উঠেছিলাম। সে এতই অবসন্ন আর ক্লান্ত ছিল—তবু আমি তার সঙ্গে কথা বলি নি, পোড়া অহঙ্কার আর গরীব হয়ে থাকার দুঃখে। তারপরই তো তাঁবুটা দেখলাম। ঐ আরেকটু আগে ঐখানটায় ছিল বোধহয়।—আর একটু হেঁটে গেল হেনচার্ড। ঠিক এখানেই তাঁবুটা ছিল না, তবু তার সেইরকম মনে হচ্ছিল—ভেতরে ঢুকে পড়লাম, ঠিক এইখানটাতে বসেছিলাম আমরা। আমি ঐদিকে মুখ করে ছিলাম। তারপর মদ খেলাম, আর সেই দুষ্কর্মটি করলাম। নিশ্চয়ই ঐ গোলমত জায়গাটায় দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার আগে, শেষকথাটি সে বলে গিয়েছিল—এখনও যেন শুনতে পাচ্ছি ফোঁপানির আওয়াজ—আর সেই কথাগুলো—মাইকেল! এতদিন তোমার সঙ্গে সংসার করে রাগ ছাড়া আর কিছুই পাই নি। এখন আর তোমার রইলাম না। দেখি, অন্য কোথাও আমার কপালে সুখ হয় কিনা।

হেনচার্ডের বর্তমান তিক্ততা এবং বেদনা অন্যান্য উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের থেকে অনেক বেশী। কারণ তারা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, যেসব সুকুমার মনোবৃত্তিকে উচ্চাশার বেদীমূলে আহুতি দিতে হয়েছে, তার তুলনায় সাফল্যও লাভ করেছে যথেষ্ট—কিন্তু হেনচার্ডের সে সাফল্য তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে তারই চোখের সামনে। এই দীর্ঘকাল সে অনেক দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উচ্চাশার স্থানে ভালবাসাকে বসানোর যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, আর উচ্চাশার তো সমাধি হয়েছে আগেই। তার অবমানিতা স্ত্রী নিতান্ত সরলভাবে এমনই এক জুয়াচুরি করল তার সাথে, সেটাকে তার দোষ না বলে গুণই বলতে হয়। এ'ও এক বিচিত্র খেয়াল যে, সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি বিসর্জনের মধ্যেই প্রকৃতির দান ফুলের মত নিষ্পাপ সুন্দর এলিজাবেথের জন্ম হয়েছে। তাকেও সে যে বিদায় জানিয়ে এসেছে, তার আংশিক কারণ হল, এইসব বৈপরীত্য আর স্ববিরোধ। সামাজিক বিধি নিষেধকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে প্রকৃতি যেন সর্বদা তৈরী হয়ে বসে আছে!

হেনচার্ড ঠিক করল এখান থেকে চলে যাবে। একবার শুধু ঘুরে গেল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে। চলে যাবে অনেক দূরে এইসব দেশ-গাঁ ছেড়ে অনেক তফাতে। কিন্তু এলিজাবেথকে ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়—এবং যেখানে সে বাস করে সেই জায়গাটিও মনে পড়বে। জগতের প্রতি বিরক্ত হয়ে যতই সে দূরে সরে যেতে চাইছিল, ততই আবার এলিজাবেথের প্রতি স্নেহের টানে একই কেন্দ্রের অভিমুখে ছুটে আসছিল বারবার। ফল হ'ল এই যে, হেনচার্ডের অনেক দূরে যাওয়া হল না—প্রায় অচেতনভাবে সে ক্যাস্টারব্রিজেরই আশেপাশে ঘুরতে লাগল। ক্যাস্টারব্রিজকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে তার পরিভ্রমণ হতে থাকল, ক্যানাডার জংলী

লোকেদের মত। যে কোন টিলাতেই সে চড়ুক না কেন, চন্দ্র, সূর্য্য আর তারা ইত্যাদি দেখে মনে মনে ঠিক করে নিত ক্যাস্টারব্রিজ কোন দিকে, এলিজাবেথ কোন দিকে আছে। নিজের দুর্বলতার কথা চিন্তা করে মনে মনে হাসলেও প্রতি ঘণ্টায়, এমন কি প্রতি মিনিটে চিন্তা করত এলিজাবেথ কি করছে—কিভাবে বসছে বা উঠে দাঁড়াচ্ছে, তার চলা, ফেরা—অবশেষে নিউসন বা ফারফ্রীর চিন্তা এসে এলিজাবেথের সে প্রতিমা মুছে দিত মন থেকে। তারপরই সে নিজের মনে বলত—হায়রে বোকা! এমন এক মেয়ের জন্য ভাবছ, যে তোমার নিজের মেয়ে নয়।

অবশেষে হেনচার্ডের কাজ জুটে গেল। হেমন্তের শেষে এখন ফসল-কাটা, ঝাড়াই-মাড়াইয়ের জন্য লোকের দরকার হয়। প্রাচীন বড় রাস্তাটার ধারে এক গ্রাম্য খামারে কাজ নিল হেনচার্ড। ওয়েসেক্স অঞ্চলের এপ্রান্তে কোথায় কি ঘটছে সবই কানে এসে পৌঁছায়—এটাই এই বৃহৎ ধমনীর মত রাজপথের নিকটে থাকার সুবিধে। দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মত হলেও হেনচার্ড ভাবত যার কল্যাণচিন্তায় তার অন্তর এত ব্যাকুল, সেই এলিজাবেথের খুব কাছেই আছে সে, রাস্তাটা থাকায় দূরত্ব অর্ধেক হয়ে গেছে।

হেনচার্ডের বর্তমান অবস্থা ঠিক পঁচিশবছর পূর্বেকার মত। বাহ্যতঃ তার পক্ষে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে অসুবিধা ছিল না। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির নতুন আলোকে, নিশ্চয়ই তার পক্ষে জয়লাভ করা আগের থেকে সহজতর ছিল, কিন্তু মানুষের এই আত্মোন্নতির প্রচেষ্টাকে দেবতারা এমনই এক চক্রের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন যে যথাযথ জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ হয়ে আসে, মানুষের কর্মপ্রেরণা ততদিনে বিদায় নিয়ে নিয়েছে। নতুন করে শুরু করার মত বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আর অবশিষ্ট নেই হেনচার্ডের। জগৎটা এখন তার কাছে চিত্রের মত। সে দর্শক।

প্রায়ই সে কাজকর্মের মধ্যেই, কাস্তে চালাতে চালাতে মানুষের জগৎটা বেড়িয়ে আসত মনেমনে, আর ভাবত—এখানে, ওখানে, দুনিয়ার সর্বত্র কত মানুষ বরফ-পড়া পাতার মত অকালে মৃত্যুবরণ করছে, তাদের পরিবার-পরিজন, দেশ-গাঁ কত ভালবাসে তাদের! আর আমি! বিতাড়িত,অবাঞ্ছিত, ঘৃণ্য এই জীবন নিয়ে এখনও বেঁচে আছি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

মাঝেমাঝেই হেনচার্ড কান খাড়া করে শুনত, রাস্তার দিকে পথচারীদের কথাবার্তা—নেহাত কৌতূহলই নয়—সে আশা করত,লণ্ডন আর ক্যাস্টারব্রিজের মধ্যে বিস্তৃত এই রাস্তায় যাত্রীদের মধ্যে কেউ হয়তো কোন একদিন দ্বিতীয় জায়গাটির সম্পর্কে আলাপ করবে। কিন্তু দূরত্বটা এতই বেশী যে হেনচার্ডের এই ইচ্ছা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুব ক্ষীণ। তবে এত মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্যে

একদিন সে সত্যিই একটি গাড়োয়ানের মুখে 'ক্যাস্টারব্রিজ' নামটি উচ্চারিত হতে শুনল। দৌড়ে গেল রাস্তার দিকে তারপর হাত তুলে ডাকল সেই অপরিচিত লোকটিকে।

হ্যাঁ, সেখান থেকেই তো আসছি—হেনচার্ডের প্রশ্নের উত্তরে জানাল লোকটা —মাঝেমাঝেই যাতায়াত করতে হয় আমাকে, তবে বেশীদিন আর পারব না।

আচ্ছা! ওখানকার নতুন খবর টবর কিছু?

খবর আর কি—একইরকম চলছে।

না, শুনেছিলাম যে পুরনো মেয়র মিঃ ফারফ্রীর নাকি বিয়ে? সত্যি নাকি ব্যাপারটা?

ন্ না, না, তেমন কিছু তো শুনি নি।

না, সত্যি। তুমি ভুলে গেছ জন!—গাড়ীর ছইয়ের ভেতর থেকে একজন মেয়েলোক বলল—এই সপ্তার গোড়ার দিকে, সেই যে কোন একটা জায়গায় যেন দাঁড়িয়েছিলাম আমরা?—তারাই তো বলাবলি করছিল—শিগগিরই কবে যেন বিয়ে—বোধহয় মার্টিন'স ডে'তেই হবে।

লোকটা তবুও বলল, তেমন কিছু তার মনে পড়ছে না। তারপর গাড়ীটা ক্যাঁচর ক্যাঁচর করতে করতে মিলিয়ে গেল দূরে।

হেনচার্ডের ধারণা হল, মেয়েলোকটার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। মার্টিন'স ডে দিনটা ঠিকই হতে পারে—কারণ দুপক্ষের কারুরই দেরী হওয়ার কথা নয় অতএব হেনচার্ড এলিজাবেথকে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারে. কিন্তু নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করার জন্যে, চিঠি লিখতে পারাটা তার পক্ষে কঠিন। তবুও তো এলিজাবেথ চলে আসার আগে তাকে বলেছিল, বিয়ের সময় তার অনুপস্থিত থাকাটা এলিজাবেথের ইচ্ছা নয়।

এখন বারেবারেই মনে হতে লাগল, যে তার এই বিতাড়িত হওয়ার জন্যে এলিজাবেথ বা ফারফ্রী একটুও দায়ী নয়। বরং নিজেই সে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করেছে চিরকাল। নিউসনকে আসতে দেখেই সে ভেবে নিল ক্যাপ্টেন বুঝি ফিরে এল চিরকালের মত। কিন্তু তার তো কোনো প্রমাণ ছিল না। এলিজাবেথই বা তাকে সাদরে গ্রহণ করবে কিনা তার ঠিক কি? এছাড়া, ফিরে এল মানেই যে সে থেকে যাবে এমন তো কথা নয়। এমন যদি হয়, যে হেনচার্ডের বর্তমান ধারণা সবটাই ভুল। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্যে সে যে একেবারে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেটা তো ঠিক না'ও হতে পারে। এখন আবার একবার চেষ্টা করা যেতে পারে এলিজাবেথের কাছে ফিরে যাওয়ার—তাকে দেখার—সব ঘটনা তাকে বুঝিয়ে বলে

কথা চেয়ে নেয়া যেতে পারে—যাই ঘটুক না কেন, এমনকি জীবন গেলেও একবার সেই চেষ্টা করে দেখা উচিত।

কিন্তু হঠাৎ কেন তার এই মত পরিবর্তন হল, একথা সে তাদের দুজনকে বোঝাবে কি করে—এই চিন্তাতেই ধড়ফড় করতে লাগল হেনচার্ড।

আরও দুদিন ধরে সে মাঠের কাজ করল। তারপর সব দ্বিধা ত্যাগ করে হঠাৎ একবার ঠিক করে ফেলল, এই বিবাহ-উৎসবে সে যোগ দেবে। চিঠিপত্র লেখাটা ঠিক শোভনীয় হবে না। তার অনুপস্থিত থাকাটা তো এলিজাবেথের মনঃপূত নয়—বরং হঠাৎ যদি সে উপস্থিত হয় তো, এলিজাবেথের অন্তরে যদি একটুও অতৃপ্তি থেকে থাকে, সেটা দূর হয়ে যাবে।

হাসিখুশি, আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে হাজির হয়ে পাছে সে কোন বিঘ্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এই ভেবে সে ঠিক করল, সন্ধ্যের আগে যাবে না। তখন আর কোন রূঢ়তা অবশিষ্ট থাকবে না বরং অতীতকে ভুলেগিয়ে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে।

সেন্ট মার্টিন'স ডের দুদিন আগে যাত্রা শুরু করল হেনচার্ড। হিসাব করে দেখল প্রতিদিন তাকে ষোল মাইল পথ হাঁটতে হবে। তিন দিনের মধ্যে বিয়ের দিনটাকেও সে ধরে নিয়েছিল, পথে নাম করার মত দুটোই শহর পড়ল, মেলচেষ্টার আর শট্সফোর্ড। দ্বিতীয় রাত্রিতে সে শর্টস্‌ফার্ডে বিশ্রাম নিল আর পরবর্তী সন্ধ্যার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল।

পরনে তার কাজ করার পোষাক। তা'ও এই দুমাসে জরাজীর্ণ আকার ধারণ করেছে। পরের দিন সন্ধ্যেবেলা, অন্ততপক্ষে বাহ্যতঃ মানিয়ে নেওয়ার মত একটা পোষাক দরকার, তাই সে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। মোটামুটি ভদ্র গোছের একটা কোট আর টুপি, একটা নতুন জামা কিনে সে দেখল, যাহোক চলে যেতে পারে। এই পোষাকে গেলে এলিজাবেথ রাগ করবে না বোধহয়। এখন এলিজাবেথের জন্যে কিছু উপহার খুঁজতে লাগল হেনচার্ড।

কি উপহার নেওয়া যেতে পারে? রাস্তাটার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে সে দেখল, দোকানে সাজানো বহু বিচিত্র জিনিসপত্র, কিন্তু যেটা তার পছন্দসই সেটা হয়তো তার সাধ্যের বাইরে। এই ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। অবশেষে, খাঁচায় পোরা একটা গোল্ডফিঞ্চ পাখী খুব মনে ধরল তার। খাঁচাটা ছোট এবং সাধারণ, দোকানটাও সাদামাটা। দাম জিজ্ঞাসা করে দেখল, সামর্থ্যে কুলিয়ে যাবে। ছোট্ট পাখীটার এই তারের খাঁচা, একটা খবরের কাগজ দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে তার হাতে দিল দোকানদার, হেনচার্ড সেটি হাতে করে বেরুল রাত্রির আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে।

পরের দিন শেষ পর্য্যায়ের যাত্রা শুরু হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার পুরনো পরিচিত এলাকায় পৌঁছে গেল। কিছুটা রাস্তা অতিক্রম করল হেনচার্ড এক

ব্যবসায়ীর গাড়ীতে চড়ে। পেছনের এক কোণায় বসে সে অনেক যাত্রীকে উঠতে আর নামতে দেখল, স্থানীয় অনেক খবরাখবর তারা বলাবলি করছিল, কিন্তু কারও মুখেই অগ্রবর্তী শহরে বিবাহোৎসবের সম্পর্কে আলোচনা শোনা গেল না।

আগে থেকে জানত না এমন নতুন কিছুই কানে এল না হেনচার্ডের। তবে ক্যাস্টারব্রিজের ঘণ্টার মৃদু আওয়াজ সব যাত্রীকেই বেশ আগ্রহী করে তুলল। ইয়ালবেরী হিলের মাথায় এই ঘণ্টাধ্বনি খুব মধুর শোনাচ্ছিল। তখন ঠিক মধ্যাহ্ন-বেলা বারটা বাজে।

ঘণ্টা বাজছে—তার মানে সব ঠিকঠাক চলেছে—মাঝে কিছু অঘটন ঘটে যায় নি—এলিজাবেথ আর ডোনাল্ড ফারফ্রীর বিবাহ ঠিকমতই সম্পন্ন হতে যাচ্ছে।

এই আওয়াজ শুনে হেনচার্ড গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। গল্পগুজবরত যাত্রীদের সঙ্গ আর ভাল লাগছিল না। প্রকৃতই যেন তার সব পৌরুষ হারিয়ে গেছে। হেনচার্ড ঠিক করল—সন্ধ্যে হওয়ার আগে ক্যাস্টারব্রিজের রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করবে না—তাতে ফারফ্রী এবং তার নবপরিণীতা স্ত্রী অপ্রস্তুত বোধ করতে পারে—কাজেই এখানেই শহরের বাইরে গাড়ী থেকে নেমে পড়াটা সমীচীন। একটু পরে পাখীর খাঁচা নিয়ে সে হাঁটতে লাগল একা একা—ফাঁকা রাস্তায় আর কেউ নেই।

প্রায় বছর দুই আগে, এখানে এই টিলাটার পাশেই সে ফারফ্রীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল—তার স্ত্রী লুসেটার অসুস্থতার সংবাদ দিতে। সেই জায়গার একটুও পরিবর্তন হয় নি। সেই পাখীগুলোই একই সুরে ডাকছে, শুধু ফারফ্রী নতুন স্ত্রী গ্রহণ করেছে। হেনচার্ড জানে, আগের থেকে এ অনেক ভাল স্ত্রী। হেনচার্ডের মনে মনে একটাই প্রার্থনা যে, এলিজাবেথ যেন সুখী হয়, আগের থেকে স্বচ্ছন্দে কাটে তার জীবন।

বিকেলের বাকি সময়টুকু কাটল খুব চড়া উত্তেজনায়। কাজ করার থেকে চিন্তাই করল সে বেশী—কিভাবে এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করবে আর মুণ্ডিত শামসনের মত নিজেকে বিদ্রূপ করল মনেমনে। ক্যাস্টারব্রিজের প্রথাপদ্ধতি অনুযায়ী বিয়ের পরেই নতুন দম্পতি কখনও বাইরে চলে যায় না। তবু তেমন যদি হয়ে থাকে তো তাদের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে হেনচার্ড। ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নেওয়ার জন্যে সে সামনেই যে দোকানদারকে পেল, জিজ্ঞাসা করল, নব-পরিণীতা বর আর বধূ বাইরে চলে গেছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেল—না, যায় নি, বরং এখন এই মুহূর্তে যতদূর খবর পাওয়া গেছে, কর্তাটি তাদের বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত।

জুতোর ধুলো ঝেড়ে নিল হেনচার্ড। নদীর ঘাটে নেমে ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে

ফুল। তারপর সন্ধ্যার ম্লান আলোয় আস্তে আস্তে পা বাড়াল শহরের দিকে। আগে থেকে খবর নেওয়ার কোনো দরকার ছিল না। ফারক্রীর বাড়ীর কাছাকাছি এলে যে কোনো লোকেরই চোখে পড়বে, ভেতরে ধুমধাম হচ্ছে। ভোনাল্ডের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে রাস্তা থেকে—উচ্চগ্রামে সে গান ধরেছে—তার প্রাণের থেকে প্রিয় জন্মভূমি, যেখানে আর কোনদিন সে পদার্পণ করবে না। বাড়ীর সামনে রাস্তায় কিছু অলস লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। এদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে হেনচার্ড চট করে ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে।

ভেতরে সবকিছু খোলা। বিরাট হলঘরটায় আলোর প্রাচুর্য্য। অনেক লোকজন ওঠানামা করছে সিঁড়ি বেয়ে। হেনচার্ডের মনে সাহস জোগাল না। এত জাঁকজমকের মধ্যে এই দীনদরিদ্রবেশে প্রবেশ করা, যাকে সে ভালবাসে তাকে অপমান করার সামিল। এমনকি তার স্বামী হয়তো এজন্যে বিরক্তিও প্রকাশ করতে পারে। অতএব পেছনদিক দিয়ে ঘুরে সে তার বহুপরিচিত রাস্তায় এসে দাঁড়াল। বাগানের মধ্যে ঢুকল, তারপর খিড়কি দরজা পথে ঢুকল এসে ভেতরে। খাঁচা আর পাখীটাকে একটা ঝোপের আড়ালে রেখে এসেছিল, যাতে তাকে আরও অশোভন না দেখায়।

একাকীত্ব আর বিষাদ এমনই দুর্বল করে ফেলেছে তাকে যে, হেনচার্ড এখন ভয় পায়। আগের সে দৃপ্ততা আর নেই। হেনচার্ড ভাবছিল, আজকের এমন দিনে তার না আসাটাই উচিত ছিল। যাইহোক, পরিস্থিতি অনেকটা সহজ হয়ে গেল রান্নাঘরের মধ্যে একজন বয়স্কা স্ত্রীলোককে দেখে। ইনিই এখন এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ফারক্রীর ঘরসংসার দেখছেন। এই মহিলাটি তাদেরই একজন যারা কোন কিছু দেখে আশ্চর্য্য হয় না। সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও হেনচার্ডের অনুরোধ তার কাছে অবাক শোনাল না, বরং নিজেই সে রাজী হয়ে গেল যে ওপরে গিয়ে কর্তা আর গিন্নীকে খবর দিয়ে আসবে তাদের এক দরিদ্র পুরাতন বন্ধু দেখা করতে এসেছে।

খানিক ভেবেচিন্তে মেয়েলোকটি বলল, হেনচার্ডের পক্ষে রান্নাঘরে অপেক্ষা করা ঠিক নয়, বরং সে পেছনদিককার একটা ঘর খালি আছে—সেখানে বসতে পারে। মহিলাটির পেছন পেছন গেল হেনচার্ড। ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। বাড়ীর সামনের দিকে পা বাড়াতেই সে শুনতে পেল, বসবার ঘরে নাচ শুরু হয়েছে। আবার ফিরে এসে বলে গেল যে, একটু দেরী হতে পারে—কারণ মিঃ এবং মিসেস ফারক্রী দু'জনেই নাচে যোগ দিয়েছেন।

বৈঠকখানা ঘরের দরজা সম্পূর্ণ খোলা, আর হেনচার্ড যে ঘরে বসে আছে তার

দরজা ভেজানো। সেখানে বসে হেনচার্ড নাচের দৃশ্য একটু একটু দেখতে পাচ্ছিল;—বাজনদারদের কাউকে কাউকে দেখা যাচ্ছে, বীণাবাদকের কনুইয়ের ছায়া নড়ছে অনবরত—আর বাঁশীওয়ালার লম্বা বাঁশীর ডগাটা দেখা যাচ্ছে বারবার।

এত আমোদ-আহ্লাদ হেনচার্ডের পছন্দ হচ্ছিল না। সে বুঝতে পারছিল না, ফারফ্রী বিপত্নীক এবং ভদ্ররুচির মানুষ হয়ে কিভাবে এইসব ব্যবস্থা করতে পারল। অবশ্যি এখনও সে যুবক, আর নাচগান ভালবাসে একথা ঠিক। এলিজাবেথের মত মেয়ে—যে জীবনকে যথাযথ বিচার করতে শিখেছে, এবং জানে যে বিবাহ মানে নাচ করে কাটিয়ে দেয়া নয়, সেই বা এই সব হুল্লোড়ের মধ্যে কি মজা খুঁজে পেল—ভেবে আরও বিস্মিত হল হেনচার্ড। যাই হোক, যুবক ছেলেমেয়েরা তো আর বৃদ্ধদের মত হবে না, ভেবে দেখল হেনচার্ড, তাছাড়া সবার উপরে রয়েছে আচার বা প্রথা।

একটু পরেই সে চকিতের জন্যে দেখতে পেল এলিজাবেথকে—যার জন্যে অন্তরটা তার ছিঁড়ে যাচ্ছে। বরফের মত সাদা পোষাক তার পরনে—সিল্ক না সাটিন, কাছে না গেলে ঠিক বোঝা যায় না। মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে চপলতা বা আনন্দের থেকে একটা সঙ্কোচমাখা তৃপ্তি ফুটে উঠেছে। একটু পরেই ফারফ্রীকে দেখা গেল। তার খোলামেলা স্কচম্যানের মত চালচলন, একটুতেই তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তারা দুজনেই যে সর্বদা হাত ধরে নাচছে তা নয়, কিন্তু হেনচার্ড যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, সঙ্গী বদল করতে করতে যখনই তারা দুজনের হাত ধরছিল পরস্পরের—একটা অন্যরকম আবেগের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল দুজনের দেহমনে।

আস্তে আস্তে হেনচার্ড খেয়াল করে দেখল, একটি লোক নাচের কলা কৌশলে ফারফ্রীকে সহজেই হারিয়ে দিচ্ছে। একটু অবাক হল সে। আরও অবাক হয়ে দেখল, লোকটা এলিজাবেথের সঙ্গেই নাচছে। প্রথম বার যখন তাকে দেখল হেনচার্ড লোকটা মুহূর্তের মধ্যে সরে গেল, মাথাটা নিচু করে দোল খেয়ে গেল, পা-দুটো তার ক্রশ চিহ্নের মত আড়াআড়ি আর পেছনটা দরজার দিকে। পরেরবার যখন সে ঘুরে এল, মুখ দেখার আগেই দেখা গেল ওয়েস্টকোটের প্রান্ত—আর ওয়েস্টকোটের আগেই দেখা গিয়েছিল পায়ের পাতা। মুখখানা খুসিতে ঢলঢল। হেনচার্ডের সুনির্দিষ্ট পরাজয় আঁকা রয়েছে সেখানেই। সে নিউসন। হেনচার্ডকে সরিয়ে দিয়ে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

হেনচার্ড দরজাটা ঠেলে দিল একটুখানি—কিছুক্ষণের জন্যে একটুও নড়াচড়া করতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে থাকল—এক অন্ধকার ধ্বংসাবশেষের মত। নিজের উৎপাটিত আত্মাই তাকে আঁধার করে রেখেছে।

কিন্তু পরিস্থিতির এই পরিবর্তন সহজভাবে গ্রহণ করার মত মানুষ সে নয়। অন্তরে ভয়ানক আলোড়ন হচ্ছিল তার। সে চলে যেতে চায়। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার আগেই নাচ হয়ে গেল শেষ। সেই মহিলাটি গিয়ে খবর দিল এলিজাবেথকে —একজন অপরিচিত ব্যক্তি দেখা করতে চায়। প্রায় তক্ষুণি এলিজাবেথ এসে ঢুকল এ ঘরে।

ও! আ-চ্ছা! মিঃ হেনচার্ড!—চমকে উঠে বলল এলিজাবেথ।

একি এলিজাবেথ?—হাতখানা ধরে হেনচার্ড বলল—তুমি একি বললে? মিঃ হেনচার্ড? অমনভাবে গালি দিও না আমাকে। বরং বলো বুড়ো অক্ষম হেনচার্ড—বা অন্য কিছু—কিন্তু অমন ঠাণ্ডা ব্যবহার করো না।....আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার বদলে তুমি তোমার প্রকৃত বাবাকে পেয়েছ। অতএব জেনেছ সবকিছু তাই বলে তোমার সবটুকু চিন্তা ভাবনা ওকে দিয়ে দিও না—আমার জন্যে একটুখানি জায়গা রেখ।

সচকিত হয়ে, আস্তে হাতটা টেনে নিল এলিজাবেথ—আমি তো তোমাকে সব সময়ের জন্যেই ভালবাসতে পারতাম। খুশী হয়েই ভালবাসতাম। কিন্তু তুমি আমাকে ঠকিয়েছ জেনেও ভালবাসি কি করে—ভীষণভাবে ঠকিয়েছ। আমাকে তুমি বুঝিয়েছ আমার বাবা, আমার বাবা নয়—বছরের পর বছর সত্যি ঘটনা আমাকে জানাও নি। আর তারপরে যখন আমার বাবা অন্তরের টানে আমারই খোঁজ করতে এসেছিল, আমার মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছ—যেটা তাঁর পক্ষেও মরে যাওয়ারই মত। যার থেকে আমরা এমন ব্যবহার পেয়েছি, তাকে আর কি করে ভালবাসি?

হেনচার্ডের ঠোঁটদুটো বোধহয় কোনও উত্তর দেওয়ার জন্যে ঈষৎ ফাঁক হল, কিন্তু জোর করে বন্ধ করে রাখল যাতে আওয়াজ না বেরোয়। তখনই সে দোষ ঢাকার জন্যে কি এমন ব্যাখ্যা দেবে, কি বলে বোঝাবে যে সে নিজেও প্রথমে জানত না এলিজাবেথের আসল পরিচয়। পরে সুসানের লেখা থেকে জেনেছিল যে তার নিজের মেয়ে মারা গিয়েছিল আগেই। আর দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর! মিথ্যা কথা বলেছিল সে মরিয়া হয়ে। এলিজাবেথের ভালবাসাকে নিজের মানসম্মানের থেকে বড় বলে মনে করেছিল তাই। এত সব যুক্তি গুছিয়ে বলতে পারল না হেনচার্ড। তার কারণ, নিজের দুঃখ-কষ্টকে এখন আর তত গুরুত্ব দিয়ে সে বিচার করে না, যার স্বপক্ষে দীর্ঘ আবেদন বা যুক্তিতর্ক হাজির করা যেতে পারে।

আত্মরক্ষার কথা না ভেবে এলিজাবেথের কষ্টটাই তাকে বাজছিল বেশী। জ্ঞানীলোকের মত বলল—আমার জন্যে তুমি কষ্ট পেয়ো না। আমি ঠিক এটা চাই নি।

এমন সময়ে তোমার কাছে আসাটাই ভুল হয়েছে। একবার যা করে ফেলেছি সেজন্যে ক্ষমা করো, আর তোমাকে দুঃখ দেব না—যতদিন বেঁচে থাকব—একবারও নয়—বিদায়! চলি।

এলিজাবেথ ভাল করে বুঝতে পারার আগেই হেনচার্ড বেরিয়ে গেল পেছন দিক দিয়ে। যেমন এসেছিল, পেছন দিক দিয়েই চলে গেল, আর তাকে দেখা গেল না।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

মাসখানেক পরের কথা। নতুন সংসারযাত্রায় বেশ মানিয়ে নিয়েছে এলিজাবেথ। ফারফ্রীরও জীবনে পরিবর্তন হয়েছে আগের থেকে। এখন সে বাইরের কাজকর্ম সারা হলেই তড়িঘড়ি ঘরে ফিরে আসে—মাঝখানে কিছুদিনের জন্যে এই অভ্যাসটা ছিল না।

বিবাহ-উৎসবের পরে দিন তিনেক নিউসন ছিল ক্যাস্টারব্রিজে। অত যে ধুমধাম, তার অনেকখানিই নিউসনের দাক্ষিণ্যে। তখন ক্যাস্টারব্রিজের লোকজন এমন সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাত তার দিকে যেন সেই মুহূর্তে ক্রুশো অভিযানশেষে ফিরে এলেন। ক্যাস্টারব্রিজ কয়েক শো বছরের পুরনো শহর। অমন বহু নাটকীয় প্রত্যাবর্তন বা নিষ্ক্রমণ ঘটে গেছে এর আগে। বছরে দুএকটা অমন ঘটনা ঘটেই থাকে। এই আগন্তুককেও শহরবাসীরা সেই সমদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করল না। চতুর্থদিন সকালবেলা তাকে দেখা গেল, আকুপাকু করে একটা টিলা বেয়ে উঠছে—যেন একমাত্র চেষ্টা হল কোনো উপায়ে উঁচু একটা জায়গা থেকে সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে পাওয়া। বেঁচে থাকতে হলে লবণাক্ত জলরাশির সাহচর্য্য তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাই বাডমাউথকেই সে বাসস্থান হিসেবে পছন্দ করল—মেয়েজামাইয়ের সঙ্গ ছেড়ে যেতে দ্বিধা করল না। সেখানে একটা ছোট সবুজ কুটিরে আশ্রয় নিল সে—মাঝেমাঝে জানালার খড়খড়ি তুলে, এক সরু গলির মধ্য দিয়ে নীল সমুদ্রের লম্বা একটা ফালি চোখে পড়ত তার—দুপাশে দণ্ডায়মান উঁচু উঁচু বাড়ি।

এদিকে দোতলার বৈঠকখানা ঘরের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে এলিজাবেথ ঘাড় কাৎ করে খুঁটিয়ে দেখছিল—আসবাবপত্রের অবস্থান ঠিক ঠিক রুচিসম্মত কিনা। এমন সময়ে এক পরিচারিকা সেখানে ঢুকে ঘোষণা করল—ওঃ ম্যাডাম। এতদিনে বোঝা গেছে, পাখীর খাঁচাটা ওখানে কি করে এল!

এই বাড়ীতে বাস শুরু করার পর, প্রথম সপ্তাহেই মিসেস ডোনাল্ড ফারফ্রী সবদিক দেখেশুনে নিচ্ছিল। কোন ঘরে পর্যাপ্ত আলো-হাওয়া, কোন ঘরটা অন্ধকার—ধীরপায়ে ঘুরে ঘুরে বাগান দেখল—শরতের হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে পাতায় পাতায়। সর্বাধিনায়কের মত এই নতুন পাতানো সংসারে সে দক্ষ গৃহিণীর পরিচয় রাখতে চাইছিল—এই সময়েই একটু আড়ালে এককোণে, চোখে পড়ল একটা পাখীর খাঁচা—খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা —তলায় কতক গুলি পালক জমা হয়ে পড়ে আছে—অর্থাৎ মরা একটা গোল্ডফিঞ্চ পাখী। খাঁচাটা বা পাখীটা সেখানে কি করে এল কেউ বলতে পারল না। তবে পাখীটা যে না খেতে পেয়ে উপোস করে মারা গেছে এটা পরিষ্কার। এই ঘটনার বেদনা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফারফ্রীর মৃদু হাসি-ঠাট্টা সত্ত্বেও, বেশ কয়েকদিনের মধ্যে সে দুঃখটা ভুলতে পারে নি। এখন ব্যাপারটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

ম্যাডাম! পাখীর খাঁচাটা ওখানে কি করে এল, আমরা বুঝতে পেরেছি। সেই যে লোকটা আপনাদের বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা এসেছিল—তার হাতেই দেখা গিয়েছিল ওটা, রাস্তায় আসার সময়। ঐ লোকটাই বোধহয় নামিয়ে রেখেছিল ওখানে। তারপর যাওয়ার সময় ভুলে গেছে।

এইটুকু শুনেই এলিজাবেথ ভাবতে শুরু করল। নারীত্বের স্বাভাবিক প্রেরণায় সে অনুভব করল, হেনচার্ড পাখিটাকে তার বিয়েতে উপহার দেবার জন্যেই এনেছিল, যেন অনুতাপের প্রতীক। অতীতের কৃতকর্মের জন্যে সে এলিজাবেথের কাছে একবারও মাপ চায় নি বা দুঃখপ্রকাশ করে নি, কিন্তু হেনচার্ডের স্বভাবটা এমনই যে কোন কিছুই সে ভোলে না, বরং নিজের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ নিয়ে বেঁচে থাকে। এলিজাবেথ বেরিয়ে গিয়ে খাঁচাটা দেখল, মৃত ছোট্ট পাখিটাকে সযত্নে মাটি দিল—তারপর থেকেই সেই আত্ম-নির্বাসিত লোকটির প্রতি সহানুভূতিতে আপ্লুত হল তার মন।

স্বামী ফিরে এলে খাঁচার রহস্য সম্পর্কে নিজের ধারণাটা খুলে বলল এলিজাবেথ। ডোনাল্ডকে অনেক অনুরোধ করল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেনচার্ডকে খুঁজে বার করার কাজে তাকে সাহায্য করতে। পুরাণো কথা ভুলে লোকটি যাতে আর নিজেকে অবাঞ্ছিত না মনে করে সেজন্যে কিছু করা দরকার। ফারফ্রী কখনই হেনচার্ডকে অতখানি আবেগ দিয়ে ভালবাসে নি, হেনচার্ড যেমন তাকে ভালবাসত। ঠিক তেমনি তার প্রাক্তন বন্ধু যে তীব্রভাবে তাকে ঘৃণা করত তেমনটিও ছিল না ফারফ্রীর বেলা। কাজেই এলিজাবেথের এই সাধু পরিকল্পনাতে সে সাগ্রহে

[illegible]

কিন্তু হেনচার্ডকে খুঁজে বার করা কি সহজ ব্যাপার! ফারফ্রী-দম্পতির দরজা থেকে বেরিয়ে সে যেন গা ঢাকা দিয়েছে। এলিজাবেথের মনে পড়ল, একদিন হেনচার্ড কি দুষ্কর্ম করতে যাচ্ছিল! মনে পড়তে এলিজাবেথ কেঁপে উঠল আতঙ্কে।

কিন্তু এলিজাবেথ জানত না, এখন হেনচার্ডের কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আর সেই ভয় করার কোনো কারণই নেই। কয়েকদিন খোঁজ খবর করতেই জানা গেল একটি লোক হেনচার্ডকে মেলচেষ্টারের রাস্তা বেয়ে সোজা পূবদিকে হাঁটতে দেখেছে—রাত তখন বারোটা। অর্থাৎ হেনচার্ড যে পথে এসেছিল, সেই পথ বেয়েই ফিরে গেছে।

এই সংবাদটুকুই অনেক। পরদিন সকালে ফারফ্রী নিজের গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পাশে বসে এলিজাবেথ। তার গায়ে মোটা পশমের চাদর—নতুন যুগের ফ্যাশন। এলিজাবেথের গায়ের রং আগের থেকে ঘন হয়েছে—গৃহিণীর গাম্ভীর্য এসেছে—মুখচোখে যেন দেবী মিনার্ভার দিব্যদ্যুতি। জীবনের অনেক দুঃখবিপদ অতিক্রম করে এসে যেন এক প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে সে। তার বর্তমান উদ্দেশ্য হল হেনচার্ডকেও অনুরূপ শান্তির সন্ধান দেওয়া—যাতে হেনচার্ড আরও অতলে তলিয়ে না যায়—বর্তমান পরিস্থিতিতে যেটা তার পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

বড় সড়ক বেয়ে কয়েক মাইল আসার পরে তারা আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। রাস্তা-মেরামৎকারী একজন শ্রমিক সেখানে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কাজ করছে। সে বলল, অমন একটি লোককে এখান দিয়ে যেতে দেখেছিল। ওয়েদার-বেরীতেই লোকটি মেলচেষ্টারের রাস্তা ছেড়ে বড় সড়কে ওঠে—তারপর একেবারে এগডন হীথের উত্তর দিকে চলে যায়। সেই রাস্তাতেই ঘোড়ার মুখ ঘোরাল এই দম্পতি—একটু পরেই তারা সেই প্রাচীন ভূমিতে এসে পড়ল, এগডন হীথ, যেখানে খরগোসের আঁচড় ছাড়া একটিও দাগ পড়েনি এ যাবৎকাল।

এগডনে সর্বত্র আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও হেনচার্ডের পাত্তা পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে তারা বিকেলের দিকে এঙ্গেলবেরীর উত্তরে এগডন হীথ যেখানে শেষ হতে হতে মিলিয়ে গেছে প্রায়, সেখানেই এক টিলার ওপরে এসে পৌছাল। হেনচার্ড যে এই রাস্তাতেই হাঁটতে হাঁটতে এসেছে—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন যেভাবে পথগুলো এঁকে বেঁকে জালের মত ছড়িয়ে পড়েছে—তাতে হেনচার্ডের হদিশ খুঁজে বার করা নেহাৎ আন্দাজ ছাড়া আর কিছু নয়। ডোনাল্ড তার স্ত্রীকে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল—এখন আর এ চেষ্টা ত্যাগ করা উচিত। বরং অন্য কোনো মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বাড়ী থেকে প্রায় মাইল বিশেক তফাতে এসে পড়েছে তারা। হিসেব করে দেখা গেল ঘোড়াটাকে পাশের গাঁয়ে ঘণ্টা দুই

বিশ্রাম দিয়েও সেইদিনই ক্যাস্টারব্রিজে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু আরও যদি কিছুটা এগিয়ে যেতে হয়—তবে রাতটা বাইরে কাটাতে হবে। এলিজাবেথ সবকিছু ভেবেচিন্তে ফারফ্রীর মতেই সায় দিল।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ফারফ্রী। উল্টোদিকে মুখ ফেরানোর আগে, এই উচ্চস্থান থেকে সম্মুখের বিস্তৃত পতিত জমির দিকে অনির্দিষ্টভাবে তাকাল একবার। মনুষ্যাকৃতি একটা চেহারা দেখা গেল, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সামনে মিলিয়ে যাচ্ছে। লোকটা শ্রমিক শ্রেণীর—চলাফেরায় অত্যন্ত দীনহীন ভাব—এমনভাবে একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে যেন চোখে ঠুলি-পরানো। লোকটার হাতে কতকগুলো কাঠকুটো। রাস্তা পার হয়ে সে নেমে গেল বেহড়ের মধ্যে। সেখানে একটা ছোট্ট কুটির—তার মধ্যে ঢুকে গেল লোকটা।

ক্যাস্টারব্রিজ থেকে এতটা দূর না হলে বলতাম যে লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের পাগলা হুইট্‌ল্—ঠিক তার মতই দেখতে, না?—বলল এলিজাবেথ।

হয়তো হুইট্‌ল্ হতেও পারে। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে একদিনও সে কাজে যায় নি। কিছু না বলে কয়ে কোথায় যে চলে গেল! দুদিনের রোজের দামও পায় আমার কাছে—অথচ পয়সা দেব কাকে!

এই সম্ভাবনা তাদের গাড়ী থেকে নামাল। অন্ততঃ একবার ঐ কুঁড়েটায় গিয়ে খবর নিতে হয়। লাগামের দড়িটা খুঁটির গায়ে বাঁধল ফারফ্রী। তারপর সেই ভাঙাচোরা অতি জীর্ণ কুঁড়েঘরটার দিকে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। বহু বছরের মাটির দেওয়াল বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে দাঁত মেলে দাঁড়িয়ে আছে। দু'একটা আইভি লতা, পাতা ডাঁটা ছড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করছে দেওয়ালের গা বেয়ে, চালের বাতা অত্যন্ত নিচু। তা সত্ত্বেও চালের ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়া আলোর রেখা মেঝেতে ঠিকরে পড়ে নজর কেড়ে নেয়। দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত লতাপাতা তাদের অধিকার বিস্তার করে নিরাপদ সুখে বিরাজ করছে। দরজাটা অর্দ্ধেক ভেজানো। ফারফ্রী টকটক করে টোকা দিল। দরজা খুলতেই দেখা গেল, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে মূর্তিমান অ্যাবেল হুইট্‌ল্।

গভীর বিষাদে তার মুখখানা আচ্ছন্ন। জ্যোতিহীন দুটি চোখে তাকিয়ে আছে এদের দুজনের দিকে। এখনও দুই হাতে তার পাঁজা করা সেই কাঠকুটোর আঁটি। চিনতে পেরেই অ্যাবেল নড়ে চড়ে উঠল।

সে কি? অ্যাবেল হুইটল্, তুমি এখানে? ফারফ্রী বলল।

হ্যাঁ, এসে পড়লাম। উনি আমার সঙ্গে রাগারাগি করলেও, আমার জন্যে অনেক করেছেন। মা যতদিন বেঁচেছিল—

কার কথা বলছ ?

ও, আপনি জানেন না বুঝি ! মিঃ হেকেট—এই তো একটু আগে হয়ে গেল—এই আধ ঘণ্টাও হয় নি বোধহয়। আমার কাছে ঘড়ি নেই তবে বেলা দেখে মনে হচ্ছে—

নেই। মারা গেছেন ?—এলিজাবেথের গলা বুজে এল।

হ্যাঁ, ম্যাডাম, চলে গেলেন। আমার মার জন্যে উনি খুব করেছেন। কত যে পোড়া কয়লা পাঠিয়ে দিতেন—একটুও ছাই থাকত না তাতে। কত জিনিস পাঠাতেন—এটা সেটা। আমি দেখলাম—উনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন—একা একা—সেই, সেইদিন রাত্তিরে যেদিন আপনাদের বিয়ে হোল। দেখে যেন মনে হল, খুব কষ্ট আর যন্ত্রণায় ভেঙে পড়েছেন। গ্রে'জ ব্রিজ পর্যন্ত আমি এলাম পিছু পিছু। উনি ফিরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেই বললেন—'চলে যা !' তবু আমি আসতে লাগলাম। আবার পিছন ফিরে দেখে বললেন—'এই যে, শুনতে পাচ্ছেন না, দয়া করে ফিরে যান !' কিন্তু আমার দেখে বেশ মনে হচ্ছিল—ওঁর কষ্টের শেষ নেই। আমি পেছন পেছন এলাম, তখন বল্লেন—'হুইট্‌ল্, তোমাকে এত বার করে বলছি, তবু কেন তুমি আমার পেছন পেছন আসছ ?' আমি বললাম—'কর্তা ! আপনার চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছে। আমাকে মাঝে মাঝে গালমন্দ করলেও, আমার মাকে আপনি অনেক উপকার করেছেন, আমিও না হয় এটুকু কষ্ট করলাম আপনার জন্যে।' উনি হাঁটতে লাগলেন, আর আমিও পেছন পেছন এলাম। আর একবারও আপত্তি করেন নি তারপর। সারাটা রাত আমরা হাঁটলাম। তারপর ভোর না হতেই, যখন ঘোরঘোর হয়ে আকাশের আবছা নীল দেখা যেতে লাগল, আমি দেখলাম, উনি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলছেন, হাঁটতে আর পারছেন না। ততক্ষণে আমরা এই জায়গা ফেলে এগিয়ে গেছি। কিন্তু যেতে যেতে দেখলাম এই ঘরটা খালি। তাই ওঁকে নিয়ে এলাম এখানে। জানালার কবাটটা চাড় দিয়ে খুলে ফেলে ওঁকে ভেতরে ঢোকালাম। উনি বললেন—'আচ্ছা হুইট্‌ল্ ! একি বোকামি ! আমার মত হতভাগ্যকে তুমি কেন সাহায্য করছ !' আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কতকগুলো কাঠুরের কাছে গেলাম। তাদের কাছ থেকে একটা বিছানা, একটা চেয়ার, আরও কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এলাম। যতদূর সম্ভব আরামে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু উনি আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। আসলে ম্যাডাম ! উনি কিছুই খেতে পারছিলেন না। এক বিন্দু খিদে ছিল না। না খেয়ে খেয়েই আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন। অবশেষে এই আজকে হয়ে গেল। একজনকে পাঠিয়েছি, কফিনের ব্যবস্থা করার জন্যে লোক ডাকতে।

আহা, হা, তাই নাকি ? কাঁদতে কাঁদতে বলল।

এলিজাবেথের মুখ দিয়ে একটিও কথা বেরুল না।

একটা কাগজে কি সব লিখে, উনি ওনার ঐ খাটের মাথায় লটকে রেখেছিলেন —অ্যাবেল হুইটল্ বলতে লাগল—আমি তো পড়া লেখা জানি নে, তা বুঝব কি করে। আপনাদের এনে দেখাতে পারি।

দৌড়ে কুঁড়েটার মধ্যে ঢুকে গেল হুইটল্। ওরা দুজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। দলাপাকানো একটা কাগজ নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল সে। কাগজটার ওপরে পেন্সিল দিয়ে লেখা—

এলিজাবেথ ফারফ্রীকে যেন আমার মৃত্যুর কথা না জানানো হয় অথবা আমার জন্তে সে যেন শোকপালন না করে—

এবং কোনও পবিত্র ভূমিতে যেন আমাকে কবর দেওয়া না হয়।

এবং কোনও গীর্জায় যেন ঘণ্টা না বাজে।

এবং আমার মৃতদেহ যেন কেউ না দেখে।

এবং আমার সৎকারে কেউ যেন শোকযাত্রা না করে।

এবং আমার কবরে যেন ফুল না দেওয়া হয়।

এবং কেউ যেন আমাকে মনে না রাখে।

এটাই আমার অন্তিম ইচ্ছা।

মাইকেল হেনচার্ড।

ডোনাল্ড কাগজটা এলিজাবেথের হাতে দিয়ে বলল,—এখন তাহলে কি করা যায়?

এলিজাবেথ স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারল না। একটু পরেই কান্নায় ভেঙে পড়ল, বলল—হায় ডোনাল্ড! এযে কী যন্ত্রণা! এত কষ্ট আমার হ'ত না, যদি না সেই শেষ বিদায়ের দিনে, অত খারাপ ব্যবহার করতাম।....কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই!....হায়....যা হবার হয়ে গেছে।....

মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে হেনচার্ড যা লিখে গিয়েছিল সেগুলো এলিজাবেথ যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করল। অন্তিম বাসনা বলে কোনও পবিত্রতাবোধে নয় বরং এলিজাবেথের ব্যক্তিগত বিবেচনায় মনে হয়েছিল যে, তিনি যা লিখে গেছেন, তার মধ্যে ওসব ভণিতার স্থান নেই। সারাটা জীবন তাঁর যেভাবে কেটেছে, শেষটাও তাঁর সঙ্গে ঠিক ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ। এলিজাবেথ চিন্তা করে দেখল, তাঁর মৃত্যুতে শোকের আড়ম্বর একটুও শোভনীয় নয়, বা এই উপলক্ষ্য করে তার স্বামীকেও বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে দেওয়া যায় না।

নীরবেই সারা হল সব। শেষ দেখা হওয়ার দিনে কেন তাকে অত ভুল বুঝেছিল

ভেবে এলিজাবেথ মরমে মরে যাচ্ছিল। খুবই গভীর আর হৃদয়স্পর্শী সে বেদনা। এর-পরথেকে এলিজাবেথ এক পরম শান্তির জগতে উন্নীত হল। দয়া, কৃতজ্ঞতা, সৌজন্য এগুলি তার সহজাত গুণ। বিবাহিত জীবনের শুরুতেই আবেগ আর ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে যুক্ত হল এক পবিত্র সংযত উপলব্ধি। হৃদয়তন্ত্রীর সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সে আবিষ্কার করল এক গোপন সত্য—কি করে জীবনের সীমাবদ্ধতাকে সহনীয় করে তুলতে হয়। এতদিন সে ভেবেছিল, বিশালতা আর বিস্তৃতিতেই জীবনের যাবতীয় সুখ কিন্তু দুঃখযন্ত্রণার অণুবীক্ষণিক অনুভূতি এখন ভাবতে শেখাল, দুঃখের গহনে নিহিত আছে জীবনের এক গভীরতর সত্য, এলোমেলো বিষয় সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞানে যার সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই শিক্ষা এমন গভীর ভাবে প্রোথিত হয়ে গেল তার জীবনে, যে এখন এলিজাবেথ ক্যাস্টারব্রিজের দীন-দরিদ্র লোকেদের জন্যে সহানুভূতি বোধ করে কিন্তু নিজেকে মহৎ ভাবে না। আবার উচ্চ সমাজের মধ্যমণি হওয়ার গৌরবে কোনও তাৎপর্য খুঁজে পায় না। এখন সে জীবন সম্পর্কে তৃপ্ত—সার্থকতায় পূর্ণ ও করুণার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। কিন্তু মুখে তার ভাষা নেই। সে এমনই এক অভিজ্ঞতা যে, ঠিকই হোক আর বেঠিকই হোক, সে বুঝতে শিখেছে, এই দুঃখমলিন জগতের অন্ধকারে স্বল্পকালের এ জীবন উচ্ছ্বসিত হওয়ার মত কিছু নয়। অবশ্যি কখনও কখনও হয়তো তারই তুল্য দুয়েকটি দিবসের আলোকরেখা ক্ষণিক আলোকিত করে যায়। এটা তার দৃঢ় ধারণা যে, শুধু সে বলে নয়, কোন মানুষই, যতটুকু নির্দিষ্ট করা আছে তার বেশী পেতে পারে না। তেমনি একথাও ঠিক যে অনেক মানুষ আছে যাদের পাওয়া উচিত ছিল অনেক বেশী কিন্তু পেল না কিছুই। এলিজাবেথ নিজেকে ভাগ্যবানদের মধ্যে গণ্য করলেও জানে জীবনের অনেক কিছুই হিসাবের অঙ্কে বাঁধা পড়ে না। আজকের এই বয়সে যে অখণ্ড তৃপ্তি ও স্থিরতায় সে পৌঁছেছে এর পশ্চাতে আছে, নিজেরই যৌবনের সেইসব দিনগুলি, সেই অভিজ্ঞতা যে, জীবনের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের নাট্যে সুখ হল এক অতি সাময়িক, স্বল্পকালীন উপকথা।

—সমাপ্ত—

পরিশিষ্ট

টমাস হার্ডির (১৮৪০–১৯২৮) উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম 'দি মেয়র অব্ ক্যাস্টারব্রিজ' ১৮৮৬ সালের ২রা জানুয়ারী থেকে ১৫ই মে'র মধ্যে 'দি গ্রাফিক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির মূল পাণ্ডুলিপি ডরচেস্টারের 'ডরসেট্ কাউন্টি মিউজিয়ামে' সযত্নে রক্ষিত আছে। টমাস হার্ডি নিজেই তাঁর রচনাবলীর যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তার একটি বিভাগের নাম 'নভেলস্ অব্ ক্যারেক্টার অ্যাণ্ড এন্‌ভায়র্নমেন্ট'। এই বিভাগের মধ্যেই রয়েছে 'দি মেয়র অব্ ক্যাস্টারব্রিজ'। এই উপন্যাসে কাহিনীর সর্বব্যাপী দুঃখের আবহে মাইকেল হেনচার্ডের নিয়তিনির্দিষ্ট চরম বিপর্যয়ে আমরা শোকাকুল হই। একটি ব্যক্তির মৃত্যুই যেন আমাদের জীবনে বিষাদের ছাপ রেখে যায়। হেনচার্ডের দুঃখ-ব্যথা যেন আমাদেরই দুঃখ-ব্যথা, তাঁর মৃত্যু যেন আমাদের কোনো নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু। প্রকৃত ট্র্যাজেডীর ধর্মই হ'ল প্রধান চরিত্রের বিয়োগব্যথা পাঠক মনে সঞ্চারিত করা। এ দিক থেকে 'দি মেয়র অব্ ক্যাস্টারব্রিজ' একটি সার্থক বিয়োগান্তক উপন্যাস।

'দি মেয়র অব্ ক্যাস্টারব্রিজের' সাফল্যের পরই হার্ডির আরো তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এগুলো হ'ল 'দি উড্‌ল্যাণ্ডার্স' (১৮৮৭), 'টেস্ অব্ দি ডারবারভিল্‌স্' (১৮৯১) এবং 'জুড্ দি অবস্‌কিওর' (১৮৯৫)। এই উপন্যাসত্রয়ও হার্ডির 'নভেলস্ অব্ ক্যারেক্টার অ্যাণ্ড এন্‌ভায়র্নমেন্ট' পর্যায়ে পড়ে। হার্ডি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে চির সংগ্রামরত মানুষের অন্তিম পরিণতির কথা অপূর্ব কাব্যিক ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন। এই অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেই মাইকেল হেনচার্ড, টেস্ প্রভৃতি চরিত্রের জীবনাবসান হয়। টমাস হার্ডির উপন্যাসে এক অনাবিল কাব্যের দ্যুতির মধ্যে মানুষকে ক্রূর দৈবের হাতে অসহায় ক্রীড়নকরূপে এবং জীবনকে অত্যান্তিক দুঃখবাদের ভিত্তিভূমিরূপে দেখি। মানুষের সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তির জন্য অদৃষ্ট চরম শাস্তির বিধান করে তাকে আরো অসহায় করে তুলেছে। নিয়তির এক দুর্জ্ঞেয় বিধান মানুষকে এক অপ্রতিরোধ্য বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

তার এই চরম পরিণতির জন্য আমরা গভীর বেদনা অনুভব করি। গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়করা যেমন অন্ধ নিয়তির দ্বারা চালিত হয়ে দুঃখময় পরিণতি লাভ করে, হার্ডির প্রধান চরিত্রগুলি ঠিক একই পরিণতির শিকার হয়। হার্ডির মতে এক অন্তর্ব্যাপ্ত ইচ্ছাশক্তি—Immanent Will'—সমস্ত জগতের নিয়ামক। কিন্তু সে অন্ধ, নিষ্করুণ, তাই মানুষের জীবনে এত দুঃখ, এত ব্যর্থতা, এমন অনিবার্য করুণ পরিণতি।

টমাস হার্ডির কবিতাবলীতে যে জীবনদর্শনের ব্যঞ্জনা আছে উপন্যাসে তা আরো দৃঢ় ও স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে। নিয়তি অথবা এক অজ্ঞাত শক্তির সঙ্গে অসহায় মানুষকে সব সময় যুদ্ধ করতে হচ্ছে এবং এই অসম দ্বন্দ্বে মানুষ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য হচ্ছে। কখনও কখনও আপতিক ঘটনায় নিয়তির অদৃশ্য হস্তের স্পর্শ পাওয়া যায়। মানুষ যে নিয়তির খেলার পুতুল, সে ভাবই ব্যক্ত হয়েছে 'টেস' উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে : 'Justice was done, and the President of the Immortals, in Aeschylean phrase, had ended his sport with Tess." 'দি মেয়র অব্ ক্যাস্টারব্রিজে'র হেনচার্ড এবং 'দি রিটার্ণ অব্ দি নেটিভের' ক্লেমকে নিয়ে দেবতাদের অধিনায়ক এরূপ নিষ্ঠুর ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছেন। হেনচার্ড এবং ক্লেমের করুণ পরিণতির জন্য তারা নিজেরাও দায়ী। কারণ অসংযত প্রেমাবেগ অনেক সময় তাদের ভুল পথে নিয়ে যায় ; সুতরাং যা ঘটে তাতে তাদেরও দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না।

ইংরেজি সাহিত্যে একমাত্র টমাস হার্ডিই উপন্যাসকে ট্রাজেডির মর্যাদা দিয়েছেন। তবুও অনেক সময় তাঁর বিরুদ্ধে দুঃখবাদের অভিযোগ আনা হয়। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস, বিশেষ করে 'জুড্ দি অব্‌স্কিওর' বিশ্লেষণ করলে এই অভিযোগের সত্যতা মেলে। আবার টেস্ যখন জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শেষ দিকে অদৃষ্টের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন তার চারিত্রিক মাধুর্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। এ সব সত্ত্বেও টেস্ আমাদের মনে এমন এক দাগ রেখে যায়, যার জন্য আমরা নীরবে অশ্রু বিসর্জন না করে পারি না। টেস্, জুড্, ক্লেম, হেনচার্ড—এর প্রত্যেকেই ট্রাজিক চরিত্র, কারণ এদের চরিত্রের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য বিয়োগান্তিক মাহাত্ম্য রয়েছে। তাদের সম্পর্ক মহাকাল, মৃত্যু ও অদৃষ্টের সঙ্গে এবং তারা মহীয়ান যেহেতু তাদের পরাজয় নিশ্চিত হলেও ঐ সব প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে তারা সতত সংগ্রামরত।

টমাস হার্ডির উপন্যাসের সাধারণ চরিত্রগুলি এক বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদের দুঃখ, দৈন্য, ভাগ্য বিপর্যয় দেখে আমাদের সহমর্মিতা জাগলেও, সাধারণ জীবনযাত্রা কিন্তু ব্যাহত হয় না। যারা

অগ্যবিড়ম্বিত তারা সাময়িকভাবে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। তার পরে তাদের আর কোনো চিহ্ন থাকে না। কিন্তু পুত্তরগ্রাস্, হেনেরি, জ্যান্ কোগান্, সলোমন লংওয়েজ, ক্রিস্টোফার কোনি, বাজফোর্ডের মতো সাধারণ মানুষরা জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখে। তাদের কাছাকাছি কোথাও যে ট্রাজেডি সংঘটিত হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের যেন কোনো চেতনা নেই। সেই জন্য তাদের হাস্য পরিহাস কোনো অবস্থাতেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বহু বছরের বিচ্ছেদের পর হেনচার্ডের সঙ্গে সুসানের মিলনের সময় ক্রিস্টোফার কোনি এবং সলোমন লংওয়েজের হাস্য পরিহাস পূর্ববৎ থেকে যায়। প্রধান চরিত্রদের মানসিক অবস্থার সঙ্গে এদের কোনোই সম্পর্ক থাকে না। এদের হাসিঠাট্টা এমন যে, শেক্সপিয়রের ডগবেরি-ভার্জেসের উত্তরসূরী বলে অনায়াসেই চিনে নেওয়া যায় এদের।

ভিক্টোরীয় যুগের ধারা টমাস হার্ডিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই যুগের শেষের দিকে হার্ডির সাহিত্য জীবন আরম্ভের সময়, ইংলণ্ডে ভাব ও চিন্তার বৈচিত্র্য খুবই বেশী ছিলো। হার্ডি তাঁর বাল্যে ও কৈশোরে মানুষের কল্পনা ও ভাবনায় যে স্থৈর্য্য ও তৃপ্তি দেখেছিলেন, যৌবনেই তার বিপর্যয় লক্ষ্য করেছিলেন নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতে। এর মধ্যে হার্ডি তাঁর স্বতন্ত্র অনুভব ও বুদ্ধির দীপ্তি নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেন। তিনি নবাগত বিজ্ঞানের আলোকে নিসর্গ ও মানুষের প্রাণপ্রবাহ ও মনোলোক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, অথচ যান্ত্রিক বণিকধর্মকে শ্রেয়স্কর বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। কর্ষণজীবী সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল নিবিড়, তাই গভীর সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন—একদিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির আঘাতে, অন্যদিকে বাণিজ্যের কর্তৃত্বে এ সমাজ দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, এর মানুষগুলি অসহায়ভাবে অনিবার্য পরিণামের মুখে আত্মবলি দিচ্ছে। কোনো একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী হয়ে মানুষ জীবন সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং মরছে, এই অনুভবটি সম্ভবতঃ হার্ডি তৎকাল বিস্তৃত অভিব্যক্তির ধারণা থেকে পেয়েছিলেন; আর মানুষের মনোলোকের বিচিত্র-জটিল কামনা ও অতৃপ্তির রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন কতকটা মনস্তত্ত্ববিকলনের ধারা থেকে, কতকটা প্রত্যক্ষ জীবনের ওপর নিজ অন্তর্দৃষ্টির এক্স-রে নিক্ষেপ করে। তাই তাঁর উপন্যাসে ও কবিতায় বারবার বিমূঢ় মানুষের নৈরাশ্যের ছবি ফুটে উঠেছে। বঞ্চনা ও ছলনা যেন মানুষকে কুরে কুরে খেয়েছে।

প্রেম-ভালোবাসা হার্ডির উপন্যাসের প্রধান বিষয়। তাঁর সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রেম ভালোবাসাকে ঘিরে মানবমনের চিরন্তন ঘাত-সংঘাতের কাহিনী ব্যক্ত

হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে দু'জন পুরুষ কোনো এক রমনীর মোহিনী রূপে মুগ্ধ হয়েছে; অথবা দু'জন রমনী কোনো পুরুষের মোহনরূপে আকৃষ্ট হয়ে অন্তর্জ্বালায় জর্জরিত হচ্ছে। এই প্রেম-ভালবাসার মধ্য দিয়েই দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘটনার তড়িৎগতি চরিত্রের মনোলোকের ঝড়-ঝঞ্ঝার খবর পাই। দি মেয়র অব্ ক্যাস্টারব্রিজ উপন্যাসের শেষ পরিণতির মূলে রয়েছে প্রেম। লুসেটাকে হেনচার্ড এবং ফারফ্রী দু'জনেই ভালোবাসে; আবার এলিজাবেথ যে মুহূর্তে হেনচার্ডের কাছে ফিরে আসে তখনই নিউসন এসে এলিজাবেথকে নিজের কন্যা হিসাবে দাবি করে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে হেনচার্ডকে মদের নেশায় উন্মত্ত হয়ে সুসানকে নীলামে বিক্রয় করতে দেখা যায় এক অজ্ঞাত পরিচয় নাবিকের কাছে। আবার ফারফ্রী এলিজাবেথ জেনকে বিয়ে করে হেনচার্ডের শেষ স্নেহের পাত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর হৃদয়কে শূন্য করে দেয়। যে হেনচার্ড জীবনের এক সামান্য অবস্থা থেকে খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁর পরাজয় ও নিয়তির নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ দেখে আমরা গভীর ভাবে আপ্লুত হই।

টমাস্ হার্ডির এক স্পষ্ট জীবনদর্শন আছে। তাঁর মতে মানুষ এক উদাসীন দৈবের হাতের ক্রীড়নক এবং জীবনে দুঃখ পেতেই যেন তার জন্ম। এই প্রসঙ্গে 'দি মেয়র অব্ ক্যাস্টারব্রিজে'র শেষ কথাগুলো স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে সুখ মানুষের জীবন-নাট্যে আকস্মিক ঘটনা মাত্র। দুঃখই মানুষের শিরোভূষণ। সুখ ক্ষণপ্রভার মত চঞ্চল। রবার্ট ব্রাউনিং ঠিক একইভাবে বলতে চেয়েছেন যে আমাদের জীবন-পরিসরের তিন ভাগই দুঃখ। হেনচার্ডের অন্তহীন কষ্ট এবং তীব্র জীবন যন্ত্রণা যেন আমাদেরও হৃদয়-বেদনা। তাঁর ব্যথায় আমরাও ব্যথিত; তাঁর করুণ মৃত্যুতে আমরাও শোকাহত; তাঁর পতনে আমাদেরও সেই রকম মর্মস্পর্শী অনুভূতি হয় যেমন কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের হয়েছিলো লুসির মৃত্যুতে।